প্রতিচিন্তা

সম্পাদক ও প্রকাশক মতিউর রহমান কর্তৃক ৫২ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা ১০০০ থেকে
প্রকাশিত এবং ট্রান্সক্রাফট লিমিটেড, ২২৯ তেজগাঁও শিল্প এলাকা
ঢাকা ১২০৮ থেকে মুদ্রিত।
যোগাযোগ : প্রথম আলো ভবন, ১৯ কারওয়ান বাজার, ঢাকা ১২১৫।
ফোন : ৮১৮০০৭৮-৮১, ০৯৬১৩১১৩৩৬৬
পরিবেশক : প্রথমা প্রকাশন, ১৯ কারওয়ান বাজার, ঢাকা ১২১৫।

খাতি চিন্তা

সমাজ, অর্থনীতি ও রাষ্ট্রবিষয়ক ত্রৈমাসিক

নবম বর্ষ ● চতুর্থ সংখ্যা ● ঢাকা ● অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৯

প্রতিচিন্তা

সমাজ, অর্থনীতি ও রাষ্ট্রবিষয়ক ত্রৈমাসিক

অক্টোবর-ডিসেম্বর সংখ্যা, ২০১৯

সম্পাদক
মতিউর রহমান, সম্পাদক, *প্রথম আলো*

নির্বাহী সম্পাদক
খন্দকার সাখাওয়াত আলী, সমাজ গবেষক; প্রধান নির্বাহী, নলেজ অ্যালায়েন্স

উপদেষ্টা পর্ষদ
নুরুল ইসলাম, অর্থনীতিবিদ; ইমেরিটাস ফেলো, ইফপ্রি
আনিসুজ্জামান, প্রফেসর ইমেরিটাস, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
আজিজুর রহমান খান, অর্থনীতিবিদ ও গবেষক; প্রফেসর ইমেরিটাস, ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়া
সিরাজুল ইসলাম, ইতিহাসবিদ; কমনওয়েলথ স্টাফ ফেলো
রওনক জাহান, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী; সম্মানীয় ফেলো, সিপিডি
আকবর আলি খান, অর্থনীতিবিদ, লেখক; অধ্যাপক, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়
ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ, অর্থনীতিবিদ; অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সম্পাদনা পর্ষদ
বদরুল আলম খান, অধ্যাপক, ওয়েস্টার্ন সিডনি বিশ্ববিদ্যালয়, অস্ট্রেলিয়া
আলী রীয়াজ, অধ্যাপক, রাজনীতি ও সরকার বিভাগ, ইলিনয় স্টেট ইউনিভার্সিটি
আল মাসুদ হাসানউজ্জামান, অধ্যাপক, সরকার ও রাজনীতি বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
সাজ্জাদ শরিফ, কবি, ব্যবস্থাপনা সম্পাদক, *প্রথম আলো*

সহকারী সম্পাদক
খলিলউল্লাহ্

প্রচ্ছদ
অশোক কর্মকার, চিত্রশিল্পী

দাম : ১০০ টাকা
ISSN 2310-2403
ওয়েবসাইট : www.prothom-alo.com/protichinta, ই-মেইল : protichinta@gmail.com

Protichinta : A Quarterly Journal on Society, Economy and State
October-December Issue, 2019; Editor & Publisher Matiur Rahman; Price 100 Taka
Prothom Alo Bhaban, 19 Karwan Bazar, Dhaka 1215, Bangladesh
Phone : 8180078-81, 09613113366

সূচিপত্র

সম্পাদকীয় ৬

দর্শন

কার্ল মার্ক্স : জীবনদর্শন ৯
বদরুল আলম খান

রাজনীতি

সমকালীন বিশ্ব পুঁজিবাদ ও মার্ক্সবাদের তিনটি প্রশ্ন ৩৯
মাহবুব উল্লাহ

রাজনীতি

পুঁজিবাদ তো ব্যর্থ হলো, এরপর কী? ৭৭
জন বেলামি ফস্টার

দর্শন

বিচ্ছিন্নতার বয়ান : বাইবেলীয় ধারণার মার্ক্সবাদী তত্ত্বে উত্তরণ ১০১
মুহাম্মদ তানিম নওশাদ

বইআলোচনা

ইসলামপন্থী এবং সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শের ঐক্যের ভবিষ্যৎ ১১৭
মুশফিক ওয়াদুদ

মন্তব্য

রোহিঙ্গাদের সুরক্ষার আদেশ ও জাতিগত স্বীকৃতি এবং বাংলাদেশের করণীয় ১২৭
কামাল আহমেদ

লেখক পরিচিতি ১৩৪

বিগত নব্বইয়ের দশকের পর থেকে সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্র—দুটোই সংকটের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। বিশ্বব্যাপী ডানপন্থী রক্ষণশীল রাজনীতির প্রতিক্রিয়ায় বামপন্থী রাজনৈতিক অ্যাজেন্ডা জনপ্রিয় হওয়ার নজিরও চোখে পড়ছে। দেশে দেশে মার্ক্সবাদী ঘরানার রাজনৈতিক দলের জনপ্রিয়তা কিছুটা বৃদ্ধি পাচ্ছে, যদিও ভোটের হিসাবে তা ক্ষমতায় আসার জন্য যথেষ্ট নয়। বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বার্নি স্যান্ডার্স ও যুক্তরাজ্যে লেবার পার্টির জেরেমি করবিনের জনপ্রিয়তা আগের চেয়ে বৃদ্ধি পাওয়ার পেছনে ডানপন্থার আধিপত্য থেকে তরুণদের বের হয়ে আসার আকাঙ্ক্ষা চোখে পড়ে। তবে যুক্তরাজ্যের নির্বাচনে করবিনের প্রত্যাশা অনুযায়ী সাফল্য না পাওয়ার পেছনে কারণ ছিল ব্রেক্সিট প্রসঙ্গ।

যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য নব্য উদারনীতিবাদের সবচেয়ে উর্বর ভূমি হিসেবে খ্যাত। সেখানে বামপন্থী রাজনীতি জনপ্রিয় হওয়াটা বিশেষ বার্তা বহন করে। একটা অন্যতম কারণ হয়তো এ রকম যে কমিউনিজম জুজু স্নায়ুযুদ্ধকালীন এসব দেশে জেঁকে বসেছিল। কিন্তু নতুন প্রজন্ম তা থেকে মুক্ত। এর কারণ, বর্তমান প্রজন্মের তরুণদের জন্মসাল হিসাব করলে দেখা যাবে, তারা সবাই সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন ও স্নায়ুযুদ্ধ অবসানের পর জন্মগ্রহণ করেছে। ফলে তাদের আগের প্রজন্মের মনোজগতে যেই কমিউনিজমভীতি তাদের শাসকেরা সফলভাবে ঢুকিয়ে দিতে পেরেছিলেন, তা এই প্রজন্মের মধ্যে নেই।

অপর কারণটি হলো পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক মডেলের ব্যর্থতা। বৈশ্বিক অসমতা ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। এর বাইরে পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে বর্তমান প্রজন্ম অনেক বেশি সচেতন। আর জলবায়ু পরিবর্তন-সংকটের কারণ যে বিদ্যমান নব্য উদারনীতিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, সেটাও তারা আবিষ্কার করতে পারছে। ফলে এই ব্যবস্থার বিকল্প প্রত্যাশাও তাদের মনে জায়গা করে নিচ্ছে।

এই প্রেক্ষাপটে মার্ক্সবাদের সামনে নতুন আঙ্গিকে বিশ্বব্যাপী রাজনৈতিক শূন্যতা পূরণের সুযোগ তৈরি হয়েছে। তাই *প্রতিচিন্তার* এবারের সংখ্যায় মার্ক্সবাদ-বিষয়ক লেখার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে, বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মের কথা বিবেচনায় রেখে।

মার্ক্সবাদ বোঝার ক্ষেত্রে ব্যক্তি কার্ল মার্ক্সকে বোঝা প্রয়োজন। বদরুল আলম খান কার্ল মার্ক্সের জীবনদর্শন নিয়ে লিখেছেন। মার্ক্সের ছেলেবেলা, বিশ্ববিদ্যালয়জীবন এবং ধীরে ধীরে দর্শনচর্চায় মনোনিবেশের চিত্র ধরা পড়েছে এই লেখায়। ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ ব্যক্তিজীবন পার করেও কীভাবে মানবমুক্তির জন্য নিজের জীবনকে উৎসর্গ করেছিলেন মার্ক্স, সেই কাহিনিই এই লেখার প্রতিপাদ্য। যে জীবনদর্শন মার্ক্স গ্রহণ করেছিলেন, তা অন্য অনুসারীদের সহায়তায় প্রস্ফুটিত হয়ে আজকের সমাজতন্ত্র ও বামপন্থী রাজনৈতিক আন্দোলনের ভিত গড়ে দিয়েছিল।

সমাজতন্ত্রের ধারণার সূত্রপাত পুঁজিবাদ থেকেই। পুঁজিবাদের গর্ভেই সমাজতন্ত্রের জন্ম। কারণ পুঁজিবাদের ত্রুটিবিচ্যুতির ফলে মানুষ যেসব সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল, তা থেকে মুক্তির লক্ষ্যেই কার্ল মার্ক্স সমাজতন্ত্রের ধারণা হাজির করেছিলেন। তবে পুঁজিবাদ একই বিন্দুতে থেমে নেই। বৈশ্বিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পুঁজিবাদও নিজেকে মানিয়ে নিয়েছে সময়ের পরিক্রমায়। তাই সমকালীন পুঁজিবাদের সঙ্গে বোঝাপড়া জরুরি। সমকালীন পুঁজিবাদের প্রেক্ষাপটে ধ্রুপদি মার্ক্সবাদের তিনটি জরুরি প্রশ্নের আলোচনাও তাই জরুরি। শ্রেণি, রাষ্ট্র ও জাতি বিষয়ে ধ্রুপদি মার্ক্সবাদের প্রশ্নগুলো সমকালীন পুঁজিবাদের ক্ষেত্রে কীভাবে প্রাসঙ্গিক কিংবা আদৌ প্রাসঙ্গিক কি না, সে আলোচনা এসেছে মাহবুব উল্লাহর লেখায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখকের দেওয়া নাজমুল করিম স্মারক বক্তৃতার ওপর ভিত্তি করে তিনি এই প্রবন্ধটি তৈরি করেছেন।

পুঁজিবাদের ক্রমাগত ত্রুটি ও ব্যর্থতার চিত্র এখন স্পষ্ট। তাই অনেক বিশ্লেষক ধরেই নিয়েছেন, পুঁজিবাদ চূড়ান্তভাবে ব্যর্থ হয়েই গেছে, যা কার্ল মার্ক্স ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। বৈশ্বিক পরিসরে তেমনি এক স্বনামধন্য মার্ক্সবাদী বিশ্লেষক ও গবেষক জন বেলামি ফস্টার। তিনি লিখেছেন, পুঁজিবাদ ব্যর্থ হয়ে গেছে। কিন্তু এরপর কী হতে চলেছে? বর্তমান পৃথিবীর প্রেক্ষাপটে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার পরবর্তী ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা করেছেন তিনি।

মার্ক্সবাদী তত্ত্বের অন্যতম অবদান হলো এলিয়েনেশন বা বিচ্ছিন্নতার তত্ত্ব। প্রযুক্তির উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে এই বিচ্ছিন্নতার ভিত্তি আরও গভীর হয়েছে। আধুনিক বুর্জোয়া সমাজে মানুষ কীভাবে অপর মানুষ থেকে, নিজের শ্রম থেকে, প্রকৃতি থেকে এবং নিজের সত্তা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়, এই তত্ত্বের মাধ্যমে মার্ক্স তার সুনিপুণ ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন। মনে করা হয়, আধুনিক পৃথিবীর অন্যতম প্রধান সমস্যা এই বিচ্ছিন্নতা।

এই প্রভাবশালী তত্ত্ব কীভাবে মার্ক্সের মনে জায়গা পেয়েছিল? মুহাম্মদ তানিম নওশাদ আলোচনা করেছেন, কীভাবে বাইবেলের একটি ধারণা মার্ক্সবাদী তত্ত্বে জায়গা করে নিয়েছে।

দেশ ও জাতিভেদে রাজনৈতিক গতিশীলতায় পার্থক্য থাকে। তার একটি প্রমাণ হলো মার্ক্সবাদ বা সমাজতন্ত্রের সঙ্গে ইসলামপন্থার ঐক্য। এই দুই মতবাদের মধ্যকার দ্বন্দ্ব বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন আঙ্গিকে দেখা দিয়েছে। কিন্তু তাদের মধ্যে যে ঐক্যও সম্ভব, তার প্রমাণ উত্তর আফ্রিকার কয়েকটি আরব দেশ। তবে তাদের মধ্যকার ঐক্য টিকে থাকেনি। সমাজতান্ত্রিক আদর্শের সঙ্গে ইসলামপন্থী আদর্শের রাজনৈতিক জোট ব্যর্থ হওয়ার পেছনে রয়েছে বেশ কিছু কারণ। সেই চিত্রও পাওয়া যায় ম্যাট বুয়েলারের সম্প্রতি প্রকাশিত একটি বই থেকে। *হোয়াই অ্যালায়েন্স ফেইল : ইসলামিস্ট অ্যান্ড লেফটিস্ট কোয়ালিশনস ইন নর্থ আফ্রিকা* (২০১৮) গ্রন্থে তিনি সেসব কারণ ব্যাখ্যা করেছেন। এর সঙ্গে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট মিলিয়ে বইটি আলোচনা করেছেন মুশফিক ওয়াদুদ।

রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে মিয়ানমার সরকারের দীর্ঘ কয়েক দশকের জাতিগত বৈষম্য ও নিপীড়ন এবং ২০১৭ সালের সেনা অভিযানে হত্যা, ধর্ষণ, লুণ্ঠন, অগ্নিসংযোগ, বসতি নিশ্চিহ্ন করা, বাস্তুচ্যুতির মতো নিষ্ঠুরতার পটভূমিতে আফ্রিকার দেশ গাম্বিয়া জাতিসংঘের সদস্যরাষ্ট্র হিসেবে আন্তর্জাতিক বিচার আদালতে (আইসিজে) মিয়ানমারের বিরুদ্ধে মামলা করেছিল। গণহত্যার উদ্দেশ্যে এসব অপরাধ করেছে বলে মিয়ানমারকে অভিযুক্ত করে সেই মামলা করা হয়েছিল। সম্প্রতি মামলার রায় ঘোষিত হয়েছে এবং তাতে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর সুরক্ষার আদেশ দেওয়ার পাশাপাশি জাতিগত স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু সংকট সমাধানে এই রায়ের প্রভাব কতটুকু? রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশেরই-বা করণীয় কী? এসব বিষয়ে আলোকপাত করে *প্রতিচিন্তা*র পাঠকদের জন্য মন্তব্য আকারে লিখেছেন কামাল আহমেদ।

দর্শন

কার্ল মার্ক্স : জীবনদর্শন

বদরুল আলম খান

পুনরায় মার্ক্স

কার্ল মার্ক্স ১৮১৮ সালের ৫ মে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর মৃত্যু হয় ১৮৮৩ সালের ১৪ মার্চ। এই হিসাবমতে তিনি জীবিত ছিলেন মাত্র ৬৫ বছর। মাত্র বলছি এ কারণে যে আজকের উন্নত প্রযুক্তিবর্ধিত সমাজের সঙ্গে তুলনা করলে ওই জীবন যথেষ্ট সংক্ষিপ্ত বলেই মনে হবে। তবে জীবনের গুণগত প্রাপ্তি দীর্ঘায়ু বা স্বল্পায়ু দিয়ে যে বিচার করা যায় না, তার উদাহরণ ইতিহাসে একটি নয়, একাধিক। প্রখ্যাত সংগীতসাধক মোজার্টের (১৭৫৬-১৭৯১) কথা কে না জানেন! তিনি বেঁচে ছিলেন মাত্র ৩৫ বছর। অথচ কী সমৃদ্ধ, পরিপূর্ণ এবং সৃজনশীলই না ছিল সেই জীবন। এই একই যুক্তি খাটবে মার্ক্সের ক্ষেত্রে। তাঁরও জীবন উত্তাল, সংগ্রামী ও পরিতৃপ্ত ছিল। জোয়ারের জল যে উচ্ছলতা নিয়ে কূলকে আঘাত করে, ঠিক সেভাবে মার্ক্সের জীবনকূলকে আঘাত করে গেছে জাগতিক সুখ-দুঃখের উজাড় করা ভান্ডার। চুম্বকের মতো সেই জীবনের প্রতি মানুষ আকর্ষিত হয়েছে; নানা দেশে, নানা ভাষায় তাঁকে নিয়ে বহু লেখা প্রকাশিত হয়েছে। সে কারণে মার্ক্সবাদচর্চার ক্ষেত্রটি আজ যথেষ্ট সুসিক্ত। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন হতে পারে, কী কারণে তাঁকে নিয়ে এ লেখার প্রয়োজন হলো। কারণটি সম্ভবত এই যে, যে প্রজন্মের আমি প্রতিনিধিত্ব করি, তার বুদ্ধিবৃত্তিক ধ্যান-ধারণার অনেকটাই মার্ক্সের আদর্শ থেকে পাওয়া। তিনি আমার কাছে এবং তাঁর আদর্শিক শত্রুদের কাছে সমমাত্রায় আকর্ষিত হয়েছেন, যদিও ভিন্ন ভিন্ন কারণে। কিংবদন্তির মতো করে তাঁকে দেখার রেওয়াজ সে কারণে উভয়ের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য বলে দাবি করি, যা আজও বিনষ্ট হয়নি, এমনকি দীর্ঘ দুই শতাব্দী কেটে যাওয়ার পরও। সে কারণে তাঁর জীবন নিয়ে কিছু লেখার চাঞ্চল্য আমার মনে বহুকাল ধরে ছিল।

যে জীবন তিনি যাপন করেছেন, সে জীবন আপাতদৃষ্টিতে নিঃস্ব, দীনহীন, অনৈশ্বর্যময় মনে হতে পারে। কিন্তু তার জন্য কোনো অনুশোচনা করার প্রয়োজন তিনি অনুভব করেননি, অকৃত্রিম সততা দেখিয়ে তাকে স্বাভাবিক বলে গ্রহণ করে নিয়েছেন। কোনো এক সময় তাঁর দ্বিতীয় কন্যা লওরার হবু স্বামী পল লাফারগকে তিনি একটি পত্র পাঠিয়েছিলেন। সেখানে মিশ্র অনুভূতি নিয়ে তিনি লিখেছিলেন, 'তুমি তো জানো, জীবনের সবটুকু আমি বিপ্লবের কাজে বিলিয়ে দিয়েছি। তবে তাই বলে কোনো অনুতাপ নেই। বরং যদি সুযোগ ঘটে, তাহলে ঠিক এভাবেই জীবনকে পুনরায় উৎসর্গ করব। কেবল ব্যতিক্রম হবে একটি ক্ষেত্রে। আবার কখনো বিয়ে করব না। আমি জানি, জীবনদারিদ্র্যের রুক্ষ কশাঘাতে আমার স্ত্রীর জীবন টুকরো টুকরো হয়ে গিয়েছিল। তিন-তিনটি সন্তানের মৃত্যুর অসীম যন্ত্রণা আমাকে ও তাকে সইতে হয়েছে। এর পুনরাবৃত্তি আমি চাই না। চাই না আমার সন্তানদের জীবন বিপজ্জনক শৃঙ্গচূড়া থেকে দ্বিতীয়বার ভূতলে পতিত হোক।' জীবন সম্পর্কে মার্ক্সের বিদ্রূপটি পল লাফারগ বুঝেছিলেন কি না জানি না, তবে মুক্তির লক্ষ্যে জীবন উৎসর্গের অন্য কোনো সুচারু উদাহরণ ইতিহাসে আছে বলে মনে করি না। যতই মার্ক্সের জীবনবৃত্তান্তের খুঁটিনাটি দিকগুলোর সঙ্গে পরিচিত হয়েছি, ততই মনে হয়েছে সে জীবন অনেকটা বিটোফেন, দস্তয়ভস্কি, গয়া, তলস্তয়, ইবসেন, নিৎসে বা ভ্যান গঘের ঢঙে তৈরি। অসীম প্রতিভাবান এই ব্যক্তিরা জীবনে গভীর অন্তর্দাহে ভুগেছেন, জীবন ছিন্নভিন্ন হলেও সে জীবন গোষ্ঠীমঙ্গলভাবনা থেকে বিচ্যুত হয়নি। মাঝেমধ্যে এ-ও ভাবি, মানবজাতির অস্তিত্ব হয়তোবা আজও টিকে আছে এই সব মানুষের অবিশ্রান্ত জীবনসংগ্রামের কারণে।

তিনি যে গবেষণাকর্ম রেখে গেছেন, তার মধ্যে ডুব দেওয়া আর মানবসভ্যতার অন্তহীন মহাসমুদ্রে ডুব দেওয়া মনে হবে একই কথা। সেখানে তাঁর অসামান্য আত্মত্যাগের নানা প্রমাণ দেখি। মার্ক্সের বিদ্যাপ্রতিভার প্রতি নানান সময়ে নানাজন নানান উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন। সেগুলোর মধ্যে একটি এখানে উল্লেখ করা অপরাধ হবে না। মোজেস হেস নামের একজন জার্মান দার্শনিক ছিলেন। বেশ দীর্ঘকাল মার্ক্সের সঙ্গে তাঁর হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক বজায় ছিল, যদিও তাঁর মতাদর্শ নিয়ে মার্ক্স কখনো তেমন স্বস্তি বোধ করেননি। বয়সে তিনি মার্ক্সের ছয় বছরের বড় ছিলেন। সবে ডক্টরেট ডিগ্রি শেষ করে মার্ক্স বিশ্ববিদ্যালয় ত্যাগ করেছেন। ঠিক ওই সময় হেস একটি মন্তব্য করেছিলেন, যেটি শোনায় এ রকম, 'শোনো, বর্তমানকালের সত্যিকার দার্শনিক হলেন ডক্টর মার্ক্স। তাঁর দার্শনিক জ্ঞানের গভীরতা এবং সমালোচনা করার তীক্ষ্ণ গুণ সমকালীন কারও মধ্যে দেখিনি। দার্শনিক রুশো, ভলতেয়ার, হলবাখ, লেসিং, হেইন অথবা হেগেলের গুণাবলি দ্রবীভূত আঁকারে যদি একজনের মধ্যে দেখতে চাও, তাহলে সেটি ডক্টর মার্ক্সের মধ্যেই পাবে।'

মার্ক্সের জ্ঞানতীর্থ-ভূমি বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়। সেখানে পরিবেশ যথেষ্ট প্রতিকূল হলেও প্রগতিশীল বুদ্ধিচর্চা তার ক্ষেত্রে থেমে থাকেনি। এখানে থাকাকালে তিনি ইতিহাসের বস্তুবাদী বিশ্লেষণের ধারণাকে শাণিত করেছিলেন। সেই বিশ্লেষণের গঠনপ্রক্রিয়ায় দর্শন প্রাথমিক ভূমিকা পালন করলেও তার সঙ্গে পরবর্তীকালে ফরাসি রাজনীতি (সমাজতন্ত্র) আর ব্রিটিশ অর্থনীতি যোগ হয়েছিল। কাকতালীয়ভাবে মার্ক্স একসময় বলেছিলেন, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের তাত্ত্বিক এবং দার্শনিক পথনির্দেশনায় জার্মানি অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে; প্যারিসের শ্রমিকশ্রেণি গড়ে তুলবে বিপ্লবের রাজনৈতিক কৌশলগত দিক, আর ইংল্যান্ডের শ্রমিকশ্রেণির হাতে শায়েস্তা হবে পুঁজিবাদী অর্থনীতি। সত্যিই হয়েছিল তাই। মার্ক্সের দর্শন শাস্ত্রীয় জ্ঞান জার্মানি থাকাকালে গড়ে ওঠে। রাজনীতি ও সমাজতন্ত্রসংক্রান্ত জ্ঞান প্যারিস ও ব্রাসেলসে, আর পুঁজিবাদী অর্থনীতির ওপর লন্ডনের প্রবাসজীবনে জ্ঞানপ্রশস্ততা আসে। বিপ্লবী আদর্শ গড়ে তোলার প্রয়োজনীয় মালমসলা হিসেবে ওই তিনটি ক্ষেত্রকে কাজে লাগিয়ে এক বিশেষ দিগ্‌দর্শন তাঁর পক্ষে গড়ে তোলা সম্ভব হয়েছিল। একে একধরনের বুদ্ধিবৃত্তিক শ্রমবিভাজন বললে ভুল হবে না যে বিভাজনে ইউরোপের তিনটি উন্নত দেশ অংশ নেয়, যার প্রতিটিতে হয় দর্শন, না হয় রাজনীতি অথবা অর্থনীতি সবচেয়ে বেশি প্রস্ফুটিত হয়েছিল।

তবে এ কথা ঠিক যে মার্ক্সসাধনা আজ এক যুগসন্ধিক্ষণে এসে দাঁড়িয়েছে। তার তত্ত্ব এবং জীবনাদর্শ এক জায়গায় স্থিত নেই, কারণ তাঁর আকর্ষণক্ষমতা নানা বিতর্কের কারণে বেশ খানিকটা হ্রাস পেয়েছে। রাশিয়া, চীন, কিউবাসহ যেসব সমাজতান্ত্রিক সমাজ তাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েছিল, সেসব সমাজ আর টিকে নেই। পুঁজিবাদ ধ্বংস হয়নি, প্রবল প্রতাপ নিয়ে বরং বহাল তবিয়তে আছে। কমিউনিস্ট বিপ্লবের আশঙ্কায় শাসকগোষ্ঠীর মনে হৃৎকম্প শুরু হবে বলে তিনি যে দাবি করেছিলেন, সেই আবেগকম্পন আজ অনুভব করা কঠিন। 'পরাধীনতার শিকল ছাড়া সর্বহারার হারানোর কিছুই নেই' অথবা 'দুনিয়ার মজদুর এক হও' ইত্যাদি স্লোগানের অভ্যন্তরীণ যৌক্তিক গ্রন্থনও হারিয়ে গেছে। কেবল তা-ই নয়, বিশ্বায়নের চাপে মার্ক্সকল্পিত ঊনবিংশ শতাব্দীয় শ্রমিকশ্রেণির চেহারায় এসেছে বিপুল রদবদল। এসব প্রবণতা যদি বাস্তব হয়ে থাকে, তাহলে সমাজ এবং অর্থনীতিশাস্ত্রভিত্তিক যৌথ চৈতন্যের বস্তুবাদী ব্যাখ্যা দিয়ে যে মগ্ন উপাসক আমাদের থেকে বিদায় নিয়েছেন, তাঁর তত্ত্বের গ্রহণযোগ্যতা নিঃশেষ হয়ে গেল কি না, সেটি পুনর্বিবেচনার সুযোগ এসেছে বলে মনে করি।

মার্ক্সের ছেলেবেলা

ছোটবেলা থেকে মার্ক্সের বন্ধুরা তাঁকে 'মুর' বলে সম্বোধন করত। স্ত্রী জেনিও মার্ক্স নামে ডাকার চেয়ে মুর বলে ডাকতে পছন্দ করতেন। এই নামে ডাকার কারণ হচ্ছে

মার্ক্সের চেহারা দেখতে মরক্কো অর্থাৎ উত্তর আফ্রিকার অধিবাসীদের মতো। পরে খোঁজ নিয়ে দেখেছি, ইতালীয় ভাষায় কালো চুলের মানুষকে আজও 'মরো' বলে সম্বোধন করা হয়। তবে আদতে তিনি ইহুদি জাতিগোষ্ঠীর মানুষ ছিলেন, উত্তর আফ্রিকার সঙ্গে বংশগত কোনো সম্পর্ক তাঁর ছিল না। তবু ওই ধরনের মন্তব্য থেকে তাঁর সহপাঠীদের বিরত রাখা সম্ভব হয়নি। মার্ক্স প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেননি। তাঁর শিক্ষার জন্য বাবা বাড়িতে টিউটর নিয়োগ করেছিলেন। মার্ক্সের হাইস্কুলজীবন ১৮৩০ সালে শুরু হয়। আর শেষ হয় ১৮৩৫ সালে। স্কুলে তাঁকে কেউ উপহাস বা ব্যঙ্গ করার সাহস পায়নি। সহপাঠীরা জানত, মার্ক্স রেগে গেলে তীব্র কটাক্ষ করে কথা বলেন, ব্যঙ্গকারীকে কী বলতে হবে, কীভাবে বলতে হবে, সে কৌশল তাঁকে শেখানোর প্রয়োজন হয়নি। ট্রায়েরের জিমনেসিয়ামের (হাইস্কুল) প্রধান শিক্ষক ছিলেন জোহান হুগো উইনেনবাখ। তিনি ছিলেন উদার মনের মানুষ। দার্শনিক রুশো এবং কান্টের দর্শনে আসক্ত হয়ে ফরাসি বিপ্লবকে উদার মনে গ্রহণ করে নিয়েছিলেন। জাকবিনদের বিশেষ ভক্ত হিসেবে জার্মানির দিকে তাকিয়ে তিনি বলতেন, ফরাসি বিপ্লবের ভাগ্য নির্ভর করবে তার যুবসমাজের ওপর। যুবসমাজ সাধারণ মানুষের প্রতি কতটুকু সহানুভূতিশীল, সেটি হবে সামাজিক অগ্রগতির নির্ধারক।

এই মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি নিজের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা যুক্তিযুক্ত নয় ভেবে তিনি 'আ হ্যান্ডবুক ফর দ্য ইন্সট্রাকশন ইন দ্য ডিউটিজ অ্যান্ড রাইটস অব ম্যান অ্যান্ড সিটিজেন' নামে একটি লেখা লেখেন। মার্ক্সকে তিনি যথেষ্ট স্নেহ করতেন। তাঁর আশা ছিল, লেখাপড়ায় মার্ক্স আরও একটু ভালো করবেন (ক্লাসে ৩২ জনের মধ্যে মার্ক্স ৮ নম্বরে ছিলেন)। অবশ্য তাঁরই অভিভাবকত্বে এই গুণধর ছাত্রটি গ্রিক পৌরাণিক নায়ক হোমার বা ওভিডের (এই রোমান কবি *মেটামরফোসিস* লিখে বিখ্যাত হয়েছিলেন) লেখাগুলোর সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন। তাঁর ওপর এসবের প্রভাব সে সময় কতটুকু পড়েছিল, জানি না। তবে সামাজিক সমতা ও মুক্তির অলঙ্ঘনীয় শক্তির টানে তিনি যে বেড়ে উঠেছিলেন, তাতে সন্দেহ নেই। তার প্রমাণ হিসেবে রয়েছে ছাত্রাবস্থায় লেখা একটি প্রবন্ধ। নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি জানিয়ে সেখানে তিনি লিখেছিলেন, 'পেশা নির্ধারণের ক্ষেত্রে মানবজাতির কল্যাণভাবনা এবং শুদ্ধ হওয়ার দিককে গুরুত্ব দিতে হবে। কারণ, সুখী মানুষ তিনি, যিনি সবচেয়ে বেশিসংখ্যক মানুষকে সুখী করতে পারেন' (Easton & Guddat, 1967 :34-37)। মার্ক্সের প্রবন্ধে স্কুল প্রিন্সিপাল জোহান উইনেনবাখের চিন্তার প্রতিফলন ছিল। তবে প্রিন্সিপাল প্রবন্ধকে 'ভালো' এবং 'যুক্তিপূর্ণ' বিবরণ বলে মূল্যায়ন করেছিলেন। উপদেশ আকারে আরও বলেছিলেন মার্ক্সের মধ্যে কোনো কিছুর বিবরণকে অতিমাত্রায় দীর্ঘ এবং চিত্রিত করার প্রবণতা আছে। সে কারণে মার্ক্স কী বলতে চান, সেটি খুব পরিচ্ছন্ন এবং সুনির্দিষ্ট আকারে প্রকাশ পায় না। এই দিক মার্ক্সের লেখায়

অথবা তাঁর আদর্শিক প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে লেখা পলেমিকসে লক্ষ করা কঠিন নয়।

মার্ক্সের আধ্যাত্মিক প্রভাবের আরও বড় উৎস ছিল এলাকার সম্ভ্রান্ত একটি পরিবার। সে পরিবারের কর্তাব্যক্তির নাম ব্যারন ভন অয়েস্তফালেন। অত্যন্ত উদার মনের মানুষ হিসেবে তিনি ফরাসি ইউটোপীয় চিন্তাবিদ সেন্ট সাইমনের প্রচণ্ড ভক্ত হয়েছিলেন। তাঁর গভীর বিশ্বাস ছিল, ভাববাদী চিন্তা কাল্পনিক আকারে প্রকাশ পেলেও তাতে বাস্তবের ছোঁয়া আছে। বলা বাহুল্য, মন্তব্যটি তিনি সেন্ট সাইমনের চিন্তাধারার প্রেক্ষাপটে করেছিলেন। শৈশবে মার্ক্স এই আলোকিত মানুষটি থেকে অনেক কিছু শিখেছিলেন। ব্যারন ভন অয়েস্তফালেনের সঙ্গে মার্ক্সের বাবার ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব ছিল। তবে মনের উদারতার মাপে বাবার চেয়ে তিনি এক ধাপ ওপরে ছিলেন। তাঁরা একসঙ্গে স্থানীয় 'ক্যাসিনো ক্লাবে' সান্ধ্য আড্ডায় যেতেন। পারিবারিক বন্ধু হওয়ার সুবাদে মার্ক্সও ওই বাড়িতে ঘন ঘন যাওয়া-আসা করতেন। বাড়ির নিচতলায় বিশাল একটি লাইব্রেরি ছিল। সেখানে হোমার, শেক্সপিয়ার, বায়রনের লেখাগুলো থরে থরে সাজানো।

মার্ক্সের বাবা আইনবিশেষজ্ঞ। স্থানীয় কোর্টে ব্যারিস্টার হিসেবে কাজ করেন। শহরের সম্মানিত একজন নাগরিক হিসেবে তাঁকে সবাই শ্রদ্ধা করে। তবে আইনজ্ঞ হলেও অন্যান্য বিষয়ের প্রতি তাঁর আগ্রহের ব্যাপ্তি কম ছিল না। বাবার কাছ থেকে মার্ক্স দার্শনিক ভলতেয়ার আর রেশিনের লেখার সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন। বাবার মনও ফরাসি বিপ্লবের মুক্তির আদর্শ আবর্তে অনুপ্রাণিত হয়েছিল। শেক্সপিয়ারের অনেক রচনা, অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসি দার্শনিক ভলতেয়ার বা রুশোর রচনার গুরুত্বপূর্ণ অংশবিশেষ তিনি হুবহু আওড়াতে পারতেন। বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মার্ক্সের ব্যুৎপত্তিগত আগ্রহের মাত্রা বৃদ্ধি পেল। বইয়ের ভুবনে আরও বেশি করে নিমজ্জিত হয়ে পড়লেন। বাবার মতো শেক্সপিয়ারের অনেক রচনার অংশবিশেষ তিনি মুখস্থ বলতে পারতেন। তাঁর প্রায় সব লেখায় শেক্সপিয়ারের রচনা থেকে যেসব উদ্ধৃতি চোখে পড়ে, বিশেষ করে *ক্যাপিটাল* গ্রন্থে, সেগুলো কার্পণ্যহীনভাবে স্থান পাওয়ার কারণ হয়তোবা তাঁর বাবার সান্নিধ্য। অসাধারণ এই কথাশিল্পীর অপ্রধান চরিত্রগুলো সম্পর্কেও মার্ক্সের প্রখর জ্ঞান ছিল। সেই সঙ্গে গ্রিক দর্শনের দ্যোতনাও তাঁর মনকে এড়িয়ে যায়নি। পৌরাণিক রচনা হোমারের *ইলিয়াড* ও *ওডিসি* তো ছিলই, সঙ্গে আরও পরিচিত হয়েছিলেন থালেস, ডেমোক্রিটাস, প্লেটো, অ্যারিস্টটলের রচনার সঙ্গে। যুবা মার্ক্সের আগ্রহের পরিধি কেবল বইয়ের জগতে সীমাবদ্ধ থাকেনি। লাইব্রেরির নিভৃত পরিবেশে তিনি ব্যারন ভন অয়েস্তফালেনের কন্যা জেনির প্রেমে পড়েছিলেন। জেনি মার্ক্সের চেয়ে চার বছরের বড়। কিন্তু বয়োজ্যেষ্ঠ হলেও মার্ক্সের মধ্যে গ্রিক পৌরাণিক বীর প্রমিথিউসের মন দেখেছিলেন। স্বর্গ থেকে আগুন চুরির নাটকে ওই পৌরাণিক চরিত্র যেভাবে মানবজাতিকে উপকৃত করতে চেয়েছিল, মার্ক্সের বৈপ্লবিক বিজ্ঞতার মধ্যে সেই চরিত্রের অমৃতময় প্রতিচ্ছবি দেখে জেনি

অভিভূত হয়েছিলেন। সেই অনুভূতি রূপান্তরিত হয়েছিল গভীর ও সর্বগ্রাসী প্রেমে।

তবে এ কথা ঠিক যে মার্ক্সের বাবা ও মায়ের মধ্যে বুদ্ধিবৃত্তিক বৈষম্য ছিল প্রবল। বাবা পণ্ডিত গোছের মানুষ, আভিজাত্যের উজ্জ্বল প্রতিচ্ছায়ায় তাঁর মন পরিপূর্ণ। সত্যের খুব কাছাকাছি শোনাবে, যদি বলি জ্ঞান আভিজাত্যের এই ধারাটি মার্ক্স বাবার থেকেই পেয়েছিলেন। বাবার তুলনায় মা হেনরিয়েটা অর্ধশিক্ষিতার পর্যায়ে পড়বেন। মা ছিলেন প্রবলভাবে ধর্মাশ্রিত মনের মানুষ। ইহুদি ধর্ম ত্যাগ করে প্রটেস্ট্যান্ট হলেও তাঁর মধ্যে আগেকার ধর্মীয় আভা তার উজ্জ্বলতা হারায়নি। মায়ের আদি বংশপরিচয় ডাচ, ব্যবসায়ী পরিবারের মেয়ে। ফিলিপস নামে যে ইলেকট্রনিক কোম্পানি বাংলাদেশের ঘরে ঘরে একসময় পরিচিত ছিল, মায়ের বাবা-চাচারা তার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। ব্যবসায়ী পরিবার থেকে আসার কারণে চার দেয়ালের বাইরে কী হচ্ছে, তার প্রতি তিনি খেয়াল রাখতেন না। বন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে যাওয়ার পর পুত্রকে তিনি মাঝেমধ্যে চিঠি লিখতেন। বলতেন, 'বাবা মার্ক্স, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকতে চেষ্টা কোরো। কারণ, স্বাস্থ্য ও মনের আনন্দ একে অপরের সঙ্গে সম্পর্কিত। তোমার পড়ার ঘর যেন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকে। সাবান আর স্পঞ্জ ব্যবহার করে ঘর পরিষ্কার রাখবে' ইত্যাদি (Wheen, 2000 :12)। এসব প্রীতি-স্নেহভাজন কথাবার্তা বা উপদেশবাণী মার্ক্সকে আরও বেশি রাগান্বিত করত। তবে এসব ক্ষেত্রে ঘাটতি থাকলেও মায়ের প্রায়োগিক জ্ঞান প্রখর ছিল। মার্ক্স সেটি টের পেয়েছিলেন ছোটবেলা থেকে জীবনের মধ্যগগন পর্যন্ত। নাহলে মা যখন খবর পেলেন পুত্র অর্থনীতির ওপর *ক্যাপিটাল* নাম দিয়ে একটি গ্রন্থ লিখেছেন, তখন তাঁর মন্তব্য ছিল এই, 'বাবা, শুনলাম তুমি পুঁজির ওপর একটি বই লিখেছ। তা বেশ ভালো। তবে আমার পরামর্শ হচ্ছে তুমি বরং পকেটে কিছু পুঁজি সংগ্রহের ব্যবস্থা করো।' পুঁজির শক্তিশালী প্রভাব থেকে মার্ক্সের জীবন ছিল বহুদূরে। পুত্রটি সারা জীবন মায়ের থেকে সহনীয় দূরত্ব বজায় রাখতে পছন্দ করেছেন। বাবার সঙ্গে তাঁর অনেক বেশি ঘনিষ্ঠতা ছিল, যদিও সেটিকে পুরোপুরি সম্প্রীতির সম্পর্ক বলা কঠিন। বাবার সঙ্গে হবু পুত্রবধূর সম্পর্ক গভীর বলাটাই শ্রেয়। হবু শ্বশুরমশায়ের সঙ্গে জেনি সময় কাটাতে প্রায়ই তাঁর বাসভবনে যেতেন। অবশ্য মার্ক্সের মায়ের সঙ্গে জেনির সম্পর্ক কোনোভাবেই ভালো ছিল না। জেনিকে তিনি ভালো চোখে দেখতেন না।

বন বিশ্ববিদ্যালয় পর্ব

জিমনেসিয়ামে পড়া শেষ হলো। এবার বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষা নেওয়ার পালা। মার্ক্স জিমনেসিয়াম থেকে বিদায় নেওয়ার সময় হেডমাস্টারের সঙ্গে দেখা না করেই ট্রায়ের শহর ত্যাগ করলেন। বাবা এতে দুঃখ পেলেন। পুত্রকে কিছুটা ভর্ৎসনার সুরে সেটি স্মরণ করিয়ে দিতে ভুললেন না। বাবার ইচ্ছা ছিল, পুত্র আইনশাস্ত্র নিয়ে

পড়াশোনা করুক। তা-ই হলো। শত প্রতিবাদ সত্ত্বেও ১৭ বছর বয়সী মার্ক্সকে আইনশাস্ত্র পড়তে বন বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতে হলো। বন কোনো আকর্ষণীয় শহর ছিল না। তবে সহপাঠীদের মধ্যে বন্ধন ছিল নিগূঢ়। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার পর মার্ক্স ৯টি লেকচার কোর্সে ভর্তি হলেন। এতে বাবার দুশ্চিন্তা বাড়ল, পুত্রকে লিখলেন, 'এত চাপ নিচ্ছ, মন ও শরীর কীভাবে সুস্থ রাখতে পারবে?' ১৮৩৫ সালে আরও ছয়টি বিষয় পড়ার জন্য মার্ক্স নাম লেখালেন। তার মধ্যে তিনটি আইনের (*এনসাইক্লোপিডিয়া অব জুরিস্প্রুডেন্স*, *ইনস্টিটিউশন* আর *হিস্ট্রি অব রোমান ল*)। কিছু পরে সাহিত্যের ওপর আরও তিনটি (*গ্রিক অ্যান্ড রোমান মিথোলজি*, *হোমার* ও *মডার্ন আর্ট*) যোগ হলো। এর এক বছর পর আরও চারটি কোর্স। তিনটি আইনের ওপর, বাকিটা সাহিত্যের—*হিস্ট্রি অব জার্মান ল*, *ইউরোপিয়ান ইন্টারন্যাশনাল ল* ও *ন্যাচারাল রাইট* এবং *দ্য এলিজিয়াস অব প্রপারটিয়াস*। বনে থাকাকালে এজারমান সরকার মার্ক্সকে বাধ্যতামূলক সামরিক প্রশিক্ষণের জন্য আদেশপত্র পাঠিয়েছিল। কিন্তু যক্ষ্মা ব্যাধির পারিবারিক ইতিহাস থাকার কারণে সামরিক ট্রেনিং থেকে তিনি রেহাই পেলেন (Paul, 2012, 28) । রোগটা মার্ক্স পরিবারে একেবারে অভিশাপের মতো ছিল বললে ভুল হবে না। পরিবারের প্রথম পুত্রসন্তান ওই রোগে মারা গেল। ওই সর্বনাশা ব্যাধি আরও কেড়ে নিল দুই ভাই (মরিস ও হেনম্যান) এবং দুই বোনকে (হেনরিয়েটা ও ক্যারোলাইন)। কেবল মার্ক্স এবং তিন বোন—সোফিয়া (১৮১৬—১৮৮৬), লুইস (১৮২১—১৮৯৩) ও এমিলি (১৮২২—১৮৮৮) বেঁচে গেলেন। ১৮৩৭ সালের প্রথম দিকে বুকের ব্যথা নিয়ে মার্ক্স কয়েকবার চিকিৎসকের শরণাপন্ন হয়েছিলেন। মাঝেমধ্যে মুখ থেকে রক্ত বের হতো। চিকিৎসকের পরামর্শমতে ওই বছর থেকে তিনি স্পা চিকিৎসা শুরু করেন।

বন শহরে মার্ক্সের উচ্ছৃঙ্খল ভারাক্রান্ত জীবনের কিছু ইতিহাস আছে। নিজ বাসস্থানের সামনে কয়েক রাত মাতলামির বিষয়টি প্রতিবেশীদের নজর এড়িয়ে যায়নি। পুলিশের কানে তাঁদের অভিযোগ গেলে মার্ক্সকে এক দিনের জেল খাটতে হয়েছিল (Wheen 2000 : 16)। বাবা পুত্রকে দেখতে এসেছেন, পুত্র বাসায় নেই। গভীর রাতে ফিরলেন। ঘরে ঢুকে বাবা দেখলেন, সবকিছু এলোমেলো হয়ে আছে। তথৈবচ অবস্থা, পা ফেলার জায়গাটুকু পর্যন্ত নেই। চারদিকে বই-কাগজের ছড়াছড়ি। টেবিলের ওপর স্তূপকৃত ছাইদানিতে সিগারেটের অসংখ্য অবশিষ্টাংশ। এসবের সঙ্গে আরও চলছে অবিরাম মদ্যপান। অনেক পরে তাঁর কন্যার শ্বশুরকে মার্ক্স বলেছিলেন, 'যিনি মদ ভালোবাসেন না, তিনি জীবনে ভালো কোনো কাজ করতে পারেন না।' মার্ক্সের মনে ধর্মপ্রীতির কণাবিন্দু না থাকলেও একটি ক্ষেত্রে তিনি সমঝোতা করেছিলেন। ধর্মসংস্কারক মার্টিন লুথারের প্রতি তাঁর একটি সদয় মন্তব্য আছে। এর কারণ, লুথার মদ্যপানকে উৎসাহিত করতেন। দ্বিতীয় আরও একটি কারণ ছিল।

সেটি হচ্ছে লুথারের ধর্মসংস্কারকে মার্ক্স পুঁজিবাদের প্রসারের মূল কারণ হিসেবে দেখেছিলেন। তবে আপাত এই জ্ঞান-প্রসাধিত বিশৃঙ্খলার মধ্যেও নিয়ম ছিল। চিন্তাজগতের যে ধারাবাহিকতা ইতিমধ্যে তাঁর তাত্ত্বিক গর্ভে পরিপক্ব হচ্ছে, যে অন্তমগ্নতা ইতিমধ্যে তাঁর মনকে আচ্ছাদিত করেছে, বিশেষজ্ঞরা ওই বিশৃঙ্খলার মধ্যেও তার প্রতিফলন লক্ষ করেছিলেন।

বেয়াড়া পুত্র

১৮৩৬ সালের অক্টোবর মাসে বন বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে মার্ক্স বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে এলেন। পড়ার বিষয়বস্তু আইনশাস্ত্র। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে লেকচার শোনার প্রতি তাঁর খুব একটা আগ্রহ ছিল না। অচিরেই আইনশাস্ত্রের প্রতি আনুগত্য বিসর্জন দিয়ে দর্শনশাস্ত্রে মনোনিবেশ করলেন। দর্শনের সঙ্গে মার্ক্সের প্রাথমিক পরিচয় হয়েছিল বন বিশ্ববিদ্যালয়ে। তবে বিষয়টির ওপর সত্যিকার অর্থে পরিপক্কতা আসতে দেরি হলো। বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে না এসে ওই পরিপক্কতার কথা তিনি ভাবতে পারেননি। পুত্রের দর্শনপ্রীতির কথা বাবা যে জানতেন না, তা নয়। তবে যে দৃঢ়তার সঙ্গে ওই জ্ঞান বিষয়টি মার্ক্সের সৃজনমানসে স্থান করে নিয়েছিল, বাবা তাতে খুশি ছিলেন না। তাঁর সবিশেষ আশঙ্কার কথা তিনি নরম সুরে মাঝেমধ্যে পুত্রকে জানাতেন; বলতেন, 'দেখো, দর্শনশাস্ত্র পড়ে জীবন চালানো কঠিন হবে। ওটা বাদ দাও। বরং আইনবিদ হও।' যুবা মার্ক্স বাবার সতর্কতার প্রতি কর্ণপাত করেননি। বার্লিনে আসার পর অনেকটা সচেতনভাবে নিজ পরিবার থেকেও মার্ক্স নিজেকে বিচ্ছিন্ন রেখেছিলেন। ট্রায়ের শহর বন শহরের কাছে, দূরত্ব মাত্র ১৫০ কিলোমিটার। বার্লিনের সঙ্গে ট্রায়েরের ভৌগোলিক ব্যবধান সে তুলনায় অনেক বেশি, প্রায় ৭২০ কিলোমিটার। দূরত্বের অজুহাত দেখিয়ে মার্ক্স বাবার মৃত্যুশয্যার পাশে এসে দাঁড়ালেন না। শেষ মিনতি করে মা পুত্রকে চিঠি দিলেন, কিন্তু পুত্র নাছোড়বান্দা। উত্তর দিলেন, 'বার্লিন থেকে ট্রায়েরের পথ অনেক লম্বা। তা ছাড়া এখানে আমার অনেক কাজ। যেতে পারব না' (Wheen, 2000 : 30)। এর এক বছর না যেতেই ১৮৩৮ সালের ১০ মে বাবার মৃত্যুসংবাদ এল, যক্ষ্মা ব্যাধিতে তিনি দেহত্যাগ করেছেন। মার্ক্সের এই আচরণ পরিবারের অনেককে ক্ষুব্ধ করত। তবে সবকিছু ভেদ করে বাবার প্রতি বিশেষ সংবেদনশীল এক অনুভূতি মার্ক্স নিজের মনে সৃষ্টি করে রেখেছিলেন। সেটি সবাই যে জানতেন, তা নয়। বাবা যখন মৃত্যুশয্যায়, মার্ক্সের হবু স্ত্রী জেনি তখন ট্রায়েরে অবস্থান করছেন। মার্ক্সের বাহ্যিক চরিত্র কর্কশ হলেও জেনি জানতেন, ওই কঠোর খোলসের অভ্যন্তরে সজীব ও আবেগপ্রবণ একটি মন লুকিয়ে আছে। সেটি ভেবে বাবার একগুচ্ছ চুল একটি রুপার লকেটে ভরে জেনি মার্ক্সকে পাঠিয়েছিলেন। লকেটটি মার্ক্স সব সময় নিজের কাছে রাখতেন। পিতার প্রতি মার্ক্সের এই কোমল

অনুভূতির বিষয়টি বন্ধু এঙ্গেলস ভালো করেই জানতেন। মার্ক্সের শেষকৃত্য সম্পন্ন হবে। জেনির দেওয়া ওই লকেট এঙ্গেলস সবার অগোচরে মার্ক্সের কফিনে ঢুকিয়ে দিলেন। এর সঙ্গে আরও যোগ হলো তাঁর কোটের পকেট থেকে উদ্ধার করা স্ত্রী জেনি ও তাঁর জ্যেষ্ঠ কন্যার ফটো (Paul, 2012 : 41)।

ব্যবহারিক দিক থেকে মার্ক্সের কিছু দুর্বলতা ছিল। তার কিছু কিছু দিক বন ও বার্লিন থাকাকালে প্রকাশ পেয়েছে। বাবা সে সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। মাঝেমধ্যে নিরুপায় হয়ে পুত্রের কানে সেগুলো তুলে ধরতে দ্বিধা করতেন না। পুত্র দীর্ঘকালের জন্য নীরব। বাবার পত্রের উত্তর দিতে ভুলে গেছেন। পরিবারের সঙ্গেও যোগাযোগ নেই। এমনকি জেনির প্রতিও সাময়িক উদাসীনতার চিহ্ন প্রকাশ পেত (Wheen, 2000 : 30)। বোন, আত্মীয়স্বজনেরা এ নিয়ে উদ্বিগ্ন। ১৮৩৫ সালের ৮ নভেম্বরের একটি ঘটনা। মার্ক্স প্রথমবারের মতো ট্রায়ের শহর ছেড়ে বন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে এসেছেন। কিন্তু পৌঁছানোর খবর দেওয়া যে গুরুত্বের, সেটি ভুলে গেছেন। এটিকে আকস্মিক ত্রুটি হিসেবে বাবা মেনে নেননি। সে সময়কার একটি চিঠি আছে, যেখানে তিনি লিখেছেন, 'বাবা মার্ক্স, তুমি তো জানো, তোমার মা এবং আমি তোমাকে নিয়ে কী দুশ্চিন্তা করি। তোমার অনেক ভালো গুণ আছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি মনে করি, তুমি অত্যন্ত একরোখা এবং আত্মবাদী।' ১৮৩৬ সালের জানুয়ারি মাসে পুত্রকে লেখা অন্য একটি চিঠিতে বাবা জানান, 'প্রত্যেক মানুষের জীবনে শৃঙ্খলা থাকা উচিত, এমনকি কেউ যদি অত্যন্ত প্রতিভাবান স্কলার বা পণ্ডিতও হয়, যেমন তুমি। তুমি আইনবিদ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কথা ভাবছ, অথচ খরচের ব্যাপারে পুরোমাত্রায় উদাসীন। তোমার ক্ষেত্রে সেটি মোটেও সাজে না।' ঠিক এ সময় অনেকটা বাধ্য হয়ে বাবা মার্ক্সের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট সাময়িককালের জন্য বন্ধ রেখেছিলেন। ওই সময় মার্ক্স প্রচুর পয়সা ওড়াচ্ছেন। বাবা দুঃখ করে লিখলেন, 'ধনীর সন্তানেরা যেখানে ৫০০ থালেরের বেশি খরচ করে না, সেখানে তুমি করছ ৭০০ করে।'

তবে ১৮৩৭ সালে বাবাকে লেখা একটি চিঠি আছে। মার্ক্স বাবাকে আশ্বস্ত করে জানাচ্ছেন, 'তুমি যা-ই ভাবো না কেন, আমি কোনো অপদার্থ পুত্র নই। আইনের ওপর ইতিমধ্যে ৩০০ পৃষ্ঠাব্যাপী একটি লেখা লিখেছি। সেখানে নানা ধরনের আইনি প্রত্যয়ের বিশ্লেষণ আছে। আমার কবিতা লেখা চলছে, বিয়োগান্ত একটি নাটকও লিখেছি (নাটকের নাম *স্করপিয়ন অ্যান্ড ফেলিক্স (Scorpion & Felix)*, *আ হিউম্যানিস্টিক নভেল (A Humanistic Novel)* এবং *ওউলানেম (Oulanem)*।' আসল ব্যাপার হচ্ছে মার্ক্স এ সময় প্রচুর কবিতা লিখছেন, অধিকাংশই জেনিকে উদ্দেশ্য করে আর সেগুলো আবেগের ফুলঝুরিতে পূর্ণ। কবিতার মধ্যে *বুক অব লাভ*, *বুক অব সংস* এবং *বুক অব ভারস* উল্লেখ করার মতো। বিশেষজ্ঞরা এসব লেখায় কবি গ্যেটে ও মিলারের প্রভাব লক্ষ করলেও একপর্যায়ে মার্ক্সকে সাহিত্যের জগতে

অনুপ্রবেশের পরীক্ষণ ব্যর্থ ঘোষণা করতে হলো। বাবা তাঁর পুত্রের এসব লেখার কিছু কিছু পড়ার সুযোগ পেয়েছিলেন এবং ব্যাপারটিকে একধরনের অত্যাসন্ন বিপর্যয় ভেবে পরোক্ষভাবে নিরুৎসাহিত করেছিলেন। সাহিত্যে তাঁর মেধার অকার্যকারিতা যে সুনিশ্চিত, সেটি দেরিতে হলেও মার্ক্স অনুধাবন করলেন। পরাজয় স্বীকার করে লিখলেন, 'হঠাৎ অনেকটা জাদুর মতো একটি চিন্তা আমাকে আঘাত করল। আমি সত্যিকার অর্থে কবিতা এবং সাহিত্য বলতে কী বোঝায়, তার উজ্জ্বল আলো প্রত্যক্ষ করলাম, ঠিক যেন দূর থেকে সুন্দর কোনো পরিবৎ প্রাসাদের মতো। আমার এতকালের সব সৃষ্টি ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। আমার জীবনে এক অধ্যায়ের যবনিকা পড়ল, নতুন এক দেবতার সান্নিধ্য পেলাম।' সাহিত্যের অঙ্গনে ব্যর্থতা মার্ক্সকে প্রচণ্ড আঘাত দিয়েছিল। তিনি এমনই হতাশ হয়েছিলেন এবং ভেঙে পড়েছিলেন যে ডাক্তার তাকে নির্জন গ্রামীণ পরিবেশে দীর্ঘ বিশ্রামের উপদেশ দিলেন। বিশ্রামকালে বাবাকে মার্ক্স জানালেন, 'কবিতাকে বিদায় দিয়েছি। এবার আমার উপাস্য দর্শনশাস্ত্র।'

১৮৩৬ সালে মার্ক্স যখন বার্লিন এসে পৌঁছান, তখন রাজনৈতিকভাবে ইউরোপ কিছুটা শান্ত ছিল। কিন্তু তার বেশ কিছু আগে সেখানে নানা পরিবর্তন ঘটে গেছে। সেগুলো মার্ক্সের ওপর গভীর প্রভাব ফেলেছিল। যে বিশেষ সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবেশ সেই পরিবর্তনের সঙ্গে যুক্ত, তার খুঁটিনাটি দিকগুলো না জেনে মার্ক্সের দার্শনিক গতিপথকে বোঝা কঠিন। সে কারণে তার কিঞ্চিৎ উল্লেখ এখানে জরুরি বলে মনে করি। ওই পরিবর্তনের সূত্রপাত হয়েছিল দ্বৈত বিপ্লব দিয়ে। একটি বিপ্লব রাজনীতিতে ঘটেছিল, অন্যটি অর্থনীতিতে। সম্ভবত সে কারণে প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ এরিক হবসবম ইতিহাসের ওই অধ্যায়কে দ্বৈত বিপ্লবের যুগ বলেছিলেন। রাজনৈতিক বিপ্লব ১৭৮৯ সালে ফ্রান্সে শুরু হয়। সে বিপ্লবে রাজতন্ত্র উৎখাত হয়, কিন্তু সাধারণ মানুষ তা থেকে লাভবান হয়নি। বিপ্লবের ফল উঠতি বুর্জোয়া শ্রেণি ভোগ করে। রাজনৈতিক ক্ষমতাও তাদের হাতে স্থানান্তরিত হয়। পরিস্থিতি যাচাই করে অনেকে সে সময় আরও একটি বিপ্লবের আশঙ্কা সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছিলেন। ১৮৩০ সালের দিকে ইউরোপ ঠিকই অস্থির হয়ে উঠল। রাজনৈতিক সংস্কার এবং স্বাধীনতার দাবিতে সেখানে ব্যাপক আন্দোলন শুরু হলো। ১৮৩০ সালের জুলাই মাসে প্যারিসে বখ্‌বো রাজা দশম চার্লস উৎখাত হলেন। তিনি ষোড়শ লুইয়ের ভাই, যিনি ফরাসি বিপ্লবকালে গিলোটিনে প্রাণ হারিয়েছিলেন। প্যারিসের ঘটনা ইউরোপব্যাপী রাজতন্ত্রের শক্তিকে বেশ কিছুটা দুর্বল করে দেয়। এক মাস না যেতেই বেলজিয়ামে বিদ্রোহ—ডাচ শাসন থেকে তারা মুক্তি চায়। ১৮৩০ সালের নভেম্বর মাস থেকে ১৮৩১ সালের মধ্যে পোল্যান্ডেও বিদ্রোহের সূত্রপাত হলো। রুশ শাসন থেকে তারা মুক্তির জন্য লড়ছে। এদিকে ইতালিতেও স্বাধীনতার আন্দোলন জোরদার হয়েছে। হল্যান্ডের অধীনতা থেকে বেলজিয়ামও পৃথক হয়ে স্বাধীনতা

ঘোষণা করেছে। তবে এ সব উথাল-পাথালে ফ্রান্স, বেলজিয়াম ও ইংল্যান্ড সবচেয়ে লাভবান হয়েছিল। কারণ, রাজনৈতিক অস্থিরতার পর সেখানকার শাসকগোষ্ঠী উদারনৈতিক শাসনতন্ত্র প্রবর্তন করতে বাধ্য হয়। প্রতিবেশী দুই দেশ বেলজিয়াম ও ফ্রান্সেও পার্লামেন্টের শাসন প্রতিষ্ঠিত হতে দেরি হয়নি, যদিও রাজতন্ত্রকে কোথাও পুরোপুরি বাদ দেওয়া সম্ভব হয়নি।

উদারপন্থী ও প্রগতিপন্থীদের মধ্যে বিপ্লবী উত্তেজনা থাকলেও জার্মানিতে বড় মাপের কোনো বিদ্রোহ বা অস্থিরতা দেখা দেয়নি। কিছু উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছিল ইউরোপের বাদবাকি দেশের পরিবর্তন দেখে। কিন্তু তাকে বিদ্রোহ বা অস্থিরতা বলা সমীচীন হবে না। রাইনল্যান্ডের কোলন ও আচেন শহরে উত্তেজনা সৃষ্টি হলেও প্রুশিয়ার সেনাবাহিনীর শক্তিশালী উপস্থিতির কারণে সেটি বেশি দূর এগোতে পারেনি। ১৮৩২ সালের মে মাসে রাইনল্যান্ডের হামবুর্গে কৃষক, কারিগর ও ছাত্ররা সার্বভৌমত্বের দাবিতে বিক্ষোভ করেন। প্রত্যুত্তরে সরকার সব ধরনের বাক্‌স্বাধীনতার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে। ট্রায়ের শহর শান্ত থাকলেও নানা কারণে স্থানীয় ক্যাসিনো ক্লাবের ওপর কর্তৃপক্ষের আক্রোশ ছিল। ক্লাবের নানা অনুষ্ঠানে সম্রাটকে সম্মান করে টোস্ট করা হতো না। সেটি একটি কারণ। ১৮৩৪ সালের ১৩ জানুয়ারির এক অনুষ্ঠানে মার্ক্সের বাবাকে নিয়ে বিভ্রাট বাধল। বাবা ক্লাবের এক অনুষ্ঠানে জার্মান সম্রাট ও রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে সূক্ষ্ম সমালোচনা করলেন। খবরটি কর্তৃপক্ষের কানে গেল। কর্তৃপক্ষ যারপরনাই নাখোশ। ক্লাবের সভাপতিকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলে উত্তরে কোনোরকমে ব্যাপারটাকে লঘু করে তিনি কর্তৃপক্ষের সন্দেহ দূর করলেন। বললেন, 'সম্রাটকে আমরা সবাই পছন্দ করি। কিন্তু বেশি পরিমাণে মদ্যপানের কারণে ওই বিচ্যুতি ঘটেছে।' তবে ১৮৩৪ সালের ২৫ জানুয়ারি ক্লাবের সদস্যরা ফ্রান্সের পতাকা উড়িয়ে রাজতন্ত্রের অবসান হওয়ার সংবাদকে স্বাগত জানাতে ভুল করলেন না। ইতিমধ্যে বামপন্থী প্রগতিশীলেরা 'পার্টি অব মুভমেন্ট' নামে একটি আন্দোলন গড়ে তুলেছেন। আন্দোলনটি ফরাসি যাজকদের আদর্শের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল। বার্লিনের ক্যাফেগুলোও সে সময় বুদ্ধিবৃত্তিক আলোচনায় সুসিক্ত। কীভাবে রাজতন্ত্র, সামাজিক কুসংস্কার থেকে জার্মানিকে মুক্ত করা যায়, তা নিয়ে দার্শনিক অন্তঃপুরে নানা তর্কবিতর্ক চলছে। এভাবে প্রগতি ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে যে নীরব সংঘর্ষের ক্ষেত্র ঊনবিংশ শতাব্দীর ৩০-এর দশকের দিকে তৈরি হয়েছিল, সেটি ধীরে ধীরে আরও প্রকট আকার ধারণ করল।

প্রতিক্রিয়া ও প্রগতিযুদ্ধ

যুক্তিবাদ ও মনের উজ্জীবনের বিরুদ্ধে জার্মানির ধর্মীয় গোষ্ঠীর প্রতিরোধ ছিল। তবে সেটি কেবল রাজনীতির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি। ধীরে হলেও আরও সোচ্চার হয়ে

নানা রূপে প্রকাশ পেয়েছে। মার্ক্স যে বছর জন্মগ্রহণ করেন, দার্শনিক হেগেল সে বছর বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনের অধ্যাপক হয়ে এলেন। সারা ইউরোপে সে সময় হেগেলের নামে জপ চলছে। দার্শনিক বলতে তিনিই সবার সেরা। বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে সে সময় ফ্রেডরিক কার্ল ভন সাভিগ্নি নামে আইনশাস্ত্রের একজন অধ্যাপক ছিলেন। প্রচণ্ড রকমের রক্ষণশীল মানুষ ও কট্টর হেগেলবিরোধী। মার্ক্স তাঁর ছাত্র ছিলেন। হেগেলের রচনার প্রতিক্রিয়াশীল নানা অংশ থেকে তিনি উদাহরণ দিতে ভালোবাসতেন। হেগেলের একটি উদ্ধৃতি তাঁর কাছে সবচেয়ে প্রিয় ছিল। সেটি হচ্ছে, 'যা কিছু বাস্তব, তা-ই যুক্তিনির্ভর এবং প্রজ্ঞাসম্পন্ন।' এই উদ্ধৃতি ব্যবহার করে তিনি দাবি করতেন, জার্মানিতে যে অবস্থা বিদ্যমান, সেটি যৌক্তিক ও প্রজ্ঞাপ্রীতিসুলভ। অধ্যাপক সাহেব আরও বলতেন, একটি দেশের আইন ও সরকারের ধরন সে দেশের ঐতিহ্য এবং চরিত্রের ওপর নির্ভর করে। সে কারণে জার্মান রাজতন্ত্রকে সমালোচনা করা অন্যায়। সরকারকে সমালোচনা করা আর জার্মান প্রকৃতি ও ঐতিহ্যকে সমালোচনা করা একই কথা। তার অর্থ হলো বিদ্যমান সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা যেভাবে আছে, সেভাবে রাখতে হবে। সেখানে কোনো পরিবর্তন আনা অপরাধ। কারণ, জার্মান রাষ্ট্র প্রজ্ঞার ওপর নির্মিত আর সে কারণে নির্ভুল। এ বিশেষ বিশ্লেষণের কারণে হেগেলের দর্শন প্রুশীয় রাষ্ট্রের স্বীকৃত দর্শনে পরিণত হয়েছিল। তবে প্রগতিশীল ধারার শিক্ষক-বুদ্ধিজীবীরাও সচেতন ছিলেন। তাঁরা হেগেলের প্রগতিশীল দিককে কোনোভাবে বিসর্জন দিতে চাননি।

প্রগতিশীল ধারার একজন প্রতিনিধি সে সময় বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াতেন। তিনি অধ্যাপক এডওয়ার্ড গান্স। যথেষ্ট প্রগতিবাদী হিসেবে তাঁর বিশেষ নামডাক ছিল। যে বিষয়টি তিনি পড়াতেন, তার নাম 'ইউরোপের সমসাময়িক ইতিহাস'। কোর্সটি কর্তৃপক্ষ পাঁচ বছর আগে নিষিদ্ধ করেছিল। কিন্তু গান্সের জনপ্রিয়তার কথা ভেবে অনেকটা বাধ্য হয়ে পুনরায় এটি পড়ানোর অনুমতি দিতে হলো। হেগেলের দর্শনের সঙ্গে তিনিই মার্ক্সকে প্রথমবারের মতো পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি বলতেন, রাষ্ট্র হচ্ছে হেগেলের রাজনৈতিক দর্শনের মূল প্রতিপাদ্য। আর আদর্শ রাষ্ট্র বলতে হেগেল প্রুশীয় রাষ্ট্রকে বুঝতেন এবং তাকে উচ্চাসনে বসিয়ে রাষ্ট্রকে 'সৃষ্টিকর্তার প্রতীক', 'সর্বোচ্চ নৈতিকতার বাস্তব রূপ' হিসেবে দাবি করতেন। গান্স অবশ্য হেগেলের এই উক্তিকে প্রতিবাদ করেননি। কিন্তু একটি বিষয়কে তিনি সমালোচনা করতেন। তিনি বলতেন, রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানকে মহিমান্বিত করা একমাত্র লক্ষ্য হলে ভুল হবে। রাষ্ট্রের মঙ্গলের কথা ভেবে যুক্তিতর্কভিত্তিক সমালোচনার পথ খোলা রাখা জরুরি। যে নৈতিক দায়িত্ব রাষ্ট্রের ওপর বর্তেছে, সে দায়িত্ব তাঁর পক্ষে পালন করা সম্ভব হবে না, যদি রাষ্ট্রকে সমালোচনার ঊর্ধ্বে রাখা হয়।

রাষ্ট্রকে সমালোচনা করা যুক্তিসংগত কেন, তার ব্যাখ্যা দাঁড় করাতে গিয়ে গান্স

হেগেলের ভিন্ন একটি উক্তির আশ্রয় নিয়েছিলেন। গান্স বলতেন, হেগেল কিন্তু আরও বলেছেন, 'যা কিছু যুক্তিনির্ভর, তা-ই বাস্তব।' যদি তা-ই হয়, তাহলে জার্মান রাষ্ট্রকে যুক্তিভিত্তিক কোনো সংগঠন বলা কঠিন। রাজতন্ত্রের কারণে জার্মান রাষ্ট্র যুক্তিসান্নিধ্য থেকে দূরে। এই রাষ্ট্র কর্তৃত্ববাদী নিয়মে চলে, নাগরিক জীবনের ওপর নানা নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে, পুলিশি শক্তি ব্যবহার করে, যুক্তিতর্ক মানে না। সে কারণে আর যা-ই হোক, এ রাষ্ট্র বাস্তব বা সত্য হতে পারে না। যদি তাকে বাস্তব ও যুক্তিসিদ্ধ করতে হয়, তাহলে তাকে সমালোচনার বাইরে রাখা ঠিক হবে না। নাগরিক সমাজ সমালোচনার সুযোগ না পেলে রাষ্ট্র অনড় এবং শ্লথ হয়ে জীবনীশক্তি হারাবে। সবচেয়ে ভালো হবে যদি সুশীল সমাজ এবং রাষ্ট্রের মধ্যে এই মর্মে একটি চুক্তি সম্পন্ন হয়। যদি তা না হয়, তাহলে জার্মানিতে বিপ্লব অবশ্যম্ভাবী। হেগেলকে নিয়ে দুই পক্ষের মধ্যে এই দ্বন্দ্বযুদ্ধ কখনো শেষ হয়নি। তবে রাষ্ট্রের সঙ্গে নাগরিক সমাজের চুক্তি স্বাক্ষরের যৌক্তিকতা অনেকে উচ্চ স্বরে প্রচার করলেও তার সম্ভাবনা ১৮৪০ সালের মধ্যে বিনষ্ট হয়ে যায়। ওই বছর চতুর্থ ফ্রেডেরিখ উইলহেম ক্ষমতা গ্রহণ করেন এবং প্রুশীয় রাষ্ট্রকে 'খ্রিষ্টধর্মী রাষ্ট্র' হিসেবে গড়ে তোলার অঙ্গীকার করেন। এমনকি হেগেলও তাঁর কাছে অতি প্রগতিশীল হিসেবে চিহ্নিত হন। এরপর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে হেগেলের প্রভাব কমিয়ে আনার যুদ্ধ শুরু হয়। তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী জোহান আলব্রেখট এইকহর্ন নির্দেশ দেন, প্রগতিশীল অধ্যাপকদের এখনই বহিষ্কার করতে হবে। এরপর জনগণের ওপর নির্যাতন ও দমননীতি নেমে এল। প্রত্যুত্তরে বার্লিনের বুদ্ধিজীবী মহল প্রুশীয় রাষ্ট্রকে অযৌক্তিক ঘোষণা করল। তারা দাবি করে, ধর্ম যদি রাষ্ট্রের রক্ষক হয়, তাহলে তাকে নৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে ভাবা যায় না। সে কারণে ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্রকে অযৌক্তিক প্রমাণ করা জরুরি। সেই দায়িত্ব বুদ্ধিজীবীদের নিতে হবে; আর আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু হবে ধর্ম।

জার্মানির প্রতিক্রিয়াশীল চক্র হেগেলকে একহাত দেখে নিতে প্রস্তুত ছিল। 'যা কিছু যুক্তিনির্ভর, তা-ই বাস্তব'—হেগেলের এই দাবিকে প্রতিক্রিয়াশীলদের পক্ষে নিঃশব্দে মেনে নেওয়া সম্ভব হয়নি। অভ্যন্তরীণ রাজনীতির কিছু ঘটনা এই প্রতিক্রিয়াশীল আন্দোলনকে কিছুটা সুবিধা করে দিয়েছিল। জার্মান সম্রাটের ওপর এক আততায়ী হামলা চালালে প্রতিক্রিয়াশীলেরা বললেন, ধর্মের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র চলছে। এরপর আর এক ঘটনা ঘটল। কার্ল স্যান্দের নামের এক প্রগতিবাদী নেতা অগাস্ট ভন কৎজবু নামের রক্ষণশীল একজন নাট্যকারকে হত্যা করলেন। এরপর প্রগতিশীল অধ্যাপকদের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু হলো। অনেক নামকরা অধ্যাপক বরখাস্ত হলেন। বাক্‌স্বাধীনতার ওপর এল নানান বিধিনিষেধ। ইতিমধ্যে ব্রান্ডেনবুর্গ ও আশপাশের অঞ্চলে অভিজাত ও পেশাজীবীদের মধ্যে খ্রিষ্ট মৌলবাদী ও ইভাঞ্জেলিক্যাল প্রভাব বৃদ্ধি পেয়েছে। তারাও সোচ্চার হয়ে দাবি করছে, যুক্তিবাদের

প্রয়োজন নেই, যুক্তিবাদ বিপ্লবকে উসকে দেয়, তা না হলে ফরাসি বিপ্লব হতো না ইত্যাদি। এভাবে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি ক্রমেই শক্তি অর্জন করতে থাকে।

১৮৪০ সালে হেংস্তেনবার্গ নামের অতিরক্ষণশীল একজন অধ্যাপক বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দিলেন। *প্রটেস্ট্যান্ট চার্চ নিউজপেপার* নামের একটি পত্রিকার প্রকাশনার দায়িত্ব নিয়ে তিনি বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের ধর্মতত্ত্ব বিভাগকে হেগেলীয় দর্শনের প্রভাব থেকে মুক্ত করা এবং আরও রক্ষণশীল ধাঁচে গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নিলেন। পত্রিকাটিকে ঘিরে রক্ষণশীল শক্তি সংঘবদ্ধ হলো। তাদের ষড়যন্ত্রে ব্রুনো বাওয়ার বাধ্য হয়ে বার্লিন থেকে বন বিশ্ববিদ্যালয়ে বদলি হলেন। ১৮৩৯ সালের ৫ মে অত্যন্ত অল্প বয়সে এডওয়ার্ড গান্স মারা গেলে মিউনিখ বিশ্ববিদ্যালয়ের বৃদ্ধ অধ্যাপক শেলিং তাঁর স্থলাভিষিক্ত হলেন। অধ্যাপক হিসেবে যোগদানের পর তিনিও ধর্মতত্ত্ব বিভাগকে হেগেলের প্রভাবমুক্ত করার দায়িত্ব নিলেন। এই সব প্রতিক্রিয়াশীল অধ্যাপক প্রুশীয় রাষ্ট্রকে খ্রিষ্টীয় রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। ব্রুনো বাউয়ের ও প্রগতিশীল অধ্যাপকদের সঙ্গে এদের মূল দ্বন্দ্ব ছিল একটিই—বাউয়ের ও তাঁর সমর্থক প্রগতিশীলেরা চেয়েছিলেন রাষ্ট্রকে আইনের শাসনভিত্তিক শাসনতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তুলতে। বাকিরা চেয়েছিলেন জার্মানিকে খ্রিষ্ট ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র হিসেবে টিকিয়ে রাখতে।

জার্মান রাষ্ট্র নিপীড়নের হাতিয়ার হিসেবে ধর্মকে ব্যবহার করতে মনস্থ করার কারণে মানুষের বাক্‌স্বাধীনতার প্রশ্নটি ধর্মের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ে। ঠিক এ সময় (১৮৩৫ সালে) ডেভিড স্ত্রসের লেখা *দ্য লাইফ অব জিসাস* নামে একটি বই প্রকাশিত হয়। রাষ্ট্রের সঙ্গে ধর্মের সম্পর্ক নিয়ে কোনো আলোচনা বা সমালোচনা সেখানে ছিল না। কিন্তু একটি কারণে বইটি তুমুল বিতর্ক সৃষ্টি করল। স্ত্রস সপ্তদশ বা অষ্টাদশ শতাব্দীর ধর্মবিরোধী এনলাইটেনমেন্ট আন্দোলনের কিছু দিককে সমালোচনা করে বইটি লিখেছিলেন। ওই আন্দোলন প্রজ্ঞাবাদীদের হাতে গড়ে ওঠে। তাঁরা বাইবেলের গল্পকে নিছক কাল্পনিক বলে উড়িয়ে দিতেন। কিন্তু স্ত্রস সেগুলো ব্যাখ্যা করে বলেন, অবাস্তব ও অলীক হলেও এর সামাজিক মূল্য আছে। সে কারণে পরিত্যাজ্য ভাবা বা মিথ্যা বলে বাতিল করে দেওয়া ঠিক নয়। প্রগতিশীলেরা বললেন, আসলে যিশুর গল্প কাল্পনিক, বাস্তবের সঙ্গে সম্পর্কহীন। বইটিকে ঘিরে যেসব আলোচনা হতো, তাতে বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের ধর্মতত্ত্বের অধ্যাপক ব্রুনো s অংশ নিতেন। মার্ক্সের জীবনদর্শনে তাঁর একটি উক্তি চিরকালের জন্য গেঁথে গিয়েছিল। এসব আলোচনায় ব্রুনো একটি বিষয়ের ওপর জোর দিতেন। তিনি বলতেন ধর্ম মানুষের প্রকৃত সত্তাকে চূর্ণবিচূর্ণ করে দেয়। মানুষ ধর্মের কারণে তার নিজ সত্তা থেকে পৃথক হয়। স্বর্গের সঙ্গে তার সত্তাকে যুক্ত করার কারণে জীবনে বিচ্ছিন্নতার জন্ম হয়। বিচ্ছিন্নবোধের ধারণা ধর্মীয় মোড়কে প্রকাশ পেলেও মার্ক্স পরবর্তীকালে একে তাঁর দর্শনের

কেন্দ্রবিন্দুতে এনেছিলেন। পুঁজির চরিত্র বিশ্লেষণে ধারণাটি ব্যবহার করে মার্ক্স বলেছিলেন, আধুনিক উৎপাদন প্রক্রিয়ায় পুঁজি অনেকটা ধর্মের মতো। ধর্মের মতো পুঁজিও বাইরে থেকে মানুষের ওপর কর্তৃত্ব করে। সে কারণে ধর্মসৃষ্ট বিচ্ছিন্নতা আর পুঁজিভিত্তিক উৎপাদন পদ্ধতিসৃষ্ট বিচ্ছিন্নতার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই।

বার্লিনের প্রগতিশীল মহল রাষ্ট্রকে প্রধান টার্গেট করেছিল। সঙ্গে ধর্মকেও বাদ দেয়নি। রাষ্ট্রকে ধর্মের প্রভাবমুক্ত করে কীভাবে প্রগতির দিকে এগিয়ে নেওয়া যায়—এ-ই ছিল আলোচনার মূল কেন্দ্রবিন্দু। ইউরোপে ধর্মের সমালোচনা যে ধারায় এগিয়েছিল, সে ধারাটি জার্মানি অনুসরণ করেনি। ইউরোপে প্রগতিবাদী আন্দোলনে ধর্মালোচনা দুই ধরনে প্রকাশ পেয়েছিল। একটি গড়ে ওঠে নিউটনের পদার্থবিদ্যার আলোকে। সেখানে বলা হয় সৃষ্টিকর্তা একজন আছেন, তবে তিনি পৃথিবীকে চালু করে দিয়ে বিদায় নিয়েছেন, ঠিক ঘড়িতে চাবি দেওয়ার মতো। অন্য ধারাটি স্পিনোজার দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির ওপর গড়ে ওঠে। স্পিনোজা দাবি করেন, প্রকৃতি ও সৃষ্টিকর্তার মধ্যে পার্থক্য নেই (Pantheism)। প্রকৃতিই ধর্ম, কারণ, সেখানে প্রতিটি বস্তুর মধ্যে সৃষ্টিকর্তা বিদ্যমান আছেন। প্রকৃতির মধ্যে বাস করে মানুষ প্রতিদিন সৃষ্টিকর্তার সান্নিধ্যে আসে। ফলে পৃথক করে ধর্মবিশ্বাসী হওয়া বা ধর্মের রীতিনীতি পালন করার যৌক্তিকতা নেই। সে কারণে রাষ্ট্রকেও ধর্মের সঙ্গে জড়ানো নিষ্প্রয়োজন। ধারণাটি অত্যন্ত পুরানো এবং বেশ কিছু দার্শনিক ঐতিহ্যে লক্ষ করা কঠিন নয়। তার উদাহরণ হতে পারে সুফিবাদ, ভারতীয় বেদান্ত বা ইহুদি ধর্ম। ইউরোপীয় সাহিত্যেও এর উপস্থিতি লক্ষ করার মতো। ডি এইচ লরেন্স, হুইটম্যান, ওয়ার্ডসওয়ার্থ, কোলেরিজ এবং গ্যেটের লেখায় এর পরোক্ষ উল্লেখ আছে।

জার্মানিতে এই দুই ধারার কোনোটিই কোনো প্রভাব ফেলেনি। তার বদলে সেখানে এক বিশেষ ধরনের ভাববাদী দর্শনের উদ্ভব হয়। সেই দর্শন ধর্মের রক্ষণশীল ভূমিকার বিরুদ্ধে প্রধান অস্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়। দর্শনশাস্ত্রের প্রতি জার্মানির প্রগতিশীল মহলের বিশেষ মর্যাদা অনেকটা আপ্তবাক্যের মতো শোনাবে। সেখানে দর্শনপ্রীতির কিছু প্রতিফলন সে দেশের দার্শনিকদের বিশাল তালিকা থেকে দেখি। ধ্রুপদি অর্থে ওই তালিকায় ফয়েরবাখ বাদে সবাই ভাববাদী দার্শনিক ছিলেন। তাঁদের মধ্যে কান্ট, ফিসটে, শেলিং ও হেগেল ছিলেন মুখ্য। পরে তাঁদের সঙ্গে শোপেনহাওয়ার, ডিলথে, স্টিরনার, নিৎসে, ডুরিংসহ আরও অনেকে যোগ দিয়েছিলেন। বিষয় হিসেবে রসকষহীন হলেও শাস্ত্রটি জার্মান বুদ্ধিজীবীদের প্রগতিশীল অংশের কাছে প্রগাঢ় অনুকম্পার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এর প্রধান কারণ হচ্ছে, জার্মান রাষ্ট্র অতিমাত্রায় রক্ষণশীল হওয়ায় প্রগতিশীলদের হাতে দর্শনশাস্ত্রই ছিল প্রতিবাদ এবং প্রতিরোধের একমাত্র বুদ্ধিবৃত্তিক মাধ্যম। জার্মানিতে বাক্‌স্বাধীনতা এবং পত্র-পত্রিকার ওপর কঠোর নিষেধাজ্ঞা থাকায় রাজনীতির গণ্ডি সীমিত হয়ে পড়ে। সম্রাটের প্রশংসা করার ঐতিহ্য সরকারি আমলা

এবং প্রতিক্রিয়াশীল বুদ্ধিজীবীদের বদৌলতে ঐতিহ্যে পরিণত হয় । সে কারণে ভাববাদী দর্শনের যে ধরনটি জার্মানিতে গড়ে ওঠে, সেটি প্রতিক্রিয়াশীল ছিল না। তার খোসাটা নিরেট ভাববাদী হলেও ভেতরের সারসত্তা ছিল বৈপ্লবিক অন্তঃরসে টইটম্বুর। এই বিশেষ ভাববাদ তিনটি ধাপে বিকশিত হয়। প্রথম ধাপের ভিত গড়ে তোলেন প্রখ্যাত দার্শনিক ইমানুয়েল কান্ট। তাঁর সঙ্গে যোগ দেন ফিখটে। দ্বিতীয় ধাপ দার্শনিক হেগেলের হাতে গড়ে ওঠে। এরপর তৃতীয় ধাপের দায়িত্ব নেয় নব্য হেগেলিয়ান নামে পরিচিত বার্লিনকেন্দ্রিক প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীদের এক গ্রুপ। বিষয়গত এবং পদ্ধতিগতভাবে এদের দর্শনকে পৃথক করা কঠিন, কারণ তারা একই সূত্রে গাঁথা। মার্ক্স এই শেষোক্ত গ্রুপে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলেন। প্রাথমিক পর্যায়ে তাঁর দর্শন এই বিশেষ ভাববাদী দর্শনের প্রভাবে গড়ে ওঠে। পরবর্তীকালে তিনি উপলব্ধি করেন, ভাববাদের কুয়াশাচ্ছন্নতা থেকে জার্মান দর্শনকে মুক্ত করা প্রয়োজন। তার মধ্যে প্রগতির যে বীজ নিহিত আছে, তাকে অন্যভাবে রোপণ করা জরুরি।

মার্ক্স ও ধ্রুপদি জার্মান দর্শন

দার্শনিক জ্ঞানের ক্ষেত্রে মার্ক্স যে বিপ্লবী পরিবর্তন এনেছিলেন, সেটি এক দিনে গড়ে ওঠেনি। নানা বিবর্তন এবং সংশোধনের মধ্য দিয়ে মার্ক্সের মনে সেটি স্থায়িত্ব লাভ করে। বন শহরের তুলনায় বার্লিন ভিন্ন ধাঁচের শহর। বনের মফস্বলীয় পরিমণ্ডল সেখানে নেই। তার বদলে মার্ক্স বুদ্ধিবৃত্তিকতায় টইটম্বুর এক পরিবেশ হাতে পেয়েছিলেন। দেশ, জাতি, ইউরোপের ভবিষ্যৎ-সংক্রান্ত আলাপ নিয়ে বার্লিন গমগম করত আর বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয় ছিল বুদ্ধিবৃত্তিকতার মূল কেন্দ্র। সেটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৮১০ সালে। নামকরা ভাষাবিদ হামবল্ট এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভাইস চ্যান্সেলর হিসেবে প্রখ্যাত দার্শনিক জোহান ফিখটে যোগদান করার পর তৎকালীন স্বনামধন্য অনেক দার্শনিক এবং পণ্ডিত ব্যক্তি এখানে পড়াতে আসেন। ছাত্র হিসেবে মার্ক্সের যে অভ্যাসটি সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল, সেটি হচ্ছে নানা বই থেকে প্রচুর উদ্ধৃতি এবং নোট রাখার অভ্যাস। তাঁর ধ্যানের ব্যাপ্তিও ব্যাপক ছিল। সাহিত্য, দর্শন ও শিল্পকলা—কোনো ক্ষেত্রেই তিনি বাদ রাখেননি। জ্ঞান ঐশ্বর্য অর্জনে তিনি যারপরনাই পারদর্শী ছিলেন। যেসব বই মার্ক্স ওই সময়ে পড়তেন, তার তালিকা যথেষ্ট দীর্ঘ, বিষয়গতভাবেও বৈচিত্র্যময়। একপর্যায়ে তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন, আইনশাস্ত্রের দর্শনের ওপর একটি লেখা লিখবেন। দেখা গেল, এর জন্য উইঙ্কেলম্যানের লেখা *হিস্ট্রি অব আর্ট* পড়া শেষ করেছেন। ইংরেজি ও ইতালীয় ভাষায় প্রকাশিত গবেষণাকাজগুলো পড়তে তিনি ওই দুটি ভাষা শিখে ফেললেন। ট্যাসিটাসের *জারম্যানিয়া* অথবা অ্যারিস্টটলের *রেটোরিক* অনুবাদ কেন প্রয়োজন হলো, তা হয়তো সাধারণ পাঠকের কাছে বোধগম্য নয়, কিন্তু কী

কারণে তাঁর লেখায় ফ্রান্সিস বেকনের দর্শন এবং রেইমারুসের প্রাণিজগতের শৈল্পিক উপজ্ঞা ব্যবহারের ভাবনা মাথায় এল, সেটি উৎসুক্যের বিষয় হতে পারে। পাঁচমিশালি ভাবনার এই সমাবেশ তাঁর লেখার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। সেখানে সাহিত্য থেকে শিল্পকলা, রাজনীতি, এমনকি সংগীতের মতো বিষয়গুলোও বাদ পড়েনি।

দার্শনিক কান্ট যখন তাঁর প্রধান দার্শনিক লেখা *ক্রিটিক অব পিওর রিজন* শেষ করেন, হেগেলের বয়স তখন ১১ বছর। যে বিষয় নিয়ে কান্ট ভেবেছিলেন, সেটি হচ্ছে মানুষের মুক্তি। মুক্তির ধারণাটি ফরাসি বিপ্লব তাঁর মনে স্থান করিয়ে দিয়েছিল। কোন পথে মুক্তি অর্জিত হবে, সেটিই কেন্দ্রীয় প্রশ্ন ছিল। আগেই লক্ষ করেছি, জার্মানিতে রাষ্ট্রকে সর্বোচ্চ আসনে বসানো রীতি-কর্তব্যের মধ্যে ছিল। দেশের রক্ষণশীল দার্শনিকেরা মুক্তি অর্জনের সব দায়দায়িত্ব রাষ্ট্রের হাতে ছেড়ে দিয়েছিলেন। ব্যক্তির দায়দায়িত্বের কথা তাঁরা ভাবেননি। দার্শনিক কান্টই প্রথম, যিনি মুক্তির সংগ্রামকে মানুষের মন ও চেতনার সঙ্গে যুক্ত করেছিলেন। কান্টের আগে ইউরোপীয় দর্শনে মনের সক্রিয়তা নিয়ে ভাবার কোনো ঐতিহ্য গড়ে ওঠেনি। কেবল জ্ঞান অর্জনের পদ্ধতিগত দিক নিয়ে ওই দর্শন উৎসাহী ছিল। মনের ওপর বহির্জগৎ কীভাবে প্রতিফলিত হয় এবং তা থেকে প্রাপ্ত জ্ঞানের প্রকৃতি কী বা সে জ্ঞান কতটুকু গ্রহণযোগ্য, দার্শনিকদের মুখ্য জিজ্ঞাসার বিষয় ছিল সেটি। ফলে বহির্জগতের ওপর মানুষের মন কোনো প্রভাব রাখে কি না, সেটি কখনো দর্শনশাস্ত্রের কেন্দ্রবিন্দুতে আসেনি। অথচ ওই প্রশ্নটিই ছিল মানবমুক্তির প্রশ্নে সবচেয়ে গুরুত্বের বিষয়। আদি গ্রিক দর্শনেও মনের প্রশ্নটি অনুপস্থিত থেকেছে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে জানা, কোন উৎস থেকে তার জন্ম—গ্রিক দর্শন কেবল তার প্রতি অবিভাজ্য আগ্রহ বা উৎসাহ দেখিয়েছে। আদি গ্রিক দার্শনিক থালেস, আনাক্সিগর, বা আনাক্সিমান্দ্রের মধ্যে কেউ জল থেকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি দাবি করেছেন, কেউ আগুন, কেউবা বায়ুকে উৎস হিসেবে ধরেছেন। পরবর্তী সময়ে ওই দর্শনের বিষয়বস্তুতে কিছু পরিবর্তন আসে এবং মানুষের নৈতিক দায়দায়িত্ব, সামাজিক দায়িত্ব, ওই দায়িত্বের পরিধি কী, উচ্চতর সত্তা (সৃষ্টিকর্তা) কী, তার মনোভাব বোঝার উপায় কী ইত্যাদি প্রশ্ন গ্রিক দর্শনে স্থান পায়। কিন্তু হোমার, প্লেটো বা অ্যারিস্টটলের মধ্যে কেউই মনের সক্রিয়তার দিকটি নিয়ে ভাবেননি। তাঁরাও মানুষের মুক্তি রাষ্ট্রের চরিত্রে পরিবর্তন এনে সম্পন্ন করতে চেয়েছেন (Paul, 2012 : 39)।

প্রশ্ন হচ্ছে, প্রায় দুই হাজার বছরের পুরোনো দর্শনশাস্ত্রে যে বিষয়টি কখনো মনোযোগ আকর্ষণ করেনি, সেটি কী কারণে ঊনবিংশ শতাব্দীতে এসে জার্মান দর্শনের মূল ধারা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করল? এ প্রশ্নের উত্তর ইউরোপে শুরু হওয়া এনলাইটেনমেন্ট আন্দোলনের উত্থান-প্রক্রিয়ায় পাওয়া যাবে। ওই আন্দোলন কখন শুরু হয়েছিল, তার নির্দিষ্ট কোনো তারিখ নেই। কিন্তু সাধারণত ষোড়শ শতাব্দীতে শুরু হয়ে সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত বিকশিত হয়েছিল বলে ধারণা করা হয়। আধুনিক

বিজ্ঞানের প্রসারের কারণে এই আন্দোলন শুরু হয়। পদার্থবিদ্যায় নিউটন বস্তুর গতিসংক্রান্ত তত্ত্ব উদ্‌ঘাটন করার পর মানুষের বুদ্ধি এবং ধীশক্তির জয়জয়কার শুরু হয়। এতে চিন্তার দুটি ক্ষেত্র আক্রান্ত হয়। প্রথমত, ঐতিহ্যবাহী ধর্মীয় কর্তৃত্ব সমালোচনার মুখে পড়ে। মানুষ কীভাবে জীবন যাপন করবে, তার তদারকির ভার রাজনৈতিক বা ধর্মীয় কর্তৃত্বের হাত থেকে বিজ্ঞান, প্রযুক্তির হাতে চলে আসে। মানুষ তার ধীশক্তিবলে কোনটি মঙ্গলকর আর কোনটি নয়, তা নিরূপণ করতে সক্ষম—এই দাবি তোলে। এনলাইটেনমেন্ট আন্দোলন ব্যক্তির ক্ষমতায়নের প্রতি মনোযোগ দেয়। ধীশক্তিবলে নিজের সমস্যা নিজে সমাধান করা সম্ভব; আরও সম্ভব প্রকৃতি থেকে পাওয়া সূত্র কাজে লাগিয়ে জীবনকে উন্নত করা—এই ভাবনা যৌক্তিক হলেও এনলাইটেনমেন্ট আন্দোলনের কারণে সংকটে পড়েছিল। প্রজ্ঞাকে অতিমাত্রায় প্রশ্রয় দেওয়ার কারণে জীবন অধিকাংশ ক্ষেত্রে বস্তুবাদ, নিয়তিবাদ, ধর্মহীনতা বা সন্দেহবাদের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। প্রকৃতি যদি যান্ত্রিক হয় ও নির্ধারিত সূত্র অনুসরণ করে এবং জীবন যদি প্রকৃতির মতো যান্ত্রিক ও সূত্র-পরিচালিত হয়, তাহলে মনের স্বাধীনতার বিলুপ্তি ঘটে। মন মুক্তভাবে চিন্তা করার ক্ষমতা হারায়। মনের এই স্বাধীনতাহীনতা এনলাইটেনমেন্ট আন্দোলনের সংকটকে ঘনীভূত করেছিল। মন যদি স্বাধীন না হয় এবং স্বাধীনভাবে ভাবার ক্ষমতা হারায়, তাহলে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে মন বা চেতনা তার গুরুত্ব হারিয়ে ফেলে।

এনলাইটেনমেন্ট আন্দোলনের সংকট প্রকট হলো আর তার ক্ষয়িষ্ণু প্রভাবের মধ্যে থেকে নতুন এক ধারা আত্মপ্রকাশ করল। আন্দোলনটি রোমান্টিক ধারা নামে পরিচিতি পেয়েছিল। যান্ত্রিক ব্যাখ্যাকে বাতিল করে রোমান্টিক আন্দোলন জীবনকে নতুন আলোকে ব্যাখ্যা করার উদ্যোগ নেয়। অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীতে জন্ম নেওয়া এই আন্দোলনের অগ্রভাগে ছিল সাহিত্য। জার্মান কবি ফ্রেডরিখ স্লেগেল এই আন্দোলনের নামকরণ করেছিলেন। আন্দোলনের উদ্দেশ্য তুলে ধরে তিনি বলেছিলেন, মানুষের আবেগকে গুরুত্ব দেওয়া এবং কাল্পনিক ঢঙে সেটি উপস্থাপন করা সাহিত্যের মূল উদ্দেশ্য। সে কারণে কল্পনা, আবেগ ও মনের স্বাধীনতা রোমান্টিক সাহিত্যের মূলমন্ত্র হবে। ব্যক্তিচেতনার ওপর গুরুত্ব দেওয়া, ব্যক্তির চাওয়া-পাওয়ার ওপর জোর দেওয়া, স্বতঃস্ফূর্ততা, আইন ও কাঠামো-নিয়ন্ত্রিত শাসন থেকে মুক্তি, সামাজিক জীবনের পরিবর্তে নিরিবিলি জীবন উপভোগ এই ধারার প্রধান বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়। ধারাটি প্রজ্ঞা বা বুদ্ধির চেয়ে কল্পনাকে প্রাধান্য দিয়েছে। সৌন্দর্য এবং ভালোবাসার প্রতি আনুগত্য দেখিয়েছে। অতীত ইতিহাসের প্রতি, বিশেষ করে মধ্যযুগের পৌরাণিক উপাখ্যান বা ভক্তিবাদ এই ধারায় স্থান করে নিয়েছে কার্পণ্যহীনভাবে। কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থ, কোলেরিজ, বায়রন, শেলি ও কিটসের লেখা থেকে এগুলোর প্রমাণ পাওয়া যায়। ফরাসি সাহিত্যে ভিক্টর হুগো, অনরে দ্য

বালজাক, স্টেন্ডাল, ফ্লবারট বা এমিল জোলার নামও তাঁদের সঙ্গে উল্লেখ করা যাবে।

একদিকে যুক্তিবাদ, অন্যদিকে আবেগ এবং যুক্তিবাদ-বিরোধী ধর্মবিশ্বাস—এই দুই বিপরীত ধারার সংঘর্ষ নিয়ে সে সময় অনেকেই উদ্বিগ্ন ছিলেন। রক্ষণশীল জার্মান রাষ্ট্রের সংস্কার কোন পথে হবে, সে ব্যাপারেও মানুষের দিক্‌নির্দেশনা ছিল না। কান্ট তাঁর সময়ে এই সংকটের দার্শনিক সমাধান খুঁজেছিলেন এবং তাঁর দুটি রচনায় (*ক্রিটিক অব পিওর রিজন* এবং *ক্রিটিক অব প্র্যাক্টিক্যাল রিজন*) সমাধান হিসেবে তিনি এক নতুন দর্শন উপস্থাপন করেন। নতুন দর্শন নির্মাণের জন্য কান্ট দুটি উদ্দেশ্য সুনির্দিষ্ট করেছিলেন। প্রথমত, ঐতিহ্যবাহী ধর্মীয় কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে তিনি অবস্থান নেবেন, তবে ধর্মীয় চিন্তা এবং সৃষ্টিকর্তার ধারণাকে সম্পূর্ণ বাদ দেবেন না। তার লক্ষ্য হবে ধর্মকে ভিন্ন কোন ধারণা দিয়ে প্রতিস্থাপন করা। সেটি করতে গেলে এমন এক প্রত্যয়ের প্রয়োজন, যেটি না ধর্মীয়, না ধর্মবিরোধী। কান্ট সেটি তার 'পিওর রিজন' নামে লেখায় খুঁজে পেয়েছিলেন। এই দার্শনিক প্রশ্নটি পরবর্তীকালে ফিখতে, হেগেল এবং নব্য হেগেলীয়দের মধ্যেও প্রোথিত হয়েছিল। মার্ক্স নিজেও এই চিন্তাপ্রবাহ থেকে বিচ্ছিন্ন ছিলেন না।

কান্টের সমাধানের একটি অংশ তাঁর *ক্রিটিক অব পিওর রিজন*-এ পাওয়া যাবে। ক্রিটিক শব্দটি তিনি ঠিক সমালোচনা হিসেবে ব্যবহার করেননি। ক্রিটিক বলতে তিনি বিশ্লেষণ বুঝিয়েছেন। তিনি চেয়েছিলেন মানুষের প্রজ্ঞার ক্ষমতা পরিমাপ করতে। তার জন্য প্রথমেই জ্ঞান অর্জনের পদ্ধতি নিয়ে তাঁকে আলোচনা করতে হয়েছিল। আমরা জ্ঞান অর্জন করি মূলত ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে। পঞ্চইন্দ্রিয় দিয়ে আমরা প্রকৃতিকে অবলোকন করি। অর্থাৎ মনের সঙ্গে প্রকৃতির মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে জ্ঞান হাতে পাই। ফলে জ্ঞান অর্জনের জন্য দুটি দিকের সক্রিয়তার প্রয়োজন হয়। একটি মানুষের মন; অন্যটি মানুষের ইন্দ্রিয়। কান্ট বলেছেন, বৈধ জ্ঞান হচ্ছে সেই জ্ঞান, যা ওই দুইয়ের (মন ও ইন্দ্রিয়) প্রচেষ্টা থেকে অর্জিত জ্ঞান। এই দুইয়ের যেকোনো একটি অনুপস্থিত থাকলে সে জ্ঞান বৈধ নয়। কান্টের আগে দার্শনিকেরা হয় ইন্দ্রিয়ের ভূমিকা অথবা ইন্দ্রিয়ের চেয়ে মনকে জ্ঞানের একমাত্র উৎস হিসেবে প্রাধান্য দিতেন। কান্ট মধ্যম পথ অনুসরণ করেছিলেন। তার ফলে জ্ঞানকে এবং সংকীর্ণ অর্থে দর্শনকে ধর্মের প্রভাব থেকে বিচ্ছিন্ন রাখা সম্ভব হয়েছে। প্রজ্ঞা বা যুক্তিকেও বাতিল করার প্রশ্ন ওঠেনি। একটি উদাহরণ দিয়ে সেটি বোঝানো সম্ভব। নানা ধর্মীয় প্রশ্নের মধ্যে আমরা যে প্রশ্নের সবচেয়ে বেশি মুখোমুখি হই, সেটি হচ্ছে 'ঈশ্বর আছেন কি না'। কান্টের কাছে এ প্রশ্ন অর্থহীন। কারণ, এর উত্তর ইন্দ্রিয় বা অনুভূতির মাধ্যমে দেওয়া সম্ভব নয়। হয়তো আমাদের মন বা মনের আবেগের উত্তর দেওয়ার সম্ভাবনা যাচাই করতে পারে, কিন্তু ইন্দ্রিয়ের জগতে তার কোনো উত্তর নেই। সে কারণে সৃষ্টিকর্তাসংক্রান্ত যেকোনো প্রশ্ন জ্ঞানের ক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক। ফলে যে পিওর রিজনের

কথা তিনি বলেছেন, সেটি এমন এক সত্তা, যা মন ও ইন্দ্রিয়ের মিথস্ক্রিয়া থেকে সৃষ্ট এবং সে কারণে সর্বজনীনভাবে যেকোনো সমাজ বা জাতিগোষ্ঠীর কাছে গ্রহণীয়। জ্ঞানের এই তাত্ত্বিক ভিত গড়ে তুলে কান্ট ধর্মীয় ভাবধারাকে আঘাত না করলেও তার ভূমিকাকে সাংঘাতিকভাবে সীমিত করতে পেরেছিলেন। কান্টের দর্শন ছিল মন ও ইন্দ্রিয়ের সমঝোতার দর্শন।

এ সমঝোতার সঙ্গে কান্টের প্রাক্টিক্যাল দর্শনকে যুক্ত করে দেখতে হবে। কারণ, সেখানে নিহিত রয়েছে কান্টের বৈপ্লবিক সমাজভাবনা। কান্টের প্রাক্টিক্যাল দর্শন মানুষের নৈতিকতাকে নিয়ে। নৈতিকতা সম্পর্কে তাঁর জিজ্ঞাস্য—আমাদের কার্যকলাপকে কখন নৈতিক বলা ঠিক হবে? কান্টের উত্তর হচ্ছে মানবজাতিকে সাহায্য করা সবচেয়ে বড় নৈতিক দায়িত্ব। সাহায্য বলতে কান্ট দৈনন্দিন সাহায্য বোঝাননি। তিনি বলেছেন, মানুষ প্রকৃতিগতভাবে মুক্ত এবং প্রজ্ঞাসম্পন্ন সত্তা। সেই সত্তাকে বাঁচিয়ে রাখা মানুষের নৈতিক দায়িত্ব। খাদ্য বা আশ্রয়ের জন্য সংগ্রাম করা যেমন তার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য, তেমনি নিজেকে এবং অন্যকে স্বাধীন ও মুক্ত রাখা তার নৈতিক দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। কান্টের মতে মানুষের মনকে এমনভাবে সক্রিয় রাখা প্রয়োজন, যেন সে মন সবার মুক্তির লক্ষ্যে নিবেদিত থাকে। দৃষ্টিভঙ্গিটি ভাববাদে মোড়ানো হলেও এই ভাববাদ মানুষের মুক্তি ও স্বাধীনতার পক্ষে ছিল। মন ও চেতনার সক্রিয়তা এবং মানবমুক্তির এই দিকটি কান্টের দর্শনে যেভাবে উপস্থাপিত হয়েছে, মার্ক্স সেখানে বিপ্লবী চেতনার আভাস পেয়েছিলেন। কান্টের দর্শনের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার সেটিই ছিল প্রধান কারণ।

দার্শনিক ভাবনার দিক থেকে ফিখটে কান্টের সমগোত্রীয় ছিলেন। কিন্তু কান্টের বিশুদ্ধ প্রজ্ঞার ধারণাকে তিনি মৃদু সমালোচনা করেছিলেন। মানুষের মুক্তির প্রশ্নে কান্ট বিদ্যমান সমাজে পরিবর্তন আনার কথা বলেছেন, মানুষের মন বা চেতনা সেই পরিবর্তনের মূল চালিকাশক্তি হবে। মনকে প্রথমে প্রজ্ঞাবান হতে হবে। প্রজ্ঞাপ্রভাবিত মন সমাজে পরিবর্তন আনবে। প্রজ্ঞাকে কান্ট সমাজবিচ্ছিন্ন বিশুদ্ধ প্রজ্ঞা (*ক্রিটিক অব পিওর রিজন* ১৭৮১ সালে প্রকাশ পায়) হিসেবে বিবেচনা করেছিলেন কেন, সেটি আগেই উল্লেখ করেছি। ফিখটে এ ব্যাপারে সংশয়হীন ছিলেন না। তাঁর সমালোচনা করেছিলেন এ কারণে যে বিশুদ্ধ প্রজ্ঞা দিয়ে মুক্তি আনা কঠিন। কারণ, যে জগৎ মনের বাইরে, সে জগৎ মুক্তির পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। সে কারণে প্রথমে সামাজিক প্রতিবন্ধকতা ভাঙতে হবে। সেটি করতে গেলে মনকে নির্জীব হলে চলবে না। তাকে সক্রিয় করে তুলতে হবে। কাজটি সম্পন্ন করার দায়িত্ব তিনি দর্শনশাস্ত্রের ওপর ন্যস্ত করতে চেয়েছিলেন। যুক্তি বা প্রজ্ঞাপ্রভাবিত মনকে সমাজের অংশ হিসেবে ভাবা প্রয়োজন। কারণ চেতনার স্তর কোন পর্যায়ে আছে, সেটি যেহেতু সামাজিক বাস্তবতার ওপর নির্ভর করে, সেহেতু মনকে এক

ধাপ এগিয়ে ওই বাস্তব জগতে পরিবর্তন আনার কৌশল নিয়েও ভাবতে হবে। ফিখটের দর্শন মার্ক্সের কাছে অনেক বেশি আকর্ষণীয় মনে হয়েছিল। কারণ, মুক্তির কথা ভেবে তিনি মন বা চেতনার সক্রিয়তার কথা বলেছিলেন। তবে ফিখটের সক্রিয় মনের ধারণায় যে বৈপ্লবিক উপাদান ছিল, তাতে মার্ক্স অভিভূত হলেও পুরোপুরি সন্তুষ্ট হননি। ফিখটের চেয়ে তিনি হেগেলের দর্শনের প্রতি বিশেষ করে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। বাবাকে তাঁর সর্বশেষ আবেগের কথা জানিয়ে মার্ক্স একটি চিঠি লিখেছিলেন। উত্তরে বাবা উপদেশ দিয়ে বলেছিলেন, 'বাবা মার্ক্স, জ্ঞানের প্রতিটি ভান্ডারে যাওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। তাতে তোমার মেধাশক্তির অপচয় হবে।' চিঠিটি তিনি ১৮৩৭ সালে লিখেছিলেন।

হেগেলের দর্শন বৃত্তবন্দী হয়েছিল দার্শনিক কান্ট এবং ফিখটের দর্শনের প্রভাবে। এরা প্রত্যেকে তাঁদের কালে অত্যন্ত প্রভাবশালী ভাববাদী দার্শনিক ছিলেন। মার্ক্সও সমাজে ধনবৈষম্যের সমাধান বের করতে হেগেলের দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির অলংকৃত গহনে ডুব দিয়েছিলেন। তিনটি প্রধান কারণে মার্ক্স হেগেলের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। মার্ক্সের দাবি—দর্শনশাস্ত্রকে হেগেল তাঁর নির্জন অস্তিত্ব থেকে মুক্ত করেন। হেগেলের আগে দর্শনশাস্ত্র যেভাবে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল, সেটি বোঝাতে মার্ক্স নির্জনতা শব্দ ব্যবহার করেছেন। প্রাচীন গ্রিক দর্শনে কেবল নয়, হেগেলের বহু আগে দর্শনশাস্ত্র মানুষ ও বহির্জগৎকে পৃথক সত্তা হিসেবে দেখার অভ্যাস গড়ে তোলে, যদিও তার সূত্রপাত হয়েছিল গ্রিক দার্শনিকদের হাতে। বস্তুজগৎ সমাজের বাইরে থাকা সত্তা এবং তাকে জানার একমাত্র মাধ্যম হচ্ছে ধ্যান—এ-ই ছিল তাঁদের বিশ্বাস। অথচ হেগেল বলেছিলেন চেতনা এবং বহির্জগতের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা না করে মুক্তি আনা সম্ভব নয়। আর দর্শনশাস্ত্রকে দায়িত্ব নিতে হবে ওই ঐক্য প্রতিষ্ঠার কাজে সহায়তা করার।

হেগেলের এই দৃষ্টিকোণ অনুসরণ করে মার্ক্স দর্শনশাস্ত্রকে ধ্যানের পরিমণ্ডল থেকে বের করতে চেয়েছিলেন। মার্ক্স বলেছিলেন, জগৎ সম্পর্কে ধ্যান নয়, তার রূপান্তরকরণ প্রয়োজন। ধ্যান সমাজে রূপান্তর আনে না। রূপান্তরকরণের জন্য মানুষের ইচ্ছাশক্তিকে জাগিয়ে তুলতে হয়। মনের সক্রিয়তাই মানুষের আশা এবং আকাঙ্ক্ষাকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার একমাত্র পথ। হেগেলের একটি বই পড়ে মার্ক্স উচ্ছ্বসিত হয়েছিলেন। বইটির নাম *ফেনোমেনোলজি অব মাইন্ড*। মার্ক্স বলেছিলেন, হেগেলের লেখাটি তাঁর আগের সব চিন্তাকে উল্টে দিয়েছিল। লেখাটি দীর্ঘ এবং ধোঁয়াটে হলেও তার সারসত্তা মার্ক্সের কাছে আকর্ষণীয় মনে হয়েছে। তবে হেগেলের চিন্তাস্রোতের ভাববাদী খোসাকে মার্ক্স পছন্দ করেননি। সে কারণে তাঁকে তিনি সযত্নে বাদ দিয়েছিলেন। হেগেল-সংক্রান্ত আলাপ সংক্ষিপ্ত আকারে হলেও এখানে উপস্থাপন করা বাঞ্ছনীয়, কারণ, তাঁর দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি না জেনে মার্ক্সকে জানা যাবে না।

লেখালেখির ভুবনে হেগেল বেশ দেরিতে প্রবেশ করেন। এ দাবির কারণ হচ্ছে কেবল ৩৭ বছর বয়সে তিনি তাঁর প্রথম লেখা *ফেনোমেনোলজি অব মাইন্ড* (১৮০৭) প্রকাশ করেন। এই বিলম্বের সঠিক কারণ জানা নেই। তবে উচ্চ বিদ্যাপীঠে তিনি বেশ দেরিতে শিক্ষাদানের সুযোগ পেয়েছিলেন। বস্তুত বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি অধ্যাপক হয়ে এসেছিলেন ৪৮ বছর বয়সে। সম্ভবত সে কারণে লেখালেখি নিয়ে এর আগে তেমন মাথা ঘামাননি। যা-ই হোক, তাঁর ভাববাদী দর্শনের যে দিকটি স্বতন্ত্র, সেটি হচ্ছে সামাজিক অনাচার থেকে মানুষকে মুক্ত করা। মুক্তির ধারণাটি তাঁর মনে ফরাসি বিপ্লবের প্রভাবে গড়ে উঠেছিল। সেটি তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন। বিপ্লবকালে তাঁর বয়স ছিল মাত্র ১৯ বছর। কিন্তু তা হলেও তৎকালীন ইউরোপীয় চেতনায় ওই বিপ্লবী পরিবর্তনের গুরুত্ব কতটুকু, সেটি তিনি উপলব্ধি করেছিলেন এবং অভিভূত হয়েছিলেন। ১৮২০ সালের দিকে তাঁর লেখা *দ্য ফিলোসফি অব হিস্ট্রি* প্রকাশিত হয়। সেখানে তিনি দাবি করেন, আধুনিক ইতিহাসে মানুষের মুক্তির সংগ্রাম দুটি পথ ধরে অগ্রসর হয়েছে। একটি লুথারের ধর্মসংস্কার। সেটি জার্মানিতে শুরু হয়। হেগেল ওই সংস্কারের গুরুত্বকে অপরিসীম ভেবেছিলেন। কারণ, ওই বিপ্লব প্রথমবারের মতো মানুষের চেতনাকে বাইরের কর্তৃত্বকারী শক্তি থেকে মুক্ত করে। আর তার ফলে জার্মান জাতির মধ্যে অন্তর্মুখী ধ্যান বা আত্মিকতার প্রসারপথ উন্মুক্ত হয়। ধর্মীয় বিশ্বাস থেকে চিন্তাশক্তিকে মুক্ত করা এবং মন বা চেতনার সক্রিয়তার ওপর জোর দেওয়ার এই আবেদন কান্টের মতো হেগেলের দর্শনেও প্রাধান্য পেয়েছিল। সে কারণে এই সংস্কারকে তিনি মানবমুক্তির অন্যতম ধাপ হিসেবে দেখেছিলেন।

হেগেল মুক্তির দ্বিতীয় পথ রাজনীতিতে দেখেন। রাজনীতি বলতে তিনি সুনির্দিষ্টভাবে ফরাসি বিপ্লবের ভূমিকা ও অবদানকে বুঝিয়েছেন। তার কারণ হচ্ছে, অনেক সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও এই বিপ্লব মুক্তির আকাঙ্ক্ষাকে বিমূর্ত ভাবনার জগৎ থেকে রাজনীতি এবং নানা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে প্রকাশ করার সুযোগ করে দিয়েছিল। রাজনৈতিক অর্থে ফরাসি বিপ্লবের যুক্তিবাদী সংস্কার জার্মানিতে শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হয়। ফ্রান্সের মতো সন্ত্রাসের প্রয়োজন হয়নি। তবে মুক্তি কোন পথে আসবে, তা নিয়ে দার্শনিকদের মধ্যে মতভেদ ছিল। হেগেল ভেবেছিলেন যুক্তি এবং প্রজ্ঞার কৌশলী প্রয়োগ করে সমাজে মুক্তি আনা সম্ভব। যুক্তি দিয়ে সামাজিক জীবনকে সঠিকভাবে বিশ্লেষণ করে সত্যে উপনীত হওয়া সহজ হয়। ওই সত্য তথ্য সমাজে সংস্কার আনার সম্ভাবনা সৃষ্টি করে। নেপোলিয়নের শাসনকালকে তিনি বহুলাংশে প্রজ্ঞাভিত্তিক হিসেবে মেনে নিয়েছিলেন কিন্তু সংস্কৃতিনিরপেক্ষ হওয়ার কারণে ওই সংস্কারের কিছু দিক হেগেলকে মর্মাহত করেছিল। জাতি বৈশিষ্ট্যহীন সংস্কার তিনি পছন্দ করেননি।

ফেনোমেনোলজি অব মাইন্ডে হেগেল কেন্দ্রীয় একটি ধারণা থেকে অগ্রসর হয়েছিলেন। ধারণাটিকে তিনি 'বৈশ্বিক আত্মা' বলে পরিচিত করেন। কিন্তু তাকে

নিয়ে নানা বিভ্রান্তি ছিল। হেগেল বৈশ্বিক আত্মাকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আধ্যাত্মিকতার প্রতীক হিসেবে দেখার আবেদন করেছিলেন। কিন্তু বৈশ্বিক আত্মা সমাজের বাইরে অবস্থান করে। সে কারণে অনেকে বৈশ্বিক আত্মাকে সৃষ্টিকর্তার সঙ্গে তুলনা করে সংশয়ে ভুগেছিলেন। হেগেল এর পক্ষে বা বিপক্ষে সুনির্দিষ্ট কোনো মন্তব্য রেখে যাননি। তবে সমাজের বাইরে অবস্থান করলেও ব্যক্তির সঙ্গে বৈশ্বিক আত্মার সম্পর্ক অনেক গভীর। কারণ ব্যক্তিমন বা চেতনা ওই বৈশ্বিক আত্মারই প্রতিফলন, ঠিক সূর্যের আলোর মতো। এক বিন্দু থেকে বিকিরিত হয়ে ভূমণ্ডলের প্রতিটি বস্তুকে সূর্য যেভাবে আলো দেয়, ঠিক সেভাবে বৈশ্বিক আত্মা আমাদের প্রত্যেকের মনকে আলোকিত করে। কেবল সমস্যা হচ্ছে বৈশ্বিক আত্মার মধ্যে যে সচেতনতা এবং শক্তি, তার পূর্ণ বাস্তবায়ন ব্যক্তিপর্যায়ে ঘটে না। বৈশ্বিক আত্মার পূর্ণ প্রতিফলন আমাদের চেতনায় হয় না। কেবল আংশিক ও সীমিতভাবে মানুষের চেতনাকে আলোকিত করে। সে কারণে ব্যক্তিচেতনা বৈশ্বিক আত্মার মতো পূর্ণ অর্থে মুক্ত বা স্বাধীন নয়। ফলে আত্মসচেতনতার পর্যায়ে পৌঁছানো আমাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। সাধারণ মানুষ বৈশ্বিক চেতনার ভগ্নাংশটুকু পাওয়ার কারণে বাস্তব জগৎকে পরিপূর্ণভাবে বোঝা বা নিজেকে বাস্তব জগতের বাধাবিপত্তি থেকে মুক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে তার ক্ষমতা খুবই সীমিত। ফলে আমাদের চেতনা বস্তুজগৎ সম্পর্কে পুরোপুরি ওয়াকিবহাল হতে পারে না। আর তারই প্রতিফল হিসেবে সমাজ বা বস্তুজগৎকে পরিবর্তন করার ক্ষমতা থেকেও আমরা বঞ্চিত হই।

আত্মোপলব্ধির ক্ষেত্রে এই অসম্পূর্ণতা ও অক্ষমতা হেগেলকে পীড়িত করেছিল। তবে বৈশ্বিক আত্মার প্রভাব আংশিকভাবে আমাদের চেতনায় প্রতিফলিত হলো কেন, হেগেল তার একটি ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন ব্যক্তিচেতনা ও 'বৈশ্বিক আত্মার' মধ্যে ভুল-বোঝাবুঝি আছে। বৈশ্বিক আত্মার অংশ হয়েও ব্যক্তিচেতনা ওই দিক সম্পর্কে সচেতন নয়। ব্যক্তি ও বৈশ্বিক আত্মার মধ্যে এই দূরত্বকে হেগেল 'মনের বিচ্ছিন্নতা' হিসেবে ব্যাখ্যা করেছিলেন। বৈশ্বিক আত্মার অসীম ক্ষমতা আছে কিন্তু সে ক্ষমতা সম্পর্কে ব্যক্তিচেতনা ওয়াকিবহাল নয়। অন্যদিকে বৈশ্বিক আত্মা জড় নয়। তার উদ্দেশ্য মানুষের মুক্তি নিশ্চিত করা এবং সে লক্ষ্যে সে অত্যন্ত সক্রিয়। অন্যদিকে বৈশ্বিক আত্মা মানুষের মুক্তি নিশ্চিত করতে অপারগ, কারণ, ব্যক্তিচেতনা ওই ক্ষমতা সম্পর্কে সচেতন না হওয়ায় পৃথিবীকে মুক্ত করা বা সামাজিক ক্ষেত্রে পরিবর্তন আনা তার পক্ষে সম্ভব হয় না। তবে হেগেল অবশ্য এই বাধাকে নিতান্তই সাময়িক ও ক্ষণস্থায়ী হিসেবে দেখেছিলেন। বৈশ্বিক আত্মা স্বাধীনতা ও মুক্তির সংগ্রামে নিবেদিত, সে কারণে ইতিহাস কোনো না কোনো পর্যায়ে মানবমুক্তির দিকে এগিয়ে যাবে এবং সমাজকে মুক্ত করবে। অন্য কথায় মানুষের মনের সক্রিয়তাই হচ্ছে মূল। মার্ক্স হেগেলের এই বিকাশ তত্ত্বের মধ্যে বিপ্লবী উপাদান দেখেছিলেন।

কীভাবে বৈরী পরিবেশগত বাধা অতিক্রম করে বৈশ্বিক আত্মা পূর্ণ মুক্তির দিকে অগ্রসর হয়েছিল, হেগেলের ঐতিহাসিক বিকাশ তত্ত্বে তার উদাহরণ আছে। হেগেল বলেছেন, বৈশ্বিক আত্মার মধ্যে সক্রিয়তা তাকে বিভিন্ন সমাজের ওপর পরিভ্রমণ করার সুযোগ তৈরি করে দেয় এবং তার কারণে নানা মাত্রায় তাদের ওপর প্রভাব রাখার সুযোগ পায়। তত্ত্বতালাশের মাধ্যমে হেগেল দাবি করেছেন, মানব ইতিহাসের প্রথম পর্যায়ে ব্যক্তিচেতনা বা গোষ্ঠীচেতনা বৈশ্বিক আত্মার সংস্পর্শে আসেনি। কারণ, চেতনা তখন ইন্দ্রিয়ানুভূতি দ্বারা আচ্ছাদিত ছিল। ইন্দ্রিয়ানুভূতি থেকে পাওয়া জ্ঞান হেগেলের ধারণায় নিকৃষ্ট এবং সে কারণে তাঁকে তিনি 'ক্রুড এম্পিরিসিজম' বলেছেন। ঠিক ওই কারণে চেতনার প্রস্ফুটনে বৈশ্বিক আত্মার কোনো ভূমিকা ছিল না। প্রগতির প্রাণবীজ যেহেতু চেতনা, ইতিহাসের ওই অধ্যায়ে চেতনার আপেক্ষিক নিষ্ক্রিয়তার কারণে সমাজে কোনো পরিবর্তন আসেনি, মুক্তির পথও উন্মুক্ত হয়নি। এরপর 'বৈশ্বিক আত্মা' কিছু মাত্রায় সক্রিয় হতে পেরেছে এবং মুক্তির পথে গতি এসেছে। ক্রমান্বয়িক এবং ধাপে ধাপে বিকশিত হয়ে বৈশ্বিক আত্মা এই প্রক্রিয়ায় অঙ্কুর আকারে প্রথমে পারস্য সমাজের ওপর তার প্রভাব ফেলে। তা থেকে পারস্য সভ্যতার জন্ম হয়। ওই প্রভাব বড় আকারে আসেনি। সে কারণে পারস্য সমাজ পূর্ণ অর্থে গণতন্ত্রের পথে বিকশিত হতে পারেনি। স্বৈরাচারী সম্রাটের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং একমাত্র তিনিই স্বাধীনতা ভোগ করেছেন। ফলে সামাজিক মুক্তির মাত্রা সেখানে যৎসামান্য পরিমাণে ছিল। বৈশ্বিক আত্মা এরপর গ্রিক পলিসে আসে। সেখানে আরও বেশি মাত্রায় স্বাধীনচেতনার বিকাশ ঘটে। এরপর বৈশ্বিক আত্মা রোম সাম্রাজ্যে পৌঁছায়। তার প্রভাবে রোমে দাসপ্রথার জন্ম হয়। অধিকাংশ মানুষ বন্দী অবস্থায় থাকলেও কিছু মানুষ মুক্ত হয়। ক্ষুদ্র মাত্রায় হলেও পারস্য বা গ্রিক সমাজের তুলনায় এই স্তর আরও উন্নত পর্যায়ে পৌঁছায়; যদিও হেগেল একে পূর্ণ মুক্তি হিসেবে দেখেননি। বৈশ্বিক আত্মার প্রভাবে এরপর খ্রিষ্টধর্মের জন্ম হয়। প্রথমবারের মতো মানুষের জীবনে আধ্যাত্মিক দিক সত্যিকার অর্থে স্বীকৃতি পায়। এরপর আরেক ধাপ এগিয়ে বৈশ্বিক আত্মা জার্মানিতে পৌঁছায়। সেখানে লুথারের ধর্ম সংস্কার সম্পন্ন হয়েছে। মানুষ আধ্যাত্মিক বা চেতনার দিক থেকে পূর্ণ অর্থে মুক্ত হয়েছে। আধ্যাত্মিকতা সেখানে সবচেয়ে শক্তিশালী আর সে কারণে মনের স্বাধীন বৃদ্ধির পথও পূর্ণ অর্থে সেখানে উন্মুক্ত। হেগেলের মতে, এটিই চেতনার চূড়ান্ত ধাপ, মুক্তির পথে বৈশ্বিক আত্মার চূড়ান্ত অবদান। হেগেল-বর্ণিত বৈশ্বিক আত্মার এই বিকাশ পথটি নিঃসন্দেহে বৈপ্লবিক। কারণ, এতে সমাজ বিকাশ যে থেমে নেই, তার স্বীকৃতি আছে। আরও আছে মুক্তি ও স্বাধীনতার কথা। তবে এই দর্শনে গভীর স্ববিরোধিতা ছিল। সেকালের দার্শনিকেরা বিশেষ করে কার্ল মার্ক্স সেটি লক্ষ করেছিলেন। পরিবর্তন যদি শাশ্বত হয়, তাহলে বৈশ্বিক আত্মার চূড়ান্ত আশ্রয়স্থল বলে কিছু থাকা

হেগেলের নীতিবিরোধী, কারণ, সে চিরন্তন গতির মধ্যে আছে। সে কারণে জার্মান রাজতন্ত্র বৈশ্বিক আত্মার শেষ আশ্রয়স্থল হতে পারে না।

হেগেলের তৃতীয় অবদান এবং নিঃসন্দেহে বৈপ্লবিক হচ্ছে তাঁর দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি। মার্ক্স তার গুরুত্ব উপলব্ধি করে সমাজ বিশ্লেষণে সেটি ব্যবহার করেছিলেন। হেগেলের দাবি অনুযায়ী বৈশ্বিক আত্মা ও ব্যক্তিমনের বিকাশ দ্বান্দ্বিক পথে হয়। পথটি প্রাচীন গ্রিক বা অন্যান্য দর্শন থেকে বেশ ভিন্ন। গ্রিকেরা যে দ্বান্দ্বিক পথ অনুসরণ করেছিল, তাতে তারা বলেছিল, পৃথিবীতে সবকিছু পরিবর্তিত হয় এবং ওই পরিবর্তন একরৈখিক—নিম্নস্তর থেকে উচ্চস্তরে পৌঁছানোর একটি প্রক্রিয়ামাত্র। কিন্তু কীভাবে নিম্ন থেকে উচ্চস্তরে পৌঁছানো সম্ভব, তার সঠিক কারণ তারা উদ্ধার করতে পারেনি। হেগেল দাবি করেন, প্রতিটি বস্তুর মধ্যে দুই বিপরীত সত্তা থাকে এবং তাদের দ্বন্দ্ব সংঘর্ষে রূপ নেয়। সংঘর্ষের নিরসন হয় নতুনের সঙ্গে পুরোনোর সমঝোতা করে, পুরোনোকে সম্পূর্ণ বাদ না দিয়ে। এই প্রক্রিয়াকে তিনি জার্মান ভাষায় Aufhebung বলেছিলেন। হেগেলের *ফেনোমেনোলজি অব মাইন্ড* রচনায় দ্বান্দ্বিকতার একটি উদাহরণ আছে। দুজন স্বাধীন ব্যক্তির উদাহরণ দিয়ে হেগেল দেখিয়েছেন—ধরে নেওয়া যাক এই দুই ব্যক্তি স্বাধীন এবং তাদের স্বাধীনতা সম্পর্কে তারা সচেতন। কিন্তু তারা জানে না উভয়ের মন বৈশ্বিক আত্মার প্রতিফলন। সে কারণে তারা একে অন্যকে প্রতিপক্ষ ভাবে। তাদের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে। সেই সংঘর্ষে একজন আরেকজনকে অধীনস্থ করে। এই প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্ক অবশ্যই স্থায়ী হয় না। প্রভু নিজেকে সর্বেসর্বা মনে করলেও দাস তার শ্রম দিয়ে পৃথিবীকে বদলে দেয়। পৃথিবীর ওপর তার চেতনা ও সত্তাকে চাপিয়ে দিয়ে দাস আত্মতৃপ্তি লাভ করে এবং আত্মসচেতন হয়। অন্যদিকে দাসের শ্রমের ওপর প্রভু নির্ভরশীল হয়ে পড়েন। ভৃত্য চায় প্রভুর প্রতাপ থেকে মুক্তি এবং সেভাবে ওই দ্বন্দ্বের নিরসন করতে। হেগেলের এই দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি মার্ক্স পুঁজিবাদী সমাজে ব্যবহার করেছিলেন—সেখানে তিনি বুর্জোয়া শ্রেণি ও প্রলেতারিয়েতের মধ্যে দুই বিপরীতের দ্বন্দ্ব চিহ্নিত করেছিলেন, যার নিরসন হবে সংঘর্ষের মাধ্যমে, নতুন সামাজিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্কের জন্ম দিয়ে।

হেগেলের সঙ্গে বিরোধ

হেগেলের দর্শনে স্ববিরোধিতা ছিল। সে কারণে অনেকে তাঁকে রক্ষণশীলদের দলে অন্তর্ভুক্ত করেছিল। রক্ষণশীল হিসেবে তাঁকে দেখার কারণ তিনি 'বৈশ্বিক আত্মা'কে সৃষ্টিকর্তা (গড) ও ধর্মের সঙ্গে যুক্ত করেছিলেন; প্রুশিয়ার মতো অত্যন্ত রক্ষণশীল রাষ্ট্রকে বৈশ্বিক আত্মার চূড়ান্ত প্রতিফলন হিসেবে বিবেচনা করে তিনি প্রগতি ও সংস্কারের পথকে রুদ্ধ করে দিয়েছিলেন। বার্লিনে প্রগতিশীল কিছু দার্শনিক হেগেলের রক্ষণশীল দিককে উপেক্ষা করে তাঁর প্রগতিশীল অংশকে বাঁচাতে তৎপর হয়েছিলেন।

যাঁরা এই দলে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, তাঁদের নব্য হেগেলপন্থী বলা হতো। ব্রুনো বাওয়ার ও আর্নল্ড রুগে এই গ্রুপের প্রধান ছিলেন। বার্লিনের হাইপেল ক্যাফেতে তাঁরা মিলিত হতেন। তাঁরা দাবি করতেন দর্শনকে মুক্তির অস্ত্র হিসেবে দেখতে হবে। ধর্ম থেকে তাকে পৃথক করতে হবে; জার্মানির নতুন ভবিষ্যৎ গড়তে হলে রাষ্ট্রসহ সামাজিক সবকিছুকে সমালোচনা করার অধিকার নিশ্চিত করতে হবে; বুদ্ধিবৃত্তিক আক্রমণকে আরও প্রখর করতে হবে। সমালোচনার লক্ষ্যবস্তু হবে ধর্মতত্ত্ব এবং রাষ্ট্র। কারণ, ধর্ম বিদ্যমান রাষ্ট্রের রক্ষক হিসেবে কাজ করে। তাকে সমালোচনা করার অর্থ রাষ্ট্রকে সমালোচনা করা। সমালোচনাসিক্ত এই মন নিয়ে এই গ্রুপ চা-কফি আর সিগারেটের পাশাপাশি রাতভর আড্ডা দিত। মার্ক্স নব্য হেগেলপন্থীদের দলের সক্রিয় সদস্য ছিলেন এবং প্রথম থেকেই যুক্তি-তর্কের উজ্জ্বলতা দিয়ে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন।

হেগেলকেন্দ্রিক ডান ও বামের বিভক্তি পরবর্তীকালে আরও প্রসারিত হয়েছিল। একপর্যায়ে নব্য হেগেলীয়রা দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যান এবং একে অপরের বিরুদ্ধে অবস্থান নেন। বিভক্তির একদিকে ছিলেন ফয়েরবাখের সমর্থকেরা, মার্ক্স এই দলে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। অন্য গ্রুপে একই পরিবারের তিন ভাই—ব্রুনো বাওয়ার, এডগার বাওয়ার এবং গুডবার্ড বাওয়ার। মার্ক্স এই গ্রুপকে 'দ্য হলি ফ্যামিলি' নামে ডাকতেন। তৃতীয় আরও একটি গ্রুপ ছিল। তাদের প্রতিনিধি ছিলেন ক্যাসপার স্মিথ। তিনি ম্যাক্স স্টিরনার (১৮০৬—১৮৫৬) নাম ব্যবহার করে নৈরাজ্যপূর্ণ আদর্শ প্রচারের উদ্দেশ্যে একটি বই লেখেন। বইটির নাম *দ্য ইগো অ্যান্ড ইটস ওন*। *দ্য জার্মান আইডিওলোজি* গ্রন্থে মার্ক্স এই বইয়ের কঠোর সমালোচনা করেছেন। নব্য হেগেলীয়দের মধ্যে তিনজন মার্ক্সের ওপর বিশেষ প্রভাব রেখেছিলেন। তাঁদের একজন ছিলেন ডেভিড স্ট্রস। দ্বিতীয়জন ব্রুনো বাওয়ার। মার্ক্সের সঙ্গে ব্রুনোর সম্পর্ক তখনো ভালো। ব্রুনো দাবি করতেন, সমালোচনাকে আরও গুরুত্ব দিতে হবে। কারণ মনকে পরিবর্তন করার অসীম ক্ষমতা তাঁর মধ্যে রয়েছে। তৃতীয় ব্যক্তি ছিলেন জার্মান দার্শনিক ফয়েরবাখ। তিনি প্রকৃতিবাদী এবং মানবতাবাদী ছিলেন। ব্রুনো বাওয়ারের সমালোচনা করে তিনি লিখেছিলেন, 'আধ্যাত্মিক জগৎ আমাদের কল্পনার ফসল, মানুষের প্রয়োজন মেটাতে অথবা জীবনে যা পাইনি, তা পাওয়ার আশায় আমরা উন্নত জীবনের কল্পনা করি।'

এ প্রসঙ্গে আরও একজনের কথা বলতে হয়। তিনি মোজেস হেস। তাঁর দর্শনে পাঁচমিশালি ভাব ছিল। মানুষের দুঃখ-দুর্দশা দেখে তিনি ব্যথিত হতেন। সন্ন্যাসীর মতো জীবনযাপন করতেন। মনে কোনো ঘৃণা ছিল না, এমনকি যাঁরা তাঁর শত্রু, তাঁদের প্রতিও তিনি কখনো অসদাচরণ করেননি। তিনি ফয়েরবাখের (১৮০৪—১৮৭২) মৃদু সমালোচক ছিলেন কিন্তু তাঁর দর্শনের নানা দিকের প্রশংসাও করেছেন। ফয়েরবাখের জোর দাবি ছিল এই যে মানুষ যখন ধর্ম ব্যবহার করে কল্পনার এক জগৎ সৃষ্টি করে, তখন মানুষ সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। বিচ্ছিন্নতার এই ধারণা

হেস গ্রহণ করেছিলেন এবং ফরাসি সমাজতন্ত্রী সেন্ট সাইমন বা শারল ফুরিয়ের উদাহরণ দেখিয়ে বলেছিলেন, সামাজিক শোষণের কারণে মানুষ সমাজবিচ্ছিন্নতায় ভোগে। ফয়েরবাখ দর্শনশাস্ত্রে যে ধরনের বিপ্লব এনেছিলেন, হেস সামাজিক জীবনে সেই ধরনের বিপ্লবের কথা ভেবেছিলেন। তাঁর আশা ছিল ওই বিপ্লব মানুষের আত্মসচেতনতাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করবে। এই ধারণা হেস মার্ক্সের মধ্যে সঞ্চারিত করতে পেরেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, অর্থ-সম্পদ এখন সমাজে উপাস্য বস্তুতে পরিণত হয়েছে। সৃষ্টিকর্তা হচ্ছেন পুঁজির আদর্শিক চিত্র আর স্বর্গ হচ্ছে বাণিজ্যিক জগৎ। অর্থের ক্ষমতায়নের দিকটি তিনি মার্ক্সের মনে গেঁথে দিয়েছিলেন। অর্থসংক্রান্ত হেসের ধারণা কী পরিমাণে মার্ক্সকে প্রভাবিত করেছিল, সেটি *প্যারিস নোটবুকস* গ্রন্থে লক্ষ করা কঠিন নয়। অর্থের গুরুত্ব উপলব্ধি করে মার্ক্স তাঁর *ক্যাপিটাল* গ্রন্থে একটি বিশেষ অধ্যায় যোগ করেছিলেন এবং তার নাম দিয়েছিলেন 'The power of money in Bourgeois society'। শেক্সপিয়ারের *Timon of Athens* থেকে নেওয়া নানা উদ্ধৃতি মার্ক্স এ প্রসঙ্গে ব্যবহার করেছেন। অর্থকে তিনি বর্ণনা করেছেন সামাজিক সংহতি বিনষ্টকারী এক শক্তি হিসেবে। তার একটি উদাহরণ নিচে দেওয়া হলো :

Gold? Yellow, glittering, precious gold?
No Gods, I am no idle votarist.....
Thus mauch of this will make black white,
foul fair, wrong right, base noble,
old young, coward valiant.

ফয়েরবাখ দিলেন নির্মল আনন্দ

বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকাকালে মার্ক্স উপলব্ধি করেছিলেন, প্রাচীন ও আধুনিক দর্শনে চেতনার ভূমিকাকে জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখার রীতি সঠিক নয়। সেখানে মন বা চেতনাকে সক্রিয় সত্তা হিসেবে ভাবা হয়নি। গ্রিক এবং ইউরোপীয় দার্শনিক ঐতিহ্যে মানুষের সঙ্গে পারিপার্শ্বিকতার (সমাজ) সম্পর্ককে অবমূল্যায়ন করা হয়েছে। সে কারণে মনের সক্রিয়তার অনুপস্থিতিকে ইউরোপীয় দর্শনের প্রধান দুর্বলতা হিসেবে তিনি চিহ্নিত করা যুক্তিসংগত ভেবেছিলেন। অবশ্য কান্ট, ফিখটে এবং হেগেলের দর্শনের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার পর চেতনার সক্রিয়তা এবং সমাজকে বদলে দেওয়ার ক্ষেত্রে তাঁর অসীম ক্ষমতার আভাস তিনি অনুভব করেছিলেন। মার্ক্স স্বীকার করেছেন প্রাচীন দর্শনের মধ্যে একমাত্র এপিকিউরাসের দর্শনে বস্তুজগৎ ও চেতনার বৃহত্তর ঐক্যের কিছু সাক্ষ্যপ্রমাণ পাওয়া যায়। মনের সক্রিয়তার যে দিকটি এপিকিউরাসের দর্শনে মার্ক্স লক্ষ করেছিলেন, তার কারণে তিনি তাঁর ডক্টরাল থিসিসটি এপিকিউরাসের ওপর লেখার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। থিসিসের দুটি মূল লক্ষ্য

ছিল। একটি—ধর্মতত্ত্বকে দর্শনশাস্ত্র দিয়ে প্রতিস্থাপন করা এবং দুই—ডগমার জায়গায় সন্দেহবাদকে প্রশ্রয় দেওয়া। এপিকিউরাসের দর্শনকে বোঝার লক্ষ্যে মার্ক্স গ্রিক দার্শনিক ডেমোক্রিটাসের দর্শনের সঙ্গে একে তুলনা করেন। সেই তুলনায় তিনি দেখিয়েছেন, বাস্তববাদী হলেও ডেমোক্রিটাসের দর্শন যান্ত্রিক, সেখানে সামাজিক পরিবর্তনের উল্লেখ নেই। যে মূল প্রতিপাদ্য তিনি ব্যবহার করেছেন, সেটি হচ্ছে 'অ্যাটম', যেটি দেখা যায় না, কেবল হৃদয়ঙ্গম করা যায়। যা প্রাত্যহিক জীবনে আমাদের সামনে প্রতিভাত হয়, তা প্রকৃত অ্যাটম নয়। ফলে অ্যাটমের সঙ্গে বাস্তবতার কোনো সম্পর্ক ডেমোক্রিটাস দেখেননি। তাঁর ধারণায় অ্যাটম যান্ত্রিক উপায়ে একে অন্যের সঙ্গে আন্তসম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে। সে কারণে পৃথিবী বা সমাজ একধরনের যান্ত্রিক আইন দিয়ে পরিচালিত হয়—এ-ই ছিল ডেমোক্রিটাসের দাবি।

এপিকিউরাস ডেমোক্রিটাসের এই যান্ত্রিক বস্তুবাদে কিছু পরিবর্তন আনেন। তিনি বলেন, সবকিছু সত্ত্বেও অ্যাটমের কিছু গুণ আছে, যেমন আত্মনির্বাচনের ক্ষমতা। অ্যাটম যখন একত্রে মিলিত হয়, তখন যান্ত্রিক সমষ্টি হিসেবে থাকে না, নতুন গুণ অর্জন করে তার মধ্যে বিভাজিত হয়। তার অর্থ হচ্ছে অ্যাটম দিয়ে প্রাকৃতিক জগৎ নির্মিত হলেও সেই জগৎ প্রতিনিয়ত ভাঙনের মধ্য দিয়ে যায় এবং পুনর্জন্ম লাভ করে। প্রকৃতি জগতের উদাহরণ ব্যবহার করে এপিকিউরাস বিবর্তনের যে আভাস দিয়েছিলেন মার্ক্স, তাকে মানুষের ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে মূল্যবান মনে করেছিলেন। ব্যক্তির উদ্দেশ্য পূরণের এই সম্ভাবনা এপিকিউরাসের দর্শনের মূল দিক হিসেবে মার্ক্স স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। তাঁর দর্শন বিশ্লেষণ করে মার্ক্স বলেছিলেন, পৃথিবীকে বদলে দেওয়া প্রয়োজন, আর বদলাতে গেলে দর্শনকে ক্রিয়াশীল হতে হবে। দর্শনের দায়িত্ব হবে সমাজে পরিবর্তন আনা। মার্ক্স দর্শনশাস্ত্রকে ঠিক প্রমিথিউসের আগুন চুরির মতো নতুন পৃথিবী গড়ার হাতিয়ারে পরিণত করতে চেয়েছিলেন। ১৮৪১ সালে অর্থাৎ ২৩ বছর বয়সে তিনি তাঁর থিসিসের কাজ শেষ করেন। বন বিশ্ববিদ্যালয়ে না পাঠিয়ে থিসিসটি তিনি জেনা বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠিয়েছিলেন। সাত দিন পর দর্শন বিভাগের ডিন থিসিস অনুমোদন করে মার্ক্সকে চিঠি দিলেন এবং গ্রিক দর্শনকে নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার পদ্ধতিকে বাহবা দিলেন। মার্ক্স থিসিসটি তাঁর হবু শ্বশুরমশাই জেনির বাবাকে উৎসর্গ করেছিলেন। এবার ডক্টর মার্ক্স বিশ্ব আঙিনায় প্রতিষ্ঠার পথে আরও এক পা এগিয়ে গেলেন। ডিগ্রি পাওয়ার পর জেনির অসুস্থ বাবার পাশে সময় কাটাতে মার্ক্স ট্রায়ের শহরে ফিরে এলেন। নিজ পরিবারের প্রতি দায়দায়িত্বের কথা না ভেবে এক সন্ধ্যায় মার্ক্স জেনির বাসায় গিয়ে উপস্থিত হলেন।

মার্ক্স অবশ্য চেতনার সক্রিয়তাকে ভাববাদের মধ্যে সীমিত রাখা সঠিক ভাবেননি। ফয়েরবাখের দর্শনের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার পর হেগেলের কুজ্ঝটিকা সমাচ্ছন্ন ভাববাদী বলয় থেকে তিনি দর্শনের মুক্তি অনুভব করেন। ফয়েরবাখের বস্তুবাদী দর্শন পড়ে

মার্ক্স জেনেছিলেন যে বস্তুজগৎ থেকে চেতনার উন্মীলন হয়। চেতনা জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে না, যদিও তার অর্থ এই নয় যে তার ভূমিকাকে অস্বীকার করতে হবে। তিনি বিশ্বাস করতেন, বস্তুজগতে পরিবর্তন এলে চেতনায় পরিবর্তন আসে। সে কারণে দর্শনের দায়িত্ব বিশ্লেষণ নয়, পৃথিবীকে বদলে দেওয়া। বয়সে ফয়েরবাখ মার্ক্সের ১৪ বছরের বড় ছিলেন এবং তাঁর দর্শনভাবনাও হেগেলের ছত্রচ্ছায়ায় গড়ে ওঠে। বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকাকালে তিনি হেগেলের কাছে পড়াশোনা করেছিলেন। জার্মান প্রতিক্রিয়াশীল চক্র ফয়েরবাখের বিরুদ্ধে নানা ব্যবস্থা নিয়ে নাগরিক জীবন থেকে তাঁকে দূরে রাখতে সক্ষম হয়। ১৮৩২ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পদ থেকে তাঁকে সরিয়ে বার্লিনের বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের ঔচ্ছল্য থেকে যত দূর সম্ভব দূরে রাখার লক্ষ্যে বাভারিয়ার এক প্রত্যন্ত অঞ্চলে তাঁকে নির্বাসনে পাঠানো হয়। ১৮৪১ সালে তাঁর লেখা বই *দ্য এসেন্স অব ক্রিসটিয়ানিটি* প্রকাশ পেলে এঙ্গেলস লেখেন, 'আমরা সবাই হেগেলকে ছেড়ে ফয়েরবাখের ভক্ত হয়ে গেলাম।' মার্ক্স বললেন, 'ফয়েরবাখের দর্শন পড়া নির্মল বাতাসে অফুরন্ত নিশ্বাস নেওয়ার মতো।'

ফয়েরবাখ সবকিছুকে চেতনার আলোকে বিচার করার বিরোধী ছিলেন। হেগেলের ভাববাদকে তিনি সে কারণে ধর্মীয় বিশ্বাস হিসেবে মূল্যায়ন করেছিলেন এবং বলেছিলেন হেগেলের দর্শনকে সমাজের জন্য প্রযোজ্য ভাবা কঠিন। কারণ, মানুষের ব্যক্তিসত্তা তাঁর মতে জৈবিক, আর চেতনা হল জৈবিক সত্তার প্রতিফলন মাত্র। এভাবে ফয়েরবাখ হেগেলের দৃষ্টিভঙ্গিকে উল্টে দিয়েছিলেন। তাঁর ধর্মসংক্রান্ত দাবিতেও নতুনত্ব ছিল। ধর্ম বস্তুজগতের চাওয়া-পাওয়াকে মানুষের ভাষায় প্রকাশ করে। সৃষ্টিকর্তার মধ্যে মানুষ যে পবিত্রতার আবরণ দেখে, সেটি মানুষের নিজ চরিত্রেরই প্রতিফলন। এই অকাট্য বস্তুবাদকে মার্ক্স পছন্দ করলেও তাঁর সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত হননি। সত্যি বলতে কি, ফয়েরবাখের লেখাটি মার্ক্সের মনে খুব বেশি যে প্রভাব ফেলেছিল, তা নয়। ধর্মসংক্রান্ত ফয়েরবাখের যুক্তি মার্ক্স ইতিমধ্যে ব্রুনো বাওয়ারের দৃষ্টিভঙ্গিতে লক্ষ করেছিলেন। ফয়েরবাখ বলেছেন মানুষের যেসব গুণ আমরা দেখি, সেগুলো সৃষ্টিকর্তার নামের সঙ্গে যুক্ত করি। তার ফলে মানুষ তার নিজস্ব গুণাবলি হারায়। এভাবে ধর্মতত্ত্ব নৃতত্ত্বে পরিণত হয়। সৃষ্টিকর্তার ওপর আমাদের যে বিশ্বাস, সেগুলো আমাদেরই, মানুষের গুণাবলির বিশুদ্ধ রূপ।

ফয়েরবাখের একটি রচনা অবশ্য মার্ক্সকে অভিভূত করেছিল। তার নাম *প্রিলিমিনারি থিসিস ফর দ্য রিফর্ম অব ফিলোসফি*। সেখানে ফয়েরবাখ হেগেলের ভাববাদী দর্শনের ভিত্তিমূলকে নাড়িয়ে দিয়েছিলেন। ভাববাদই ইতিহাসের মূল চালিকাশক্তি চেতনা। জার্মান ভাববাদে চেতনা সমাজের বাইরে থেকে মানুষকে প্রভাবিত করে। ফলে যেভাবে ধর্ম মানুষকে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে, ভাববাদী দর্শনও মানুষকে তার প্রকৃত সত্তা থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখে। হেগেল এবং অন্য

জার্মান দার্শনিকেরা স্পিরিট বা মন বা সৃষ্টিকর্তা দিয়ে বাস্তব জগৎকে বুঝতে চেয়েছেন। তাকে দেখা হয়েছে চূড়ান্ত শক্তি হিসেবে। দাবি করা হয়েছে, ইট-কাঠ-টেবিল-পাথরসহ জড়বস্তু হচ্ছে ওই স্পিরিটের অসম্পূর্ণ প্রকাশ। ফয়েরবাখ তার বিরোধিতা করে বলেছেন, দর্শনকে শুরু করতে হবে পার্থিব জগৎ দিয়ে। মানুষ হবে দর্শনভাবনার কেন্দ্রবিন্দু। এভাবে হেগেলের বিকাশতত্ত্বকে তিনি মাটিতে নামাতে পেরেছিলেন।

তবে ফয়েরবাখের বেশ কিছু ত্রুটি মার্ক্স উল্লেখ না করে পারেননি। তাঁর বস্তুবাদ মানুষের মনকে নিষ্ক্রিয় বা জড় হিসেবে দেখে। আয়নার ওপর বাইরের জগতের প্রতিফলনের মতো মানুষের মন বাইরের জগৎকে প্রতিফলিত করে—এটাই ছিল ফয়েরবাখের দর্শনের মূল কথা। সেদিক থেকে ভাবলে অন্তত এই প্রশ্নে ফয়েরবাখ জার্মান ভাববাদী ঐতিহ্য থেকে পিছিয়ে ছিলেন। বাইরের জগতের পরিবর্তন বা রূপান্তরে মানুষের ভূমিকাকে অবমূল্যায়ন করার যে প্রবণতা ফয়েরবাখের দর্শনে ছিল, মার্ক্সের কাছে তা অর্থহীন মনে হয়েছে। মানুষ কেবল পরিবেশের ফসল নয়, তার স্রষ্টাও বটে। পরিবেশ মানুষকে সৃষ্টি করে, আবার পরিবেশকে বদলে দিয়ে মানুষ নিজেকেও বদলে দেয়। চেতনার ক্রিয়াশীল এই দিকের ওপর মার্ক্স বিশেষ করে জোর দিতে চেয়েছিলেন। আমাদের অজানা নেই যে বেশ কিছুকাল পর মার্ক্স 'থিসিস অন ফয়েরবাখে' এই দুর্বল দিকগুলো উল্লেখ করেছিলেন। ১১ নম্বর থিসিসে মার্ক্স বলেছিলেন, 'দার্শনিকেরা কেবল পৃথিবীকে বিশ্লেষণ করেছেন, প্রয়োজন হচ্ছে তাকে বদলে দেওয়া।' হেগেলের দর্শনে চেতনার যে সক্রিয়তার কথা ছিল, তার সঙ্গে ফয়েরবাখের বস্তুবাদকে যুক্ত করে মার্ক্স এক নতুন দর্শন দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলেন। মানুষ সমাজের রূপান্তর চায়। সে রূপান্তর কেবল চেতনায় নয়, বাস্তব জীবনে আনা প্রয়োজন। এটিই ছিল ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যার মূল ভিত।

গ্রন্থপঞ্জি

Easton, Loyd and Kurt Guddat (eds). (1967). *Writing of Young Marx on Philosophy & Society*, New York.

Holmes, Rachel. (2014). *Eleanor Marx : A Life*. London : Bloomsbury.

Lewis, John. (1965). *The Life and Teaching of Karl Marx*. New York : International Publishers.

Manuel, Frank. (1995). *A requiem for Karl Marx*. Cambridge, Harvard University Press.

Singer, Peter. (1996). *Marx : A Very Short Introduction*. Oxford, Oxford University Press.

Thomas, Paul. (2012). *Karl Marx*. London, Reaktion Books.

Wheen, Francis. (2000). *Karl Marx : A Life*. London, W. W. Norton & Company.

রাজনীতি

সমকালীন বিশ্ব পুঁজিবাদ ও মার্ক্সবাদের তিনটি প্রশ্ন

মাহবুব উল্লাহ

সারসংক্ষেপ

এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় হলো সমকালীন বিশ্ব পুঁজিবাদ এবং ধ্রুপদি মার্ক্সবাদের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। শ্রেণি, রাষ্ট্র ও জাতি প্রশ্ন মার্ক্সবাদে কীভাবে আলোচিত হয়েছে, তাই লেখক তুলে ধরেছেন ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের মাধ্যমে। এই তিন প্রশ্নে ধ্রুপদি মার্ক্সবাদের উল্লেখযোগ্য তাত্ত্বিকদের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরা হয়েছে। এ ছাড়া অনগ্রসর দেশে কীভাবে সমাজতন্ত্র কাজ করে এবং সেখানে গণতান্ত্রিক বুর্জোয়া বিপ্লব বলতে কী বোঝায়, উত্তর-পুঁজিবাদের বৈশিষ্ট্যগুলো কী, পুঁজিবাদী উন্নয়ন স্তর এড়িয়ে কীভাবে সমাজতন্ত্র আসতে পারে, এবং পরিবর্তিত বিশ্বে জাতি প্রশ্ন এই লেখায় আলোচনা করা হয়েছে।

মুখ্য শব্দগুচ্ছ

পুঁজিবাদ, মার্ক্সবাদ, অনগ্রসর দেশ, সমাজতন্ত্র, শ্রেণি, রাষ্ট্র, জাতি

রাজনীতি : বাম ও ডান ধারা

রাজনীতি নিয়ে আমরা যখন তর্ক-বিতর্কে লিপ্ত হই, তখন প্রধানত দুই ধারার রাজনীতির প্রসঙ্গ উঠে আসে। এই ধারা দুটি হলো ডান ও বাম। বাম ও ডান প্রত্যয় দুটি ১৭৮৯ সালে ফরাসি বিপ্লবের সময় সৃষ্টি হয়েছিল। সে সময় জাতীয় সংসদে যাঁরা রাজাকে সমর্থন করতেন, তাঁরা সভাপতির ডান দিকে এবং যাঁরা বিপ্লবকে সমর্থন করতেন, তাঁরা সভাপতির বাঁ দিকে আসন গ্রহণ করতেন।

Baron de Gauville ছিলেন সংসদের একজন ডেপুটি। তিনি ব্যাখ্যা করে বলেছেন, 'We began to recognize each other : those who were loyal to religion and the king took up positions to the right of the chair so as to

avoid the shouts, oaths and indecencies that enjoyed free rein in the opposing camp.' দক্ষিণপন্থীরা এই আসন বিন্যাসের বিরোধিতা করে বলেন, ডেপুটিরা ব্যক্তিগত অথবা সাধারণ স্বার্থকে সমর্থন জানাবেন, কিন্তু তাঁরা উপদল বা রাজনৈতিক দল গঠন করতে পারবেন না। বর্তমানে সংবাদপত্রে মাঝেমধ্যে 'বাম' ও 'ডান' শব্দ দুটো ব্যবহার করা হয় পরস্পরবিরোধী পক্ষ বোঝানোর জন্য। ১৭৯১ সালে ফ্রান্সে জাতীয় সংসদের স্থলে আইনসভা গঠিত হয়। এই আইনসভার সদস্যরা সবাই ছিলেন নতুন। তা সত্ত্বেও এই বিভাজন অব্যাহত থাকে। উদ্ভাবনপন্থীরা বাঁ দিকে বসতেন, মধ্যপন্থীরা বসতেন মাঝখানে, অন্যদিকে সংবিধানের বিবেকবান সমর্থকেরা বসতেন ডান দিকে। ডান দিকে যাঁরা বসতেন, সেখানেই Ancien Regime সমর্থকেরা অতীতে আসন নিতেন। এরপরের ইতিহাস দীর্ঘ। সেই ইতিহাসে প্রবেশ করা বর্তমান আলোচনার জন্য প্রাসঙ্গিক হবে না।

বাম ও ডান প্রত্যয় দুটি রাজনৈতিক আদর্শ নির্দেশ করতে ব্যবহৃত হয়েছে, ব্যাপারটি এমন নয়। ১৮৪৮ সালের পর দুই প্রধান প্রতিপক্ষ ছিল ডেমোক্রেটিক সোশ্যালিস্ট ও রিঅ্যাকশ্যানারিজ। ডেমোক্রেটিক সোশ্যালিস্টরা তাঁদের পার্টির আনুগত্য চিহ্নিত করার জন্য ব্যবহার করতেন লাল পতাকা, ডানপন্থীরা ব্যবহার করতেন সাদা পতাকা। ১৮৭১ সালে তৃতীয় রিপাবলিক প্রতিষ্ঠার পর রাজনৈতিক দলগুলো বিভিন্ন পরিভাষার ব্যবহার শুরু করে। যেমন রিপাবলিকান লেফট, সেন্টার রাইট, সেন্টার লেফট, এক্সট্রিম লেফট ও র‍্যাডিক্যাল লেফট। র‍্যাডিক্যাল লেফটদের রাজনৈতিক বিশ্বাস মূলত সেন্টার লেফটদের নিকটতর ছিল। কিন্তু তাঁদের রাজনৈতিক বিশ্বাস এক্সট্রিম লেফটদের চেয়ে দূরে ছিল। বিংশ শতাব্দীর শুরুতে বাম ও ডানের প্রতীক হিসেবে লাল ও সাদা বর্জিত হয়। তখন থেকে বামপন্থীরা 'প্রজাতন্ত্রী', আর দক্ষিণপন্থীরা 'রক্ষণশীল' হিসেবে তাঁদের পরিচয় তুলে ধরেন। তবে বাম ও ডান শব্দ দুটি এক পক্ষ আরেক পক্ষের বিরুদ্ধে গালমন্দ হিসেবে ব্যবহার করত। আমার মনে হয়, বর্তমান বাংলাদেশেও একইভাবে শব্দ দুটোর ব্যবহার প্রচলিত আছে।

বাম থেকে ডান—রাজনীতির এই ধারাক্রমে আমরা রাজনৈতিক অবস্থান, আদর্শ ও দল বোঝাতে পারি। সাধারণভাবে বামপন্থীরা সাম্যের সমর্থক এবং দক্ষিণপন্থীরা সামাজিক স্তর বিভাজনে বিশ্বাসী। বামপন্থীরা স্বাধীনতা, সমতা, ভ্রাতৃত্ব, অধিকার, প্রগতি, সংস্কার ও আন্তর্জাতিকতায় বিশ্বাসী। অন্যদিকে দক্ষিণপন্থীরা কর্তৃত্ব, সামাজিক স্তরভেদ, শৃঙ্খলা, কর্তব্য, ঐতিহ্য, প্রতিক্রিয়া ও জাতীয়তাবাদের ধারণাগুলোর প্রতি সমর্থন জানিয়ে নিজস্ব অবস্থান তুলে ধরেন।

যখন দেখা যায় যাঁরা বাঁ দিকে বসেছিলেন, তাঁরাই সরকার গঠন করেছেন—এমন পরিস্থিতিতে রাজনীতিতে বাম ও ডানকে সরকারবিরোধী ও সরকার সমর্থক হিসেবে চিহ্নিত করা বিভ্রান্তিকর হয়ে ওঠে। এই বিভ্রান্তি কাটানোর জন্যই বাম ও

ডান ধারার রাজনীতিকে আদর্শের ভিত্তিতে চিহ্নিত করার প্রয়োজন অনুভূত হয়।

সময়ের বিবর্তনে বাম রাজনীতি অ্যান্টি-এস্টাব্লিশমেন্ট হিসেবে চিহ্নিত হলো। দক্ষিণপন্থী রাজনীতিকরা প্রচলিত ব্যবস্থায় স্থিতাবস্থা বজায় রাখতে চান। সাধারণভাবে তাঁরা কোনো পরিবর্তনের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করেন না, যদি সেই পরিবর্তন প্রচলিত ব্যবস্থার স্থিতিশীলতাকে বিনষ্ট করে। অনেক সময় ডান ধারার রাজনীতিকে পশ্চাৎ-মুখী রাজনীতি হিসেবে গণ্য করা হয়। অন্যদিকে বাম ধারার রাজনীতি সাধারণভাবে পরিবর্তনকে স্বাগত জানায়। পরিবর্তনকে স্বাগত জানানোই বাম ধারার রাজনীতির একমাত্র কাজ নয়। বাম ধারার রাজনীতি পরিবর্তনের জন্য সক্রিয়ভাবে জনমত গঠন করে এবং এর জন্য প্রয়োজনীয় সংঘশক্তি গড়ে তোলে। এই বিবেচনায় এ ধারার রাজনীতিকে প্রগতিশীল রাজনীতি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। অর্থাৎ সমাজব্যবস্থাকে আরও এক ধাপ এগিয়ে নেওয়া, যার ফলে গণতন্ত্র সম্প্রসারিত হয়, সমাজের বঞ্চিত শ্রেণিগুলো বঞ্চনা থেকে কিছুটা হলেও মুক্তি অর্জন করে, ধর্ম-বর্ণ ও গোত্রের ভিত্তিতে মানুষকে বিবেচনা করার ভেদনীতির অবসান হয়, বেকারত্ব, দারিদ্র্যসহ যেসব সামাজিক ব্যাধি মানুষের জীবনকে বিপন্ন করে তোলে, সেসব বিপন্নতার লাঘব ঘটে এবং দেশের ওপর যদি কোনো বৈদেশিক শক্তির আগ্রাসন ও আধিপত্য জারি থাকে, তাহলে সেই আগ্রাসন ও আধিপত্যকে খর্ব করার জন্য প্রতিবিধান গ্রহণ করা হয়।

বামপন্থা ও ডানপন্থাকে আপেক্ষিকভাবে বিচার করতে হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দাসপ্রথার উচ্ছেদকে কেন্দ্র করে ঊনবিংশ শতাব্দীতে প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকনের সময় গৃহযুদ্ধ হয়েছিল। সে সময় যাঁরা দাসপ্রথা উচ্ছেদের পক্ষে অবস্থান নিয়েছিলেন, তাঁরা নিঃসন্দেহে সেই সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে প্রগতিশীল ছিলেন। এমনকি তাঁদের বামপন্থী বললেও ভুল হবে না। কিন্তু গৃহযুদ্ধ আমেরিকায় বর্ণবাদের অবসান ঘটায়নি। বর্ণবিদ্বেষ ও সেগ্রেগেশন প্রথার বিরুদ্ধে মার্কিন কৃষ্ণাঙ্গদের দীর্ঘ সংগ্রাম করতে হয়েছে। ক্ষেত্রবিশেষে এই সংগ্রাম সশস্ত্র সংগ্রামেরও রূপ ধারণ করেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মানবাধিকারের সবচেয়ে অগ্রগণ্য নেতা ছিলেন মার্টিন লুথার কিং (জুনিয়র)। তিনি অহিংস নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন। তা সত্ত্বেও তাঁর সংগ্রাম ও ভূমিকা চীনের কমিউনিস্ট পার্টির নেতা চেয়ারম্যান মাও সে-তুংয়ের প্রশংসা পেয়েছিল। মার্টিন লুথার কিং রাজনৈতিক ক্ষমতার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেননি। কিন্তু তাঁর সংগ্রাম সমাজের স্থিতাবস্থায় কাঁপন ধরিয়ে দিয়েছিল। সে জন্যই হয়তো তাঁকে আততায়ীর গুলিতে প্রাণ দিতে হয়েছিল। পাশ্চাত্যের গণতান্ত্রিক দেশগুলোতে বাম ও দক্ষিণপন্থী রাজনীতিতে ইস্যুগুলো স্পষ্ট ও দৃশ্যমান—ব্রিটেনে যেমন লেবার ও কনজারভেটিভ। ইউরোপের অন্যান্য দেশেও প্রায় একই ধরনের রাজনৈতিক বিভাজন লক্ষ করা যায়। ইউরোপের দেশগুলোতে গণতন্ত্র পরিপক্কতার পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। সেসব দেশে রাজনীতিতে সংঘাতের চেয়ে সহনশীলতার সংস্কৃতি দীর্ঘদিন ধরে দানা বেঁধে আছে।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে অর্থনৈতিক মন্দা ও অভিবাসনের প্রশ্নে একধরনের জনতুষ্টিবাদী রাজনীতির উদ্ভব ঘটেছে। এই জনতুষ্টিবাদের সঙ্গে রুশ 'নারদনিকদের' জনতুষ্টিবাদী দর্শনের কোনো মিল নেই। ইউরোপে নব-উত্থিত জনতুষ্টিবাদ ঘৃণা, জাতিবিদ্বেষ এবং ভেদনীতিকে ভর করে দাঁড়াতে চাচ্ছে। ক্ষেত্রবিশেষে এরা সফলও বটে। এ ধারার রাজনীতি প্রগতিশীল ধারা বা সামাজিক গণতান্ত্রিক ধারার জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়াচ্ছে। ইউরোপের গণতন্ত্র এখন এক নতুন ধারার ফ্যাসিবাদের চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। এ চ্যালেঞ্জকে চিহ্নিত করা হয়েছে নিও-লিবারেল হেজেমনিক ফরম্যাশনের সংকট হিসেবে। শতাল মৌফের (Chantal Mouffe) (২০১৮) মতে, ইউরোপে অধিকাংশ সমাজতান্ত্রিক ও সামাজিক গণতান্ত্রিক দলগুলো বিপর্যয়ের মধ্যে পড়েছে। কারণ, তাদের রাজনীতিসংক্রান্ত ধারণা অপর্যাপ্ত। সনাতন বাম ধারার রাজনীতির সংকট সম্পর্কে এই লেখক ও আর্নেস্তো লাকলাউ যৌথভাবে ১৯৮৫ সালে 'হেজেমনি অ্যান্ড সোশ্যালিস্ট স্ট্র্যাটেজি: টুওয়ার্ডস আ র‍্যাডিক্যাল ডেমোক্রেটিক পলিটিকস' শিরোনামে একটি প্রবন্ধ রচনা করেন। এই প্রবন্ধ রচনার পেছনে যে চিন্তা কাজ করেছে, তা হলো মার্ক্সবাদী ও সামাজিক গণতন্ত্রী দলগুলোর ১৯৬৮ সালের অভ্যুত্থানকে কেন্দ্র করে যেসব আন্দোলনের সূচনা হয়েছে, তার মর্মবস্তুকে ধারণ করতে ব্যর্থতা। এসব আন্দোলন বিভিন্ন ধরনের কর্তৃত্ববাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ হিসেবে দেখা দিয়েছে, যা 'শ্রেণি'র ভিত্তিতে সূত্রবদ্ধ করা সম্ভব নয়। নারীবাদের দ্বিতীয় তরঙ্গ, সমকামীদের আন্দোলন, বর্ণবাদবিরোধী সংগ্রাম ও পরিবেশভিত্তিক ইস্যুগুলো রাজনীতির চালচিত্রকে গভীরভাবে পাল্টে দিয়েছে, কিন্তু সনাতন বাম দলগুলো এই সব চাহিদার প্রতি সাড়া দেয়নি এবং এগুলোর রাজনৈতিক চরিত্র বুঝতে পারেনি। সুতরাং সনাতন বামের রাজনীতির সীমাবদ্ধতার পরিপ্রেক্ষিতে নতুন উপলব্ধির প্রয়োজন। বাম দলগুলো যখন শ্রেণিতত্ত্ববাদকে গোঁড়াভাবে ধারণ করে আছে, তখন তাদের পক্ষে যেসব দাবির সঙ্গে শ্রেণির কোনো সরাসরি যোগাযোগ নেই, সেগুলোর তাৎপর্য অনুধাবনে ব্যর্থতা অবাক হওয়ার মতো কোনো বিষয় নয়।

এই যে বিবিধ ধরনের কর্তৃত্ববাদ, তার বিরুদ্ধে সংগ্রামও হতে হবে বহুমাত্রিক। এ ক্ষেত্রে সমাজতান্ত্রিক প্রকল্পকে র‍্যাডিক্যালাইজেশন অব ডেমোক্রেসি হিসেবে সংজ্ঞায়িত করতে হবে। শ্রমিকশ্রেণির দাবির সঙ্গে নতুন আন্দোলনসমূহের একটি সাযুজ্য তৈরি করতে হবে। এটি হবে একটি অভিন্ন ইচ্ছার (common will) প্রতিফলন। গ্রামসি এটাকে এক্সপানসিভ হেজেমনি বা প্রসারণশীল আধিপত্য হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। কাজেই গণতান্ত্রিক বিপ্লব হবে মুক্তির জন্য বহুমুখী সংগ্রাম। এই সংগ্রামে বিভিন্ন সামাজিক শক্তির অংশগ্রহণ থাকবে। সমাজের দ্বন্দ্ব এখন আর নিছক শ্রমিকশ্রেণির সঙ্গে শোষকদের দ্বন্দ্বে সীমিত থাকছে না। এটি এখন এক সম্প্রসারিত রূপ ধারণ করেছে। এর অর্থ এই নয় যে শ্রমিকশ্রেণির স্বার্থের সঙ্গে সরাসরি সম্পৃক্ত

নয়, এমন ইস্যুগুলো বিশেষ দৃষ্টি দাবি করবে। শতাল মৌফ বলতে চান, বামপন্থার সংগ্রাম হবে বিভিন্নরূপী অধস্তন অবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিরোধকে ব্যক্ত করা। কোনো সুনির্দিষ্ট অধস্তনতাকে সংগ্রামের কেন্দ্রীয় বিষয়ে পরিণত করা ঠিক হবে না বলেই তিনি মনে করেন। কিন্তু তাঁর এই অবস্থান একেবারেই বিতর্কের ঊর্ধ্বে নয়। তা-ই যদি হয়, তাহলে আমাদের দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের তত্ত্ব অগ্রাহ্য করতে হবে। সমাজ বিকাশের গতিধারা আমাদের বারংবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছে যে একটি সমাজে একাধিক দ্বন্দ্ব থাকলেও এর মধ্যে শুধু একটিই হবে প্রধান দ্বন্দ্ব। এটিকে ভিত্তি করেই সমাজ পরিবর্তনের আন্দোলনের কৌশল রচনা করতে হবে।

এই মুহূর্তে বাংলাদেশে নারীর অধিকারের প্রশ্ন এবং পরিবেশ ও প্রাণবৈচিত্র্যের প্রশ্ন যথেষ্ট গুরুত্ব নিয়ে হাজির হয়েছে। আমাদের সমাজে নারীরা বহুবিধ অধিকারহীনতার শিকার। সমাজে তাদের অধস্তনরূপী অবস্থানও খুব স্পষ্ট। এই পরিস্থিতির যৌক্তিক সুরাহা করা ভিন্ন কোনো আর্থসামাজিক উন্নতি আশা করা যায় না। এ দেশের পরিবেশ ও প্রাণবৈচিত্র্যের অপূরণীয় ক্ষতি ঘটছে। বনভূমি উজাড় করে, প্রাকৃতিক জলাধার দখল ও ধ্বংস করে, সব ধরনের দূষণ সৃষ্টি করে জীবনের গতিকে স্তব্ধ করে দেওয়া এখন নিত্যদিনের সমস্যা। এসব সমস্যা থেকে নিষ্কৃতি লাভের জন্য সরকার ও রাষ্ট্রব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তনের প্রয়োজন। রাষ্ট্র প্রশ্নের সমাধান ভিন্ন জনজীবন এখন যেসব সমস্যায় আকীর্ণ, তা থেকে মুক্ত হওয়া সম্ভব নয়। কার্ল মার্ক্স রাষ্ট্রের 'শুকিয়ে' যাওয়ার তত্ত্ব হাজির করেছিলেন। কিন্তু বাস্তব অবস্থা হলো, রাষ্ট্র এখন অতীতের তুলনায় অনেক বেশি শক্তিশালী ও আগ্রাসী। বিদ্যমান সমাজতন্ত্র কিংবা অস্তিত্বলুপ্ত সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে পাশ্চাত্যের উদারনৈতিক গণতন্ত্রীদের একটি কঠোর সমালোচনা হলো যে এই ব্যবস্থা রাষ্ট্রকে এতই আধিপত্যমূলক করে তুলেছে যে ব্যক্তি ও সমাজের মৃত্যু ঘটেছে।

সমকালীন বিশ্ব পুঁজিবাদ

বিশ্ব পুঁজিবাদ এখন সংকটের মধ্যে আছে। এই সংকটের স্বরূপ বোঝার জন্য *পোস্ট ক্যাপিটালিজম : আ গাইড টু আওয়ার ফিউচার* গ্রন্থের লেখক পল ম্যাসন (২০১৫) ইউরোপের একটি দরিদ্র দেশ মলদোভার প্রতি দৃষ্টিপাত করেছেন। দেশটি সোভিয়েত ইউনিয়নেরই অংশ ছিল। বিগত শতাব্দীর ৯০ দশকের প্রারম্ভে যখন সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে পড়ে এবং নব্য উদারনীতিবাদের উত্থান হয়, তখন একটি পৃথক দেশ হিসেবে মলদোভার সৃষ্টি হয়। শুরু থেকেই বাজার-প্রক্রিয়া মলদোভাকে গ্রাস করতে থাকে। আলোচ্য গ্রন্থের লেখক মলদোভার অনেক গ্রামবাসীর সঙ্গে কথা বলে বুঝতে পেরেছেন, তাঁরা মলদোভায় থাকার চেয়ে পুতিনের পুলিশি রাষ্ট্র রাশিয়ায় বাস করাই পছন্দ করেন। মলদোভা আর দশটি ইউরোপীয় ধনী দেশের সঙ্গে তুলনীয় নয়।

অর্থনৈতিক দিক থেকে মলদোভার অবস্থান প্রান্তিক। পুঁজিবাদী অর্থনীতির ভাটার টান সঠিকভাবে অনুধাবন করা যায় মলদোভার মতো দেশের প্রতি দৃকপাত করলে। আমরা বুঝতে পারি, কেন অর্থনীতি স্থবির, সমাজে সংকট, বিভিন্ন স্থানে সশস্ত্র সংঘাত ও গণতন্ত্র ক্ষয়িষ্ণু। পাশ্চাত্যের অর্থনৈতিক ব্যর্থতা আমাদের অনেকের মূল্যবোধ ও প্রতিষ্ঠানগুলোর ওপর চিরলালিত আস্থায় আঘাত হানছে। পুঁজিবাদের আর্থিক কেন্দ্রগুলোতে কাচের দেয়াল দিয়ে ভেতরটাকে খুব স্বস্তিদায়ক মনে হয়। ২০০৮ সাল থেকে ট্রিলিয়ন ট্রিলিয়ন ডলারে বানানো ব্যাংক, হেজ ফান্ড, ল ফান্ড ও কনসালট্যান্সির মধ্য দিয়ে বিশ্বব্যবস্থাকে কার্যকর রাখার জন্য প্রবাহিত করা হয়েছে।

কিন্তু পুঁজিবাজারের দীর্ঘমেয়াদি পরিস্থিতি খুবই অন্ধকারাচ্ছন্ন। অর্থনৈতিক সহযোগিতা ও উন্নয়ন সংস্থার (ওইসিডি) প্রেক্ষণ অনুযায়ী আগামী ৫০ বছর উন্নত বিশ্বে প্রবৃদ্ধি হবে অত্যন্ত দুর্বল। অর্থনৈতিক বৈষম্য আরও ৪০ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে। এমনকি উন্নয়নশীল দেশগুলোতে দৃশ্যমান অর্থনৈতিক প্রাণচাঞ্চল্য ২০৬০ সাল নাগাদ নিঃশেষ হয়ে যাবে। ২০০৮ সালে অর্থনৈতিক সংকটের সূচনা হয়েছিল। এ থেকে উদ্ভব ঘটেছে সামাজিক সংকটের, সামাজিক সংকট থেকে গণ-অসন্তোষ ও বৈশ্বিক উত্তেজনার। ফলে বিশ্বব্যবস্থা সংকটের মুখে পড়েছে। এ সংকট দুই ধরনের পরিণতি ডেকে আনতে পারে। প্রথমত বিশ্বের ঊর্ধ্বতন শ্রেণিগুলো নিজেদের অবস্থান ধরে রাখার চেষ্টা করবে। আগামী ১০ থেকে ২০ বছর তারা সংকটের ব্যয় শ্রমিকশ্রেণি, অবসরভোগী ও গরিবদের ওপর চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবে। আইএমএফ, বিশ্বব্যাংক ও বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা টিকে থাকলেও দুর্বল হয়ে পড়বে। বিশ্বায়নকে টিকিয়ে রাখার ব্যয় বহন করবে উন্নত দেশের সাধারণ মানুষগুলো। কিন্তু প্রবৃদ্ধি স্থবির হয়ে পড়বে।

দ্বিতীয় দৃশ্য হলো, সমঝোতা ভেঙে পড়বে। সাধারণ জনগণের কৃচ্ছ্রতার ব্যয় বহন করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপনের মধ্য দিয়ে কট্টর দক্ষিণপন্থী বা বামপন্থীরা ক্ষমতায় আসবে। এক রাষ্ট্র অন্য রাষ্ট্রের ওপর ব্যয়ের বোঝা চাপানোর চেষ্টা করবে। বিশ্বায়ন ধসে পড়বে। বৈশ্বিক প্রতিষ্ঠানগুলো শক্তিহীন হয়ে পড়বে। এই প্রক্রিয়ায় সব বিরোধ, যেমন ড্রাগ-যুদ্ধ, সোভিয়েত-উত্তর জাতীয়তাবাদ, জিহাদিবাদ, অনিয়ন্ত্রিত অভিবাসন এবং এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সমগ্র ব্যবস্থার কেন্দ্রে আগুন ধরিয়ে দেবে। এই দৃশ্যপটে আন্তর্জাতিক আইনের প্রতি নামসর্বস্ব মৌখিক সমর্থনও থাকবে না। রাষ্ট্রযন্ত্রের জন্য নির্যাতন, সেন্সরশিপ, নির্বিচার গ্রেপ্তার ও গণনজরদারি সার্বক্ষণিকভাবে ব্যবহৃত হাতিয়ারে পরিণত হবে। ১৯৩০-এর দশকে এমন ধরনের পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল। ভবিষ্যতে যে তেমনটি হবে না, তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। প্রথম বা দ্বিতীয় দৃশ্যপট, যেটিই সৃষ্টি হোক না কেন, ২০৫০ সাল নাগাদ জলবায়ু পরিবর্তন, বয়স্ক জনসংখ্যার চাপ, জনসংখ্যা বৃদ্ধি প্রভৃতি আপৎগুলো একসঙ্গে দেখা দেবে। যদি একটি টেকসই বিশ্বব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব না হয় এবং অর্থনীতিতে

গতিশীলতা আনয়ন করা সম্ভব না হয়, তাহলে ২০৫০ সালের পর মহাবিশৃঙ্খলা দেখা দেবে (Paul Mason, ২০১৫)।

পুঁজিবাদ নিছক একটি অর্থনৈতিক কাঠামো কিংবা একগুচ্ছ আইনকানুন ও প্রতিষ্ঠান নয়। এটি একটি পরিপূর্ণ ব্যবস্থা—সামাজিক, অর্থনৈতিক, জনমিতিক, সাংস্কৃতিক ও আদর্শিক বৈশিষ্ট্য-সংবলিত। এই ব্যবস্থা বাজার ও ব্যক্তিমালিকানার মাধ্যমে কাজ করে। কিন্তু এর মধ্যেও রয়েছে অপরাধী চক্র, গোপন ক্ষমতাজাল, অধ্যাত্মবাদী প্রচারক ও *ওয়ালস্ট্রিট*-এর দস্যুসুলভ বিশ্লেষণ। পুঁজিবাদ বলতে আমরা বুঝব বাংলাদেশের তাজরীন ও রানা প্লাজা পোশাক কারখানা ধসে পড়ে শত-সহস্র শ্রমিকের মৃত্যু, পঙ্গুত্ব বরণ ও বেকার জীবন।

পুঁজিবাদের বেশ কয়েকটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য আছে। পুঁজিবাদ প্রাণসত্তার সঙ্গে তুলনীয়। এর রয়েছে একটি জীবনচক্র, যার থাকে শুরু, মধ্য ও শেষ সময়। এর জটিল ব্যবস্থাকে ব্যক্তি, সরকার, এমনকি পরাশক্তিগুলোও নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। পুঁজিবাদ এমন সব পরিণতির জন্ম দেয়, যা মানুষের অচিন্তনীয়। পুঁজিবাদী অর্থনীতিবিদেরা ধারণা করেন, মানুষ যুক্তিসংগত আচরণ করে। তৎসত্ত্বেও এ ব্যবস্থায় অচিন্তনীয় পরিণতির সৃষ্টি হয়। পুঁজিবাদের একটি বৈশিষ্ট্য হলো, এ ব্যবস্থা নিয়ত শিক্ষা গ্রহণের চেষ্টা করে। পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে ওঠার একটি প্রবণতা এ ব্যবস্থায় দেখা যায়। বড় বাঁক পরিবর্তনের মুহূর্তে এ ব্যবস্থায় রূপান্তর ঘটে। প্রাণকোষের যেমন গোষ্ঠী বৃদ্ধি পায় বিপদ লক্ষ করে, ঠিক একইভাবে সংকট, পুঁজিবাদে এমন সব প্যাটার্ন ও কাঠামোর জন্ম দেয়, যেগুলো পুরোনো প্রজন্মের পক্ষে বোঝাই কঠিন হয়ে পড়ে। পুঁজিবাদের টিকে থাকার সহজাত প্রবৃত্তি হলো প্রযুক্তির নবায়ন ও উন্নয়ন। তথ্যপ্রযুক্তি ছাড়াও খাদ্য উৎপাদন, জন্মনিয়ন্ত্রণ অথবা স্বাস্থ্যক্ষেত্রে গত ২৫ বছরে যে উন্নয়ন ঘটেছে, তা অতীতের যেকোনো পরিবর্তনের সঙ্গে তুলনাহীন। এগুলোকে কেন্দ্র করে আমরা মানুষের সক্ষমতার অভূতপূর্ব পরিবর্তন লক্ষ করছি। কিন্তু এসব প্রযুক্তি পুঁজিবাদের সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ নয় এবং ভবিষ্যতেও সাযুজ্যপূর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা একেবারেই ক্ষীণ। এ অবস্থায় পুঁজিবাদ পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে ব্যর্থ হয়। প্রযুক্তিকে ব্যবহার করতে গিয়ে মানুষের আচরণগত ও সংগঠনগত যেসব পরিবর্তন আসে, সেগুলো স্বতঃস্ফূর্তভাবে উত্তর-পুঁজিবাদের জন্ম দেয়। এককথায় বলা যায়, পুঁজিবাদ এমন একটি স্তরে পৌঁছে গেছে, যে ক্ষেত্রে পুঁজিবাদের অভিযোজন ক্ষমতা আর কাজ করে না।

উত্তর-পুঁজিবাদের কিছু বৈশিষ্ট্য নিচে ব্যাখ্যা করা হলো—

১. তথ্যপ্রযুক্তি শ্রমের প্রয়োজনীয়তা হ্রাস করেছে। ফলে কাজ ও কর্মহীন সময়ের মধ্যে পার্থক্য অস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে। শিথিল হয়ে পড়ছে শ্রম ও মজুরির সম্পর্ক।

২. তথ্যপণ্যের ফলে সঠিক দাম নির্ধারণের সক্ষমতা বাজার হারিয়ে ফেলছে। কারণ, বাজারের ভিত্তি হলো দুষ্প্রাপ্যতা, আর তথ্যের জোগান হলো অঢেল। ফলে পুঁজিবাদ টিকে থাকার জন্য একচেটিয়াত্ব (monopoly) সৃষ্টি করছে, যা গত দুই শ বছরে দেখা যায়নি। এতেও এগুলো রক্ষা পাবে না।

৩. স্বতঃস্ফূর্তভাবে সহযোগিতামূলক উৎপাদনের উদ্ভব ঘটছে—এমন সব পণ্য, সেবা ও সংগঠনের উদ্ভব ঘটছে, যেগুলো বাজারের নির্দেশ বা ব্যপস্থাপনার পদসোপান মানে না। বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ তথ্যপণ্য হলো উইকিপিডিয়া। ২৭ হাজার স্বেচ্ছাসেবক এতে অবদান রাখছেন। তাঁরা বিনিময়ে কিছুই নিচ্ছেন না। ফলে এনসাইক্লোপিডিয়া ব্যবসার কোমর ভেঙে গেছে। এনসাইক্লোপিডিয়া-কেন্দ্রিক বিজ্ঞাপনশিল্পে ধস নেমেছে। এ ব্যবসার বার্ষিক ৩ বিলিয়ন ডলারের ক্ষতি হচ্ছে।

আমাদের দৃষ্টির আড়ালে বাজারব্যবস্থার মধ্যে ফোকর ও ফাঁপা অবস্থার সৃষ্টি হচ্ছে। অর্থনৈতিক জীবন ভিন্ন এক ছন্দে চলতে শুরু করেছে। সমান্তরাল মুদ্রা, টাইম ব্যাংক, সমবায় ও স্বব্যবস্থিত পরিসর বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। ব্যবসার ক্ষেত্রে নব্য সংস্কৃতির সূচনা ঘটেছে। গণমাধ্যম এটিকে অংশীদারত্বের অর্থনীতি (sharing economy) বলে চিহ্নিত করেছে। এখন 'Commons' ও 'Peer-production' জাতীয় নতুন নতুন পরিভাষার উদ্ভব ঘটছে। কিন্তু কেউ কি বুঝতে চাইছে, এর ফলে পুঁজিবাদের কী পরিণতি হবে?

পল ম্যাসন (২০১৫) মনে করেন, শেয়ারিং ইকোনমি উদ্ভাবনের মধ্য দিয়ে পুঁজিবাদ আত্মরক্ষার একটি সুযোগ পেয়েছে। কিন্তু সবকিছু নির্ভর করছে ব্যষ্টিক পর্যায়ের প্রকল্পগুলোকে লালন, এগিয়ে নেওয়া ও রক্ষা করার ওপর। তবে এ জন্য সরকার এখন যেভাবে কাজ করছে, সে ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন আনতে হবে। প্রযুক্তি, মালিকানা ও কাজ সম্পর্কে আমাদের চিন্তায় পরিবর্তন আনতে হবে। এটাই হবে বাঁচার নতুন পথ। পল ম্যাসন পুঁজিবাদের প্রতি দুর্বলতা ত্যাগ করতে পারছেন না। তিনি তাঁর নতুন সিস্টেমের নাম দিয়েছেন 'পোস্ট-ক্যাপিটালিজম'। তিনি তাঁর কল্পিত পোস্ট-ক্যাপিটালিজম টিকে থাকার শর্ত হিসেবে মনে করেছেন যে সরকারের কাজের ধারায় বিশাল পরিবর্তন আনতে হবে। অর্থাৎ নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বিরাট পরিবর্তনের প্রয়োজন হবে। সরকারের কথা বলা হলেও কাজটি রাষ্ট্রের। ম্যাসন বলেছেন, পুরো ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখার জন্য এমন একটি একচেটিয়া ব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে, যা গত দুই শ বছরে দেখা যায়নি। সুতরাং এই নতুন যুগে দ্বন্দ্ব হবে একচেটিয়াত্ব সৃষ্টি করে পুঁজিবাদকে টিকিয়ে রাখার প্রয়াসের সঙ্গে ব্যষ্টিক পর্যায়ের শেয়ারিং ইকোনমির উপাদানগুলোর। সমসাময়িক কালের তথ্যপ্রযুক্তি পূর্বেকার তথ্যপ্রযুক্তি থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। এ প্রযুক্তির প্রবণতা হলো বাজারব্যবস্থা ও মালিকানা ভেঙে দেওয়া এবং কাজ ও মজুরির মধ্যকার সম্পর্ক ভেঙে দেওয়া।

এর মধ্যে দিয়ে যে সংকট সৃষ্টি হবে, সে সংকট অতিক্রম করা অসম্ভব হয়ে পড়বে। কাজেই যে দ্বন্দ্বের কথা বলা হয়েছে, তার সমাধান ভিন্ন অন্য কোনো পথ নেই।

বিগত শতাব্দীতে বামপন্থীরা বুঝে উঠতে পারেননি পুঁজিবাদের অবসানের পর কী আসতে পারে। সেকালের বামপন্থীরা বাজার-প্রক্রিয়ার অবসান চেয়েছেন। শ্রমিকশ্রেণি এটি অর্জনের জন্য ব্যালট কিংবা ব্যারিকেডের পথ বেছে নেবে। লক্ষ্য হবে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল। অর্থনীতির ক্ষেত্রে একের পর এক সংকট শ্রমিকশ্রেণির রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের সুযোগ তৈরি করে দেবে। তবে বিংশ শতাব্দীর শেষে যা ঘটছে, তা দেখে মনে হয়, শ্রমিকশ্রেণির প্রকল্পটি ব্যর্থ হয়ে গেছে। পরিকল্পিত অর্থনীতির জায়গা নিয়ে ফেলেছে বাজার, যৌথথার স্থলে এসেছে ব্যক্তিতা। বিশ্বজুড়ে বিরাট শ্রমিকশ্রেণির সৃষ্টি হয়েছে, যা দেখতে প্রলেতারিয়েতের মতো, কিন্তু তাদের চিন্তাভাবনা প্রলেতারিয়েতের মতো নয়। সবকিছু দেখে-শুনে স্বপ্নভঙ্গের বেদনায় ভুগতে হয়। কিন্তু সর্বাধুনিক প্রযুক্তিতাড়িত পরিবর্তন নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করেছে। এই সম্ভাবনায় রাষ্ট্রই থাকবে কেন্দ্রীয় ভূমিকায়। অর্থাৎ রাষ্ট্রকে নতুন সম্ভাবনার ধাত্রী হিসেবে কাজ করতে হবে।

পুরোনো সমাজতান্ত্রিক মডেলে রাষ্ট্র বাজারের দায়িত্বটি পালন করত এবং ধনীদের পরিবর্তে গরিবদের পক্ষে ভূমিকা পালন করত। উৎপাদনের প্রধান প্রধান অঙ্গনগুলোকে বাজার থেকে বের করে পরিকল্পিত অর্থনীতির সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হতো। অর্থনীতিবিদ অস্কার লাঙ্গা দেখিয়েছেন, সুষ্ঠু পরিকল্পনা কীভাবে বাজারের স্থান দখল করতে পারে। বাজার অর্থনীতিকে সচল রাখার জন্য আমাদের সবার অলক্ষ্যে লক্ষ-কোটি সমীকরণ সমাধান করে। কেন্দ্র থেকে প্রান্ত ও প্রান্ত থেকে কেন্দ্র পর্যন্ত তথ্যের সরবরাহ নিশ্চিত করা গেলে পরিকল্পিত অর্থনীতি ত্রুটিপূর্ণ হওয়ার কথা নয়। ১৯১৭ সালের বিপ্লবের পর সোভিয়েত ইউনিয়ন সেই পথেই হেঁটেছিল। কিন্তু সমাজতন্ত্র নিয়ে এই পরীক্ষা সফল হয়নি। আসলে সমাজতন্ত্র নিয়ে এই যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা, তা একটি ভালো প্রশ্ন, কিন্তু এই মুহূর্তে তা আর প্রাসঙ্গিক নয়।

শেয়ারিং ইকোনমির বিবিধ উপাদান লক্ষ করে এ কথাই বলা যায় যে এর ফলে যে দ্বন্দ্বের উদ্ভব হচ্ছে, তা সম্পূর্ণ নিরসনযোগ্য নয়। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্ব ইউরোপ যেভাবে রাতারাতি পাল্টে গেছে, অনেকটা সে রকমভাবেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ অনেক ধনী পাশ্চাত্যের দেশগুলোকে বদলে যেতে হবে। পল বারান একসময় বলেছিলেন, '….What it does mean—and this is a historical lesson of paramount importance—is that socialism in backward and underdeveloped countries has a powerful tendency to become a backward and underdeveloped socialism.' (Paul A. Baran, Preface to the First Edition, 1957). বারানের এই উক্তি যথার্থই ছিল। বিংশ শতাব্দীতে যেসব দেশে বিপ্লব হয়েছে সেসব দেশে পুঁজিবাদ অনুন্নত পর্যায়ে ছিল। এ রকম দেশে পুঁজিবাদের

স্তর পেরিয়ে সমাজতন্ত্র নির্মাণ অনেক সমস্যার জন্ম দেয়। কারণ, এসব দেশে সমাজের মৌল কাঠামো ছিল অনুন্নত। অনুন্নত মৌল কাঠামোর ওপর অতি অগ্রসর সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন সম্পর্ক তৈরি করতে গিয়ে দেখা দেয় নানা রকম বিপত্তি। এ কারণেই অনুন্নত সমাজতন্ত্রের বিষয়টি উত্থাপিত হয়েছে। তদুপরি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অবয়ব ও দৈনন্দিন কর্মকাণ্ড কীভাবে পরিচালিত হবে, সে সম্পর্কে কোনো পূর্ব ধারণা ছিল না। রাষ্ট্রক্ষমতা হাতে পেয়ে লেনিন ও স্ট্যালিন নানা সমস্যার মুখে পড়েন এবং এগুলো অতিক্রম করার জন্য যে সমাধান দেওয়া হয়েছে, তা-ও সর্বতোভাবে যথার্থ ছিল—এমনটি দাবি করা যায় না। এখনো পৃথিবীতে কমিউনিস্টশাসিত যে রাষ্ট্রগুলো টিকে আছে, সেগুলোর মধ্যে উত্তর কোরিয়া ব্যতিরেকে অন্য দেশগুলো কম বা বেশি মাত্রায় বাজারকে আলিঙ্গন করেছে এবং ব্যক্তি উদ্যোগকে কাজে লাগানোর চেষ্টা করছে। এতে তারা সুফলও পাচ্ছে। ধীরগতিতে হোক কিংবা দ্রুতগতিতে, তারা অর্থনৈতিক স্থবিরতা কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হয়েছে এবং দারিদ্র্য নিরসনে অনেক দূর এগিয়ে গেছে। জনগণের জীবনমানেরও উন্নতি ঘটাতে সক্ষম হয়েছে। সংশয়বাদীরা প্রশ্ন তুলেছেন, সমাজতন্ত্রের আর রইল কী? রাষ্ট্রক্ষমতায় কমিউনিস্ট পার্টি নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব বজায় রাখলেও তারই পৌরোহিত্যে পুঁজিবাদী উৎপাদন সম্পর্ক বহাল ও মজবুত করা হচ্ছে। অর্থনৈতিক বৈষম্যও বাড়ছে। চীনের কমিউনিস্ট পার্টি বলছে, তারা এখন 'চীনা বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন সমাজতন্ত্র' নির্মাণ করার চেষ্টা করছে। তারা আরও বলছে, চীন এখন সমাজতন্ত্রের প্রাথমিক স্তরে রয়েছে।

অনগ্রসর দেশে সমাজতন্ত্র

কার্ল মার্ক্স ভেবেছিলেন, জার্মানির মতো উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব হবে। বাস্তবে বিপ্লব হলো রাশিয়ায়। জার-শাসিত রাশিয়া ছিল রাজনৈতিকভাবে স্বৈরতন্ত্রী ও অর্থনৈতিকভাবে অনুন্নত পুঁজিবাদী। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে এমন সব সামাজিক ও আন্তর্জাতিক দ্বন্দ্বের উদ্ভব ঘটল, সেখানে শেষ পর্যন্ত বলশেভিক পার্টি ক্ষমতা দখল করল। এ জন্য রুশ বিপ্লবকে বলশেভিক বিপ্লবও বলা হয়। তখনকার মার্ক্সবাদী তাত্ত্বিকদের বিশ্লেষণ অনুযায়ী রাশিয়া ছিল 'Weakest link in the chain of imperialism.' (Lenin, *Collected Works*, Vol. 24, Progress Publishers, Moscow, 1964)। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ জারতন্ত্রী রুশ রাষ্ট্রকাঠামোকে ভেতর থেকে ভঙ্গুর করে ফেলেছিল। রাষ্ট্রযন্ত্রের সবচেয়ে বড় শক্তির উৎস সামরিক বাহিনীর ওপর রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ খুবই শিথিল হয়ে পড়েছিল। রণক্লান্ত সৈনিকেরা শান্তি খুঁজছিলেন। তাঁদের মধ্যে বলশেভিক পার্টির তৎপরতার ফলে শ্রেণি-চেতনারও উন্মেষ ঘটেছিল। লেনিনের দৃষ্টিতে সৈনিকেরা হলেন 'Peasants in uniform' (Lenin, Speech Delivered at the Second All Russia Congress of Soviets of Peasants'

Deputies, December 2, 1917. First published : *Izvestia*, No 244, Dec 6, 1917. Source, Lenin, *Collected Works*, Progress publishers, Moscow,1972, pp 357-360)। এমন এক পরিস্থিতিতে লেনিন রুটি, শান্তি ও স্বাধীনতার স্লোগান দিয়ে শ্রমিক, কৃষক ও সৈনিকদের মধ্যে মহা আলোড়ন সৃষ্টি করলেন। সংঘটিত হলো দুনিয়া কাঁপানো ১০ দিনের রুশ বিপ্লব।

উত্তর-পুঁজিবাদের বৈশিষ্ট্য

দেখা গেছে সমাজের বিরাট ধরনের ওলটপালটের আজ একটি বাস্তব প্রেক্ষাপট সৃষ্টি হয়। আজকের বিশ্বায়ন একদিকে যেমন বাজার সম্পর্ককে বিশ্বের নিভৃত পল্লিগুলোতেও পৌঁছে দিয়েছে, অন্যদিকে মানুষে মানুষে যোগাযোগ ও সম্পর্ক সৃষ্টিতে তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তিকে উন্নততর স্তরে নিয়ে যাচ্ছে। এগুলোকে অবলম্বন করেই উত্তর-পুঁজিবাদের পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। উত্তর-পুঁজিবাদ ব্যষ্টিক পর্যায়ে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে এমন সব উপাদানের জন্ম দিয়েছে, যাকে আর যা-ই বলা যাক, ধ্রুপদি পুঁজিবাদ বলা যাবে না। কিন্তু এই উপাদানগুলোর সমাজতান্ত্রিক বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে মিল রয়েছে। ইতিহাসের স্বাভাবিক গতিধারায় যেভাবে একসময় দাস সমাজ থেকে সামন্ত সমাজ, সামন্ত সমাজ থেকে পুঁজিবাদী সমাজের উৎপত্তি হয়েছিল; আজ সে রকম ঐতিহাসিক গতিধারার মধ্য দিয়ে সমাজতন্ত্রের আগমনের একটি অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে। কার্ল মার্ক্সের ভাষায় এ অবস্থা হলো independent of man's will। সুতরাং একসময় বিদ্যমান সোভিয়েত সমাজতন্ত্র ভেঙে পড়েছে বলে হতাশ হওয়ার কোনো কারণ নেই। আসলে প্রযুক্তির শক্তি এবং সামাজিক শক্তিগুলোর মধ্যকার দ্বন্দ্ব সমাজতন্ত্রকে তার স্বাভাবিক গতিতে বিকাশ লাভের সুযোগ করে দিচ্ছে। তবে পরিবর্তন সমাজতান্ত্রিক বৈশিষ্ট্যমুখী হলেও রাষ্ট্রক্ষমতা নিয়ন্ত্রণের প্রশ্নটি থেকেই যাবে। তা থেকে রক্তপাতহীন বা রক্তপাতময় সংঘাতের সৃষ্টি হতে পারে। সবকিছুই নির্ভর করবে নতুন যুগের প্রলেতারিয়েতদের মধ্যে রাজনৈতিক সামাজিকায়ন কী রূপ ধারণ করবে, এর ওপর। এটা পূর্বাহ্নে বলে দেওয়া সম্ভব নয়। পরিবর্তনের শর্তগুলো তৈরি হচ্ছে, যেভাবে মুরগির ডিমের অভ্যন্তরে মুরগির ছানা জন্ম নেওয়ার শর্ত বিরাজ করে।

ধ্রুপদি মার্ক্সবাদের তিনটি প্রশ্ন

ধ্রুপদি মার্ক্সবাদী তত্ত্ব অনুযায়ী একটি শ্রমিকশ্রেণির পার্টিকে তিনটি প্রশ্নের সমাধান করতে হয়। প্রশ্নগুলো হলো :

১. শ্রেণি প্রশ্ন
২. রাষ্ট্র প্রশ্ন
৩. জাতি প্রশ্ন

তিনটি প্রশ্নই গুরুত্বপূর্ণ। তবে শেষ লক্ষ্য রাষ্ট্রক্ষমতা দখল। রাষ্ট্রক্ষমতা দখল ছাড়া কোনো কিছুই অর্জন করা কিংবা রক্ষা করা সম্ভব নয়।

শ্রেণি প্রশ্ন

মার্ক্সবাদী তত্ত্বে শ্রেণির ধারণাটি কেন্দ্রীয় গুরুত্বপূর্ণ একটি ধারণা। মার্ক্স অথবা এঙ্গেলস শ্রেণির ধারণাটিকে ধারাবাহিকভাবে বিশ্লেষণ করে যাননি। মার্ক্স ১০ নভেম্বর ১৮৩৭ সালে তাঁর পিতার নিকট এক চিঠিতে শ্রেণি হিসেবে প্রলেতারিয়েতের আবিষ্কার সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে লিখেন, 'The idea in the real itself.' মার্ক্স এই শ্রেণির মধ্যে একটি রাজনৈতিক শক্তির উত্থান লক্ষ করেন, যারা মুক্তির লড়াই করবে। এ উপলব্ধি থেকেই তিনি আধুনিক সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামোর বিশ্লেষণ হাজির করেন এবং এর বিকাশের পথ নির্দেশ করেন। একই সময়ে ফ্রেডরিক এঙ্গেলসও একই ধরনের আবিষ্কার করেন এবং শ্রমিকশ্রেণির বাস্তব অবস্থা তাঁর গবেষণাকর্ম *The Condition of the Working Class in England* (1845) গ্রন্থে তুলে ধরেন। মার্ক্সবাদী ইতিহাস তত্ত্বে শ্রেণিকাঠামো ও শ্রেণি-সংগ্রাম গুরুত্বপূর্ণ স্থান নিয়ে আছে। শ্রেণি-দ্বন্দ্ব ঐতিহাসিক বিকাশের পেছনে প্রধান চালিকা শক্তি হিসেবে কাজ করে। *কমিউনিষ্ট মেনিফেস্টো* পুস্তিকায় বিষয়টি স্পষ্ট করা হয়েছে। *German Ideology* গ্রন্থে (1964) মার্ক্স ও এঙ্গেলস বলেছেন, শ্রেণি নিজেই বুর্জোয়াদের উৎপাদিত একটি বিষয়। তবে তাঁরা বিভিন্ন সমাজে প্রধান প্রধান শ্রেণি ও তাদের মধ্যকার সম্পর্ক নিয়ে উল্লেখযোগ্য কোনো বিশ্লেষণ চালিয়ে যাননি। কাউৎস্কি (১৯২৭) শ্রেণি, পেশা ও মর্যাদা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তিনি বলতে চেয়েছেন, *কমিউনিষ্ট মেনিফেস্টো* পুস্তিকায় উল্লেখযোগ্য শ্রেণি-দ্বন্দ্বগুলো মূলত ছিল মর্যাদা-স্তরের মধ্যে দ্বন্দ্ব। মার্ক্স-এঙ্গেলসও এ ব্যাপারে সচেতন ছিলেন। *কমিউনিষ্ট মেনিফেস্টো* পুস্তিকায় (১৯৬২) তাঁরা লিখেছেন, 'In the earlier epochs of history, we find almost everywhere a complicated arrangement of society into various orders, a manifold gradation of social rank.' কিন্তু বুর্জোয়া যুগে এসে গোটা সমাজ উত্তরোত্তর দুটি বিশাল বিরোধী ক্যাম্পে বিভক্ত হয়ে গেছে। এগুলো হলো পরস্পর মুখোমুখি দুটি শ্রেণি—বুর্জোয়া ও প্রলেতারিয়েত। অবশ্য মার্ক্স তাঁর আলোচনায় সব সমাজেই শ্রেণিবিভাজনের অস্তিত্বের কথা বলেছেন। একমাত্র ব্যতিক্রম হলো আদিম গোত্রীয় গোষ্ঠী। শ্রেণি পার্থক্যের ব্যাপারটা স্পষ্ট করতে গিয়ে তিনি বলেছেন, 'It is always the direct relation between the owners of the condition of production and the direct producers which reveals the innermost secret, the hidden foundation, of the entire social edifice." (*Capital-iii*, Ch.47)।

পরবর্তী যুগের মার্ক্সবাদীরা মার্ক্স ও এঙ্গেলসকে অনুসরণ করেই তাঁদের বিশ্লেষণ করেছেন। এই বিশ্লেষণ মূলত নিবিষ্ট হয়েছে পুঁজিবাদী সমাজের শ্রেণিকাঠামোর ওপর। তাঁদের দুটি বিষয় দেখতে হয়েছে। প্রথমটি হলো সামাজিক স্তরভেদের জটিলতা। এই স্তরভেদের সঙ্গে মূল শ্রেণিসমূহের সম্পর্ক থাকে। মার্ক্সের *Capital* গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ড প্রকাশ করেছিলেন ফ্রেডরিক এঙ্গেলস। এর একটি অধ্যায় হলো 'The Three Great Classes of Modern Societry'। এতে মার্ক্স বলেছেন, ইংল্যান্ডের মতো দেশে যেখানে শ্রেণিকাঠামো খুবই তীক্ষ্ণ ও ধ্রুপদি ধাঁচে বিবেচিত, সে রকম দেশেও মধ্যবর্তী ও ক্রান্তিকালীন স্তর দেখা যায়, যা শ্রেণির সীমানাকে অস্পষ্ট করে ফেলে। মার্ক্স তাঁর *Theories of Surplus Value* (অধ্যায়-১৭, অনুচ্ছেদ-৬) গ্রন্থে অর্থনৈতিক সংকট আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন যে প্রাথমিক বিশ্লেষণ হিসেবে একটি সমাজ শুধু শ্রমিকশ্রেণি ও শিল্প পুঁজির শ্রেণির দ্বারা গঠিত হয় না। *Theories of Surplus Value*-তে বলা হয়েছে, পুঁজিবাদের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিকাশও ঘটে থাকে। মার্ক্স লিখেছেন, 'What (Ricardo) forgets to mention is the continual increase in the number of the middle classes……situated midway between the workers on one side and the capitalists and land owners on the other……(who rest with all their weight upon the working basis and at the same time increase the social security and power of the upper ten thousand.' (অধ্যায়-১৮, অনুচ্ছেদ-B1D) এসব মন্তব্য পড়লে মনে হয় না, সমাজ পরস্পরবিরোধী দুটি প্রধান শ্রেণির মেরুকরণের দিকে এগিয়ে চলেছে। যেহেতু মধ্যবিত্তের বিকাশ ঘটেই চলেছে, তাতে করে বার্নেস্টাইন থেকে শুরু করে পুলাঞ্জাস পর্যন্ত মার্ক্সবাদী সমাজবিজ্ঞানীরা বোঝার চেষ্টা করেছেন, কীভাবে মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিকাশ সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের ওপর প্রভাব ফেলে।

দ্বিতীয় প্রশ্নটি হলো পুঁজিবাদী সমাজে বুর্জোয়া ও প্রলেতারিয়েত—এই দুটি প্রধান শ্রেণির অবস্থান ও বিকাশকে কেন্দ্র করে। *The Eighteenth Brumaire* (১৯৬২) গ্রন্থে মার্ক্স পরিপূর্ণভাবে সংগঠিত শ্রেণি সম্পর্কে একটি নেতিবাচক সংজ্ঞা দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন, 'In so far as millions of families live under economic conditions of existence that separate their mode of life, their interests and their culture from those of the other classes, and put them in hostile opposition to the latter, they form a class. In so far as there is nearly a local interconnection among these small-holding peasants, and the identity of their interests begets no community, no national bond and no political organization among them, they do not form a class.'

বিভিন্ন সমাজে শ্রেণি গঠন, সমাজের শ্রেণিগত উত্তরণ, শ্রেণি-দ্বন্দ্ব ও এগুলোকে কেন্দ্র করে গঠিত রাজনৈতিক সংগঠন এবং এগুলোর মধ্যে ঐক্য, অনৈক্য ও দ্বন্দ্বের প্রশ্নটি অত্যন্ত জটিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদ থেকে যত রকম মার্ক্সবাদী গবেষণা হয়েছে, তা থেকে এটি স্পষ্ট যে মার্ক্স ও এঙ্গেলসের লেখায় যেভাবে শ্রেণিকাঠামোর প্রশ্নটি উত্থাপিত হয়েছে, বাস্তবে তা অনেক বেশি জটিল এবং দ্ব্যর্থতাপূর্ণ। মার্ক্স ও এঙ্গেলস পুঁজিবাদের প্রাথমিক যুগে, শ্রেণি-সম্পর্কের বিষয়টি নিয়ে যে রকম নীরবতা বিরাজ করছিল, তার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। শ্রেণি-সমস্যার প্রশ্নটি পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক সমাজের জন্য তাৎপর্যপূর্ণ। এই তাৎপর্য বিশেষ করে রাজনীতিতে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে শ্রেণির সঙ্গে শ্রেণির সম্পর্ক, শ্রেণিসংগ্রাম ও অন্যান্য সামাজিক গোষ্ঠীর সঙ্গে সম্পর্ক (যার মধ্যে জাতিও অন্তর্গত) এবং বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সত্তার মধ্যে সম্পর্ক ও দ্বন্দ্ব আজ পর্যন্ত মার্ক্সবাদীদের জন্য একটি চ্যালেঞ্জ রূপে বিরাজ করছে। এর জন্য প্রয়োজন গভীর অনুসন্ধান, তীক্ষ্ণ সমীক্ষণ ও আলোক নিক্ষেপকারী বিশ্লেষণ। মার্ক্স নিজেই বলেছেন, এসবের সমাধান 'The passe-partout of a historical-philosophical' দ্বারা সম্ভব হবে না। প্রয়োজন হবে প্রতিটি পৃথক ক্ষেত্রে অনুশীলন, অধ্যয়ন, সমীক্ষণ ও তথ্যভিত্তিক বিশ্লেষণ। মার্ক্সের এই মন্তব্যকে ভিত্তি করেই মাও সে-তুং লিখেছিলেন, 'No investigation, no right to speak.' তিনি 'বাস্তব পরিস্থিতির বাস্তব বিশ্লেষণের' ওপরও গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। আহ্বান জানিয়েছিলেন, 'seek truth from facts.'

শ্রেণি বিশ্লেষণের ব্যাপারটি কখনো খুব সহজ নয়। উন্নত ধনবাদী দেশে White collar labour এবং নানা স্তরের মধ্যবিত্ত ও পেশাজীবী শ্রেণির অবস্থান শ্রেণি বিশ্লেষণকে খুবই কঠিন করে ফেলেছে। একজন কম্পিউটার অপারেটর কি প্রলেতারিয়েত কিংবা নিম্ন মধ্যবিত্ত পেশাজীবী? একইভাবে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতেও শ্রেণি বিশ্লেষণ সহজসাধ্য বিষয় নয়। এসব দেশে স্বার্থ ও জীবনযাত্রার দ্বারা কীভাবে একদল মানুষ অন্য একদল মানুষ থেকে পৃথক, তা নির্ণয় করা কঠিন হয়ে পড়ে। দেখা যায়, সমাজের বিভিন্ন স্তর-গোষ্ঠীর মধ্যে স্বার্থের দ্বন্দ্ব এবং স্বার্থের সংশ্লেষ বিদ্যমান। এটা উত্তরণমুখী সমাজেরই বৈশিষ্ট্য। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে যে ধরনের সমাজ আমরা দেখতে পাই, তা নিরন্তর ধীর পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে চলছে। এসব দেশে অনেক ক্ষেত্রেই শিল্পশ্রমিকেরা সত্যিকার অর্থে প্রলেতারিয়েত নন। তাঁদের এক পা থাকে গ্রামে, আরেক পা শহরে। তাঁদের জীবনযাত্রায় গ্রামীণ আয় ও শহরের আয়ের মিশেল থাকে। অনেক ক্ষেত্রেই তাঁদের গ্রামে চাষাবাদের সামান্য জমি থাকে। ক্ষুদ্র জমি থেকে উদ্বৃত্ত আয় করা সম্ভব হয় না। সে জন্য কৃষি খামার-বহির্ভূত ভিন্ন কোনো সূত্রের আয় কৃষি খামারের আয়ের সঙ্গে যোগ করে তাঁরা

জীবনযাত্রাকে কিছুটা মসৃণ করার চেষ্টা করেন। ক্ষেত্রবিশেষে খামার-বহির্ভূত আয় কিংবা শিল্পশ্রমিক হিসেবে অর্জিত আয় তিলে তিলে সঞ্চয় করে তাঁরা কিছুটা জমিও কিনতে পারেন। একজন খাঁটি প্রলেতারিয়েত হন doubly free। তাঁদের কোনো রকম জমিজমা থাকে না বলে তাঁরা হন জমির বন্ধনমুক্ত (free from encumbrances of land)। অন্যদিকে তাঁরা যেকোনো মালিকের অধীনে কাজ করার স্বাধীনতাও ভোগ করেন। এ অবস্থা একটি সমাজে তখনই সৃষ্টি হয়, যখন proletarianization প্রক্রিয়া গভীর হয় এবং শিল্পায়নও অনেক দূর এগিয়ে যায়। এ রকম অবস্থা তৃতীয় বিশ্বের হাতে গোনা দু-একটি দেশ ছাড়া আর কোথাও সৃষ্টি হয়নি। ফলে শ্রেণিগুলো মিশ্র সত্তা নিয়ে বিরাজ করে। শ্রেণিসংগ্রাম গড়ে তোলার ক্ষেত্রে খুঁজে নিতে হয়, কোন সত্তাটি প্রধান।

মাও সে-তুং (১৯৬৫) মোটা দাগে চীনা সমাজের একটি শ্রেণি বিশ্লেষণ করেছিলেন। তাঁর লেখা 'An Analysis of Classes in Chinese Society' প্রবন্ধটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁর এই প্রবন্ধ অনুসরণ করে সিরাজ শিকদার তৎকালীন পূর্ব বাংলার শ্রেণি বিশ্লেষণ করেছিলেন। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান এবং পরবর্তীতে বাংলাদেশে অন্য যেসব কমিউনিস্ট দল ও উপদলের কথা আমরা জানি, তাদের তরফ থেকে সুনির্দিষ্ট শ্রেণি বিশ্লেষণের রূপরেখা উপস্থাপন করতে দেখা যায়নি। তবে রাজনৈতিক বিশ্লেষণের ফাঁকে ফাঁকে বিভিন্ন শ্রেণির ভূমিকা ও চরিত্র সম্পর্কে মন্তব্য করা হয়েছে। লেনিন (১৯৭৭) রুশ সমাজে পুঁজিবাদের উদ্ভব সম্পর্কে *Development of Capitalism in Russia* নামে একটি বড় গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থটি তাত্ত্বিক ও তাথ্যিক দিক থেকে খুবই সমৃদ্ধ। এ গ্রন্থে তিনি প্রচুর পরিসংখ্যানের ব্যবহার করেছেন। কোন ধরনের সম্পর্ককে পুঁজিবাদী সম্পর্ক আর কোন ধরনের সম্পর্ককে প্রাক্-পুঁজিবাদী সম্পর্ক বলা যায়, তার একটি বিজ্ঞানভিত্তিক সংজ্ঞা নির্ণয়ের চেষ্টাও তিনি করেছেন। বিভিন্ন বিবেচনায় গ্রন্থটি একটি ক্ল্যাসিক গ্রন্থ। কাউৎস্কি (১৮৯৮) ঊনবিংশ শতাব্দীর একেবারে শেষ ভাগে জার্মানির কৃষিতে যে রূপান্তর ঘটেছিল, তার ওপর *Die Agrarfage* বা *The Agrarian Question* নামক একটি ক্ল্যাসিক গ্রন্থ রচনা করেন। মার্ক্সবাদের ইতিহাসে কাউৎস্কির অবস্থান শেষ পর্যন্ত যা-ই হোক না কেন, কাউৎস্কির এই গ্রন্থ কৃষির রূপান্তর বোঝার ক্ষেত্রে আজও মার্ক্সবাদীদের জন্য একটি অনন্য গ্রন্থ।

ষাটের দশকের প্রথমার্ধে আবদুল মতিন, আলাউদ্দিন, আবদুস সামাদ ও হাসান আলী মোল্লা প্রধানত Theoretical Inference-এর মাধ্যমে বলতে চেয়েছিলেন, বাংলার কৃষিতে ধনতন্ত্রের বিকাশ হয়েছে। তাঁরা কিছু পরিসংখ্যানও ব্যবহার করেছিলেন। তত্ত্বের ক্ষেত্রে দুর্বলতা থাকায় তাঁদের বিশ্লেষণ বিভ্রান্তিকর হয়েছিল। তাঁদের লেখা পুস্তিকাগুলো এখন আর পাওয়া যায় না। কমিউনিস্ট আন্দোলনের

ইতিহাসে এগুলো উল্লেখযোগ্য বিষয় হিসেবে বিবেচিত হওয়ার দাবি রাখে। প্রায় একই সময়ে জিতেন ঘোষ লিখলেন আরেকটি পুস্তিকা। পুস্তিকাটির নাম ছিল *পূর্ব বাংলা আধা উপনিবেশিক আধা সামন্ততান্ত্রিক*। পুস্তিকাটি খুব বড় না হলেও এর তত্ত্বগত অবস্থান ছিল বাস্তবতার কাছাকাছি। ১৯৬৮ সালের সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে মতিন, আলাউদ্দিনরা সিরাজগঞ্জের গ্রামে প্রশ্নমালাভিত্তিক এক জরিপ চালান। এই জরিপে মনিরুজ্জামান তারা খুবই সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। আমি তাঁদের এই জরিপ নিয়ে কাজ করতে দেখেছি। তখন আমার ওপর পাঁচপাত্তু হত্যা মামলার হুলিয়া ঝুলছিল। জরিপের ভিত্তিতে তাঁরা সিদ্ধান্তে এলেন, গ্রামীণ সমাজে সামন্ত-সম্পর্কই প্রধান এবং সেই থেকে শেষ পর্যন্ত তাঁরা পূর্ব বাংলার সমাজে সামন্তবাদ প্রধান দ্বন্দ্ব হিসেবে নিরূপণ করেছিলেন।

শ্রেণি প্রশ্নটি সমাজ রূপান্তরের আন্দোলনে (জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব, জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব ও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব) একটি কেন্দ্রীয় প্রশ্ন। সঠিকভাবে শ্রেণি বিশ্লেষণ করতে না পারলে বোঝা যায় না, কে শত্রু কে মিত্র। বোঝা যায় না, বিপ্লবের স্তর কী; সমাজের মৌলিক দ্বন্দ্বগুলো কী কী এবং এর মধ্যে প্রধান দ্বন্দ্ব কোনটি; কোন যুক্তিতে একটি সুনির্দিষ্ট দ্বন্দ্বকে প্রধান দ্বন্দ্ব বলা যায়।

রাষ্ট্র প্রশ্ন

মার্ক্সবাদী চিন্তাধারায় রাষ্ট্রের ধারণাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রাষ্ট্রও একধরনের প্রতিষ্ঠান। তবে রাষ্ট্রের একক বৈশিষ্ট্য হলো শ্রেণির আধিপত্য এবং শোষণ বজায় রাখা ও রক্ষা করা। *কমিউনিস্ট মেনিফেস্টো* পুস্তিকায় মার্ক্স ও এঙ্গেলস লিখেছেন, 'The expansive of the modern state is but a committee for managing the common affairs of the bourgeoisie.'

মার্ক্স কখনো রাষ্ট্রের ধারাবাহিক বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেননি। তাঁর দীর্ঘ 'Critique of Hegel's Philosophy of the State'(1844) রচনায় রাষ্ট্র সম্পর্কে তিনি আলোকপাত করার চেষ্টা করেছেন। পরবর্তীকালের বিভিন্ন লেখায় বিষয়টি এসেছে। যেমন *Class Struggles* (1850), *18th Brumaire* (1852) ও *Civil War in France* (1871)। এঙ্গেলসও তাঁর লেখায় তাঁর রাষ্ট্রভাবনা প্রকাশ করেছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ '*Anti-Duhring*' (1878) ও '*Origin of the Family*' (1894)।

বলশেভিক বিপ্লবের পূর্বমুহূর্তে লেনিন (১৯৬৪) লিখেছিলেন, *The State and Revolution* শীর্ষক একটি পুস্তিকা। এতে তিনি মার্ক্সবাদী রাষ্ট্রতত্ত্বের মূল কথাগুলো পুনর্ব্যক্ত করেন। পুস্তিকাটি লেখা হয়েছিল দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে। মার্ক্সবাদী ঐতিহ্যে যাঁরা লেখালেখি করেছেন, তাঁরাও রাষ্ট্রের বিষয়টি নিয়ে তাঁদের দৃষ্টিপাত করেছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ অস্ট্রো-মার্ক্সবাদী স্কুলের ম্যাক্স অ্যডলার ও অটো

বাওয়ার এবং অবশ্যই আন্তোনিও গ্রামসি। তবে ষাটের দশক থেকে মার্ক্সবাদী তত্ত্বে রাষ্ট্র একটি প্রধান বিষয় হয়ে দাঁড়ায় এবং এর ওপর অনুসন্ধান ও বিতর্ক গভীর হয়।

হেগেল তাঁর *The Philosophy of Right* গ্রন্থে দেখাতে চেয়েছেন যে রাষ্ট্র সমাজের সব ধরনের স্বার্থকে ধারণ করে। রাষ্ট্র সুনির্দিষ্ট স্বার্থ-গোষ্ঠীর পক্ষ হয়ে কাজ করে না। এর ফলে সিভিল সোসাইটি ও রাষ্ট্রের মধ্যে কোনো বিভাজন থাকে না। বিভাজন থাকে না ব্যক্তিসত্তা ও নাগরিকসত্তার মধ্যে। হেগেলের এই ধারণাকে মার্ক্স তাঁর Critique-এ বাতিল করে দিয়েছেন। এখানে তিনি যুক্তি দিলেন যে বাস্তব জীবনে রাষ্ট্র সর্বসাধারণের স্বার্থকে ধারণ করে না। রাষ্ট্র সম্পত্তির স্বার্থকে ধারণ করে। এই সমস্যা সমাধানের জন্য তিনি গণতন্ত্র অর্জনের প্রয়োজনীয়তার কথা বললেন। কিন্তু খুব দ্রুতই তিনি তাঁর চিন্তাভাবনায় পরিবর্তন আনেন। তিনি বলতে চাইলেন, রাজনৈতিক মুক্তি এককভাবে মানবিক মুক্তি আনতে পারে না। মানবিক মুক্তির জন্য প্রয়োজন সমাজকে পুনর্গঠিত করা। এর প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ব্যক্তিগত সম্পত্তির উচ্ছেদ। সার্বিকভাবে বলতে গেলে বলতে হয়, মার্ক্স ও এঙ্গেলসের দৃষ্টিতে রাষ্ট্র হলো শাসকশ্রেণির হাতিয়ার। শাসকশ্রেণি উৎপাদনের উপায়গুলোর মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণের দ্বারা তাদের স্বার্থকে রক্ষা করে। এ বিষয়ে মার্ক্স ও এঙ্গেলসের চিন্তাভাবনার কোনো ব্যতিক্রম লক্ষ করা যায়নি। এঙ্গেলস তাঁর সর্বশেষ লেখা বইটিতে বলেছেন, 'As a rule, state of the most powerful, economically dominant class, which through the medium of the state, becomes also the politically dominant class, and thus acquires new means of holding down and exploiting the oppressed class.' (*Origin of the Family*, Ch. 9)।

এখানে প্রশ্ন দাঁড়ায়, অর্থনৈতিকভাবে অধিপতিশ্রেণি বা শ্রেণিগুলো থেকে পৃথক থেকেও রাষ্ট্র কীভাবে এই ভূমিকাটি পালন করে। এ ক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে পুঁজিবাদী সমাজে রাষ্ট্র ও অর্থনৈতিক শক্তিসমূহের মধ্যে দূরত্ব বেশ স্পষ্ট। এর জবাব হিসেবে বলা যায় অধিপতি শ্রেণি কিছু আদর্শগত ও রাজনৈতিক বিষয়ের ওপর নির্ভরশীল। এগুলোকে অধিপতিশ্রেণি রাষ্ট্র ও সমাজের ওপর চাপ হিসেবে ব্যবহার করে। এভাবে রাষ্ট্রের কর্মকর্তাদের সঙ্গে অধিপতিশ্রেণির স্বার্থের সম্মিলন ঘটে। দ্বিতীয় ব্যাখ্যাটি হলো, পুঁজিবাদী সমাজে রাষ্ট্র কিছু কাঠামোগত বাধার মধ্যে আবদ্ধ থাকে। এই কাঠামোগত বাধাই নিশ্চিত করে যে ব্যক্তি হিসেবে রাষ্ট্রের কুশীলবদের মতাদর্শ যা-ই হোক না কেন, রাষ্ট্রের নীতি নির্ধারণ হয় পুঁজির সঞ্চয়ন ও পুনরুৎপাদনের স্বার্থে। প্রথমোক্ত ব্যাখ্যায় প্রতিভাত হয় যে রাষ্ট্র হলো 'পুঁজিপতিদের রাষ্ট্র'। দ্বিতীয় ব্যাখ্যা অনুযায়ী রাষ্ট্র 'পুঁজির রাষ্ট্র'।

উপর্যুক্তভাবে দেখা হলে পুরোপুরিভাবে দেখা হয় না। মার্ক্স-এঙ্গেলসের দৃষ্টি অনুযায়ী রাষ্ট্রের বেশ খানিকটা স্বায়ত্তশাসন থাকে। সরকার যদি একনায়কত্ববাদী

হয়, যেমন লুই নেপোলিয়ন বোনাপার্ট ১৮৫২ সালে অভ্যুত্থান করে যে ধরনের বোনাপার্টিস্ট সরকার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তার ফলে *18th Brumaire*-এ মার্ক্স বলেছিলেন, এই অভ্যুত্থান, 'Escaped the despotism of a class only to call back beneath the despotism of an individual, and indeed, beneath the authority of an individual without authority.' ফলে সমাজের সব শ্রেণি নতজানু হয়ে পড়ে। সবাই হয়ে যায় নির্বাক ও অক্ষম। বন্দুকের কুঁদোর বিরুদ্ধে কারোর কিছু করার থাকে না। *The Civil War in France* গ্রন্থে মার্ক্স আরও ২০ বছর পর বললেন, এ ধরনের সরকার তখনই হয়, যখন বুর্জোয়ারা পরাস্ত হয়ে পড়ে, কিন্তু শ্রমিকশ্রেণি জাতির ওপর শাসন প্রতিষ্ঠা করার যোগ্যতা অর্জন করতে পারে না। প্রশ্ন ওঠে, বাংলাদেশে বারবার স্বৈরতান্ত্রিক সরকার কি বুর্জোয়াদের ব্যর্থতা? এর পাশাপাশি শ্রমিকশ্রেণির যোগ্যতা অর্জনের অক্ষমতাকেও নির্দেশ করে কি না। এঙ্গেলসের বিখ্যাত গ্রন্থ *Origin of the Family*-তে বলা হয়েছে, 'by way of exception, periods occur in which the waring classes balance each other so nearly that the state power, as ostensible mediator, acquires for the moment, a certain degree of independence of the both. (Ch. 9)

সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্র, নেপোলিয়ন-১-এর সরকার ও নেপোলিয়ন-৩-এর সরকারের সময় এমন পরিস্থিতি বিরাজ করছিল। জার্মানিতে বিসমার্কের সময়ও একই ধরনের পরিস্থিতি ছিল। বিসমার্কের সময় জার্মানির পরিস্থিতি তুলে ধরতে গিয়ে এঙ্গেলস বলেছেন, পুঁজিপতি ও শ্রমিকশ্রেণির অবস্থান ছিল সমানে সমান। উভয় পক্ষই প্রুশীয় অন্তঃসারহীন এবং ক্ষয়িষ্ণু Junker-দের স্বার্থে প্রতারিত হয়েছে।

State and Revolution গ্রন্থে এবং অন্যান্য লেখায় লেনিনের অন্যতম লক্ষ্য ছিল সংশোধনবাদী চিন্তাধারাকে নস্যাৎ করা। সংশোধনবাদী চিন্তাধারা অনুযায়ী বুর্জোয়া রাষ্ট্রকে সংস্কার করার তত্ত্ব হাজির করা হয়েছিল। লেনিন দ্ব্যর্থহীনভাবে বলেছিলেন, সংস্কারে কোনো কাজ হবে না। শোষণমূলক ও অত্যাচারী রাষ্ট্রযন্ত্রকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিতে হবে। অতীত ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, সব বিপ্লবই এই যন্ত্রকে আরও শাণিত করেছে, ভেঙে গুঁড়িয়ে দেয়নি। প্যারি কমিউনের সময় মার্ক্স একই বক্তব্য হাজির করেছিলেন এবং বলেছিলেন, পরবর্তীকালে ফরাসি বিপ্লবের লক্ষ্য হবে আমলাতান্ত্রিক সামরিক যন্ত্রটিকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া, এক শ্রেণির হাত থেকে অন্য শ্রেণির হাতে তুলে দেওয়া নয়। প্রতিটি গণবিপ্লবের লক্ষ্য সেটাই হওয়া উচিত। পরিবর্তিত রাষ্ট্রে হবে শ্রমিকশ্রেণির একনায়কত্ব। এটা একটা বিশাল কাজ। লেনিনের ভাষায়, 'A giagantic replacement of certain institutions by other institutions of fundamentally different type……instead of this special institution of a

privileged minority (the privileged officialdom, the chiefs of the standing army) the majority itself can directly fulfill all these functions, and the more the functions of state power are performed by the people as a whole, the less need there is for the existence of this power.' (*State and Revolution*, CW- 25, pp 419-420).

শ্রমিকশ্রেণির নেতৃত্বে সমাজ পরিবর্তনের বিপ্লবে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের মাধ্যমে পুরাতন রাষ্ট্রযন্ত্রটিকে ও এর সমুদয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিতে হয়। বাংলাদেশসহ উপমহাদেশের বামপন্থী, বিশেষ করে কমিউনিস্ট আন্দোলনে রাষ্ট্র প্রশ্নটি স্পষ্টভাবে সামনে আসেনি, যেভাবে এসেছিল সোভিয়েত বিপ্লবে 'সোভিয়েত পাওয়ার'-এর মাধ্যমে এবং চীনে এসেছিল 'রেড পাওয়ার'-এর মাধ্যমে। রাষ্ট্রক্ষমতার ব্যাপারটি বুঝতে না পারলে কিছু বোঝা হয় না। একবিংশ শতাব্দীর নতুন যুগে রাষ্ট্রের চরিত্র আগের মতোই প্রতিক্রিয়াশীল রয়ে গেছে। কিন্তু সমাজ ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে প্রযুক্তিগত অগ্রগতির ফলে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল ও পুরাতন রাষ্ট্রযন্ত্র ধ্বংস করার বিষয়টি অনেক বেশি সৃজনশীলতা দাবি করে। যাঁরা এখন সমাজ পরিবর্তন নিয়ে কাজ করেন, তাঁদের বাস্তব অবস্থার প্রকৃত বিশ্লেষণ করে নতুনভাবে করণীয় নির্ধারণ করতে হবে।

জাতি প্রশ্ন

জাতি প্রশ্নটি কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের জন্য খুবই স্পর্শকাতর প্রশ্ন। এই প্রশ্নের সঠিক মীমাংসা করতে না পারলে বিপ্লবী আন্দোলন ব্যর্থ হয়ে যেতে পারে এবং পার্টি হিসেবে কমিউনিস্ট পার্টি বহুদিনের জন্য পিছিয়ে পড়তে পারে, সাংগঠনিকভাবে বড় রকমের আঘাতের মুখে পড়তে হতে পারে। জাতি প্রশ্নটি টানা দড়ির ওপর হেঁটে যাওয়ার মতোই কঠিন।

লেনিন

লেনিন জাতীয় ও ঔপনিবেশিক প্রশ্নে তিনটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন (পিকিং, ১৯৬৭)। এই প্রবন্ধ ৩টি *Lenin On National and Colonial Questions* শিরোনামে Foreign Languages Press থেকে প্রকাশিত হয়েছে। ২৬ জুলাই ১৯২০ লেনিন The Report of The Commission on National and Colonial Questions শিরোনামে কমিন্টার্নে তাঁর রিপোর্ট পেশ করেন। এই কমিশনের সচিব ছিলেন কমরেড ম্যারিং। এই কমিশনে অপর একটি সম্পূরক থিসিস হাজির করেছিলেন কমরেড এম এন রায়। কমিশন সর্বসম্মতভাবে সংশোধিত প্রাথমিক থিসিস ও সম্পূরক থিসিস অনুমোদন করে।

প্রথম গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হলো, নিপীড়িত ও নিপীড়ক জাতিগুলোর মধ্যে পার্থক্য বিচারের প্রশ্ন। এ প্রশ্নে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক ও বুর্জোয়া গণতন্ত্রের সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থান সম্পর্কে রিপোর্টে মত ব্যক্ত করা হয়েছে। সাম্রাজ্যবাদের যুগে এটা সুনির্দিষ্টভাবে প্রলেতারিয়েত ও কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। তাদেরকে সুনির্দিষ্ট অর্থনৈতিক তথ্যের ভিত্তিতে তাদের অবস্থান নির্ণয় করতে হবে। সব ধরনের ঔপনিবেশিক ও জাতীয় প্রশ্নের সমাধানের জন্য বিমূর্ত ধারণার ওপর নির্ভর না করে প্রকৃষ্ট বাস্তবতার ওপর নির্ভর করতে হবে।

১৯২০ সালের বিশ্ব পরিস্থিতিতে নিপীড়ক জাতির সংখ্যা ছিল হাতে গোনা কয়েকটি, কিন্তু নিপীড়িত জাতির সংখ্যা ছিল বহু। নিপীড়ক জাতিগুলোর মালিকানায় ছিল বিশাল সম্পদভান্ডার ও শক্তিশালী সামরিক বাহিনী। বিশ্বের ৭০ শতাংশ জনগোষ্ঠী তখন ছিল নিপীড়িত দেশের বাসিন্দা। নিপীড়িত দেশগুলো দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। প্রথম ভাগে ছিল সরাসরি উপনিবেশ এবং দ্বিতীয় ভাগে ছিল আধা উপনিবেশ, যেমন পারস্য, তুরস্ক ও চীন। এই সব দেশ বৃহৎ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সামরিক আগ্রাসনের মুখে পরাজয় বরণ করে, এমন সব চুক্তিতে উপনীত হতে বাধ্য হয়, যার ফলে দেশগুলো বৃহৎ সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোর ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। বিশ্বের জাতিগুলোকে নিপীড়ক ও নিপীড়িত জাতি হিসেবে আলাদা করে দেখার বিষয়টি লেনিনের স্বাক্ষরে প্রথম থিসিসে যেমন ছিল, তেমনি ছিল কমরেড রায়ের থিসিসে। রায়ের থিসিসটি ভারতসহ অন্য যেসব দেশ ব্রিটেনের দ্বারা নিপীড়িত, সে অবস্থান থেকে রচনা করা হয়। সে জন্যই এটি বিশেষ গুরুত্বের দাবি রাখে।

রিপোর্টে তখনকার বিশ্ব পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করে বলা হয়, মুষ্টিমেয়সংখ্যক সাম্রাজ্যবাদী জাতি সোভিয়েত আন্দোলন ও সোভিয়েত রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল। এই বিষয় এড়িয়ে গিয়ে জাতীয় ও ঔপনিবেশিক প্রশ্ন সঠিকভাবে বোঝা যাবে না। উন্নত অথবা অনুন্নত দেশনির্বিশেষে কমিউনিস্ট পার্টিগুলোকে সঠিকভাবে এই রাজনৈতিক প্রশ্নের উপস্থাপন ও সমাধান করতে হবে।

টানা দড়ির ওপর দিয়ে হাঁটা

শুরুতে টানা দড়ির ওপর দিয়ে হাঁটার সমস্যা সম্পর্কে বলেছিলাম। টানা দড়ির প্রশ্নটি কেন উঠছে? আজকের বিশ্ব পরিস্থিতি ১৯২০ সালের বিশ্ব পরিস্থিতির মতো নয়। বর্তমান বিশ্বে সরাসরি উপনিবেশ নেই বললেই চলে। তবে নিঃসন্দেহে অধিকাংশ নিপীড়িত জাতি আধা উপনিবেশের পর্যায়ে পড়ে। বিশ্বায়নের ফলে সাম্রাজ্যবাদ এখন নব্য উদারনীতিবাদের তত্ত্বের আড়ালে নিপীড়িত জাতিগুলোর বাজার ও সম্পদ দখল করে আছে। এই কাঠামোকে রক্ষা করার জন্য তারা বিশ্বব্যাংক, আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল ও বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার ওপর নির্ভর করছে। আপাতদৃষ্টিতে সাম্রাজ্যবাদী

দেশগুলোর ভূমিকা ক্ষতিকর মনে না হলেও এর সুদূরপ্রসারী প্রতিক্রিয়া বিদ্যমান। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জাতীয় নিরাপত্তা রাষ্ট্রের তত্ত্ব ব্যবহার করে পৃথিবীর যত্রতত্র সামরিক আক্রমণ ও অভিযান চালাচ্ছে। এসবের যৌক্তিকতা হিসেবে 'সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে অনন্ত যুদ্ধে'র ঢাল ব্যবহার করা হচ্ছে। কোন দেশ সাম্রাজ্যবাদী আর কোন দেশ সাম্রাজ্যবাদী নয়, তা নিয়েও মতভেদ রয়েছে। আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের আদর্শগত দ্বন্দ্বের একপর্যায়ে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি সোভিয়েত ইউনিয়নকে 'সামাজিক সাম্রাজ্যবাদী' হিসেবে চিহ্নিত করেছিল। সোভিয়েত ইউনিয়ন তার বলয়ভুক্ত দেশগুলোতে উপনিবেশবাদী শোষণ চালাত বলে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়েছিল। এসব অভিযোগের পেছনে অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছিল। যেমন সোভিয়েত ইউনিয়ন মেষপালকদের দেশ মঙ্গোলিয়া থেকে ভেড়ার পশম আমদানি করে পশমি বস্ত্র তৈরি করার পর সেগুলো আবার মঙ্গোলিয়াতেই রপ্তানি করত। সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ বলতে বোঝায়, মুখে সমাজতন্ত্রের বুলি কিন্তু কার্যত সাম্রাজ্যবাদী আচরণ। এখন গণচীন সম্পর্কেও সমালোচকেরা বলতে চাইছেন, চীন পুঁজিবাদের পথ গ্রহণ করেছে। অথচ চীনের দাবি হলো, চীন 'চীনা বৈশিষ্ট্যের সমাজতন্ত্র' অনুসরণ করছে। এই তত্ত্বের মূল নির্যাস হলো, বৈষয়িক ব্যবস্থার অগ্রগতি সাধন না করে সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন সম্পর্ক নির্ভেজালভাবে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। ষাটের দশকে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে তারা চার বৃহৎ আধুনিকায়নের প্রকল্প বাস্তবায়ন করবে। এগুলোর মধ্যে ছিল কৃষির আধুনিকায়ন, শিল্পের আধুনিকায়ন, প্রযুক্তির আধুনিকায়ন ও দেশ রক্ষার আধুনিকায়ন। কিন্তু বিতর্ক থেকে যায়, এগুলো কী প্রক্রিয়ায় এবং কোন ধরনের নীতি অনুসরণ করে বাস্তবায়ন করা হবে। সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সময় পুঁজিবাদের অনুগামীদের বিরুদ্ধে জিহাদ পরিচালনা করা হয়। এর ফলে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির অনেক ত্যাগী ও পোড় খাওয়া নেতা-ক্যাডাররা চরম হেনস্তা ও নির্যাতনের শিকার হন। এসব সত্ত্বেও তাঁরা কেউ কমিউনিজমের বিরোধী হয়ে পড়েছিলেন, এমনটা শোনা যায় না। কাজেই সাচ্চা সমাজতান্ত্রিক দেশ কোনটি, তা নিয়ে বিভ্রান্তির বেড়াজাল রয়ে গেছে।

যে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের বর্শাফলক সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে নিক্ষিপ্ত হয় না, তাকে খাঁটি জাতীয় মুক্তির সংগ্রাম বলা যায় না। লেনিন ১৯২০ সালে কমিন্টার্নের থিসিসে সোভিয়েত রাষ্ট্রবিরোধী প্রয়াসগুলোকে প্রতিক্রিয়াশীল হিসেবে বিবেচনা করেছেন। আধুনিক বুর্জোয়া আন্তর্জাতিক সম্পর্কের সাহিত্যে এ অবস্থানকে নিছক রাষ্ট্রের ভূরাজনৈতিক কৌশল হিসেবেই দেখা হয়। ভিয়েতনাম যুদ্ধের সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভিয়েতনাম ও লাওসে বসবাসরত মিও গোত্র গোষ্ঠীগুলোকে ভিয়েতনামের মূল মুক্তিসংগ্রামীদের বিরুদ্ধে অস্ত্রশস্ত্র ও রসদ জুগিয়ে ভিয়েতনামের মুক্তিযুদ্ধবিরোধী প্রতিপক্ষ হিসেবে দাঁড় করানোর চেষ্টা করেছিল। যদি ধরে নেওয়া হয়, মিওরা একটি

নিপীড়িত গোষ্ঠী, সুতরাং তাদের সংগ্রাম সমর্থনযোগ্য, ব্যাপারটা আসলে সে রকম কিছু নয়। মিওরা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের ক্রীড়নক হিসেবেই কাজ করছিল। লেনিনীয় তত্ত্বে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামকে অবশ্যই সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ভূমিকায় থাকতে হবে। কেবল এ ধরনের জাতীয় মুক্তিসংগ্রামই শেষ পর্যন্ত একটি পুঁজিবাদবিরোধী ও সমাজতন্ত্রমুখী সমাজ গঠনের দিকে এগিয়ে যেতে পারে।

সাম্রাজ্যবাদ ছাড়াও রাষ্ট্রতত্ত্বে আরও দুটি বৈশিষ্ট্য যোগ হয়েছে। এগুলো হলো আধিপত্যবাদ ও সম্প্রসারণবাদ। আধিপত্যবাদী ও সম্প্রসারণবাদী রাষ্ট্রগুলো শেষ বিচারে সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধে। লেনিন যেভাবে প্রথম মহাযুদ্ধ-পরবর্তী বিশ্ব পরিসরে আধা ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছেন, সেই আধা উপনিবেশগুলো নিপীড়নকারী রাষ্ট্রের আক্রমণের মুখে শান্তি-সন্ধি করতে গিয়ে স্বাধীন ও সার্বভৌম সত্তা হারিয়ে আধা উপনিবেশে পরিণত হয়েছিল, সে রকম আধা উপনিবেশের দৃষ্টান্ত পরবর্তীকালের পৃথিবীতে খুব কম নয়। আধা উপনিবেশ পরিস্থিতি মুক্তিসংগ্রামে সহায়তা করার নামেও তৈরি হতে পারে।

অনগ্রসর দেশে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব

লেনিন তৃতীয় যে বিষয়ের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন, সেটা ছিল অনগ্রসর দেশে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রশ্ন। এই প্রশ্নে কমিন্টার্নের মধ্যে কিছু মতপার্থক্য সৃষ্টি হয়। সেখানে যে বিতর্কের সূচনা হয়, তার মূলে ছিল নীতি ও তত্ত্ব হিসেবে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক ও কমিউনিস্ট পার্টিগুলো অনগ্রসর দেশে অবশ্যই বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক আন্দোলন সমর্থন করবে কি না। এই বিতর্কের সমাধান করতে গিয়ে বুর্জোয়া গণতন্ত্রের আন্দোলনের স্থলে জাতীয় বিপ্লবী আন্দোলনের ধারণা ব্যবহার করার পক্ষে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হয়। এ ব্যাপারে ন্যূনতম কোনো সন্দেহ নেই যে প্রতিটি জাতীয় আন্দোলন কেবল বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক আন্দোলনই হতে পারে। অনগ্রসর দেশে জনগোষ্ঠীর প্রধান অংশ হলো কৃষক, যাঁরা বুর্জোয়া পুঁজিবাদী সম্পর্কের প্রতিনিধিত্ব করেন। এসব দেশে প্রলেতারীয় পার্টি গড়ে উঠলেও তাদের পক্ষে কৃষক আন্দোলনের সঙ্গে সুনির্দিষ্ট সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা না করে কমিউনিস্ট কৌশল ও কমিউনিস্ট নীতি অনুসরণ করা সম্ভব হবে না। এ প্রশ্নে আপত্তি উঠল যে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক আন্দোলনের কথা বললে বিপ্লবী আন্দোলন ও সংস্কারবাদী আন্দোলনের মধ্যে পার্থক্য ঘুচে যাবে। অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, অনগ্রসর ও ঔপনিবেশিক দেশসমূহের সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়ারা নিপীড়িত জাতিগুলোর মধ্যে সংস্কারবাদী বুর্জোয়াদের প্রতিষ্ঠা করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করছে। নিপীড়িত দেশগুলোর বুর্জোয়ারা জাতীয় আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করলেও তারা সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়াদের সঙ্গে যোগসাজশ করে সব বিপ্লবী আন্দোলন ও বিপ্লবী শ্রেণিগুলোকে প্রতিহত করার

চেষ্টা করছে। এ ব্যাপারে কমিশনের কাছে দ্ব্যর্থহীনভাবে স্পষ্ট হয়েছে যে সঠিক কাজটি হবে সংস্কারবাদী ও বিপ্লবী বুর্জোয়া আন্দোলনের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করা। এ কারণেই 'বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক' পরিভাষাটির জায়গায় 'জাতীয় বিপ্লবী' পরিভাষাটি ব্যবহার করা হয়েছে। কমিউনিস্টরা উপনিবেশগুলোতে খাঁটি বুর্জোয়া মুক্তি আন্দোলন সমর্থন করবেন, তবে শর্ত থাকে যে বিপুলসংখ্যক কৃষক ও শোষিত মানুষকে সংগঠিত করার পথে তাঁরা বাধা হয়ে দাঁড়াবেন না। এ শর্ত পূরণ না হলে এসব দেশে কমিউনিস্টরা অবশ্যই সংস্কারবাদী বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে লড়াই করবেন। দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের বহু নামকরা নেতা বুর্জোয়া সংস্কারবাদী আন্দোলনের পক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন। ঔপনিবেশিক দেশে সংস্কারবাদী দল রয়েছে এবং ক্ষেত্রবিশেষে তাদের মুখপাত্ররা তাদেরকে সামাজিক গণতন্ত্রী ও সমাজতন্ত্রবাদী বলে দাবি করেন। এসব চুলচেরা বিশ্লেষণের পর লেনিন মনে করেছেন যে তাঁদের দৃষ্টিকোণ সুস্পষ্টভাবেই চয়ন করা হয়েছে।

প্রাক্-ধনবাদী সমাজে কমিউনিস্ট কৌশল

লেনিন তাঁর National and Colonial Questions-সম্পর্কিত রিপোর্টের ওপর আলোচনা করতে গিয়ে 'কৃষক সোভিয়েতের' ওপর কিছু মন্তব্য করা যৌক্তিক মনে করেছেন। সাবেক জারদের উপনিবেশে রুশ কমিউনিস্টরা কাজ করতে গিয়ে কিছু বাস্তব পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছিলেন। তুর্কিস্তানের মতো অনগ্রসর দেশগুলোতে যে প্রশ্নের মোকাবিলা করতে হয়েছে, তা হলো প্রাক্-ধনবাদী অবস্থায় কী করে কমিউনিস্ট কৌশল ও নীতি প্রয়োগ করতে হবে। এসব দেশের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো প্রাক্-ধনবাদী সম্পর্কের অবস্থান। সুতরাং খাঁটি প্রলেতারীয় আন্দোলন এসব দেশে সম্ভব নয়। এসব দেশে বস্তুত কোনো শিল্পশ্রমিকের অস্তিত্ব নেই। এতৎসত্ত্বেও এসব দেশে কমিউনিস্টরা নেতৃত্বের ভূমিকা গ্রহণ করেন এবং তা পালনও করেন। বাস্তব অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, কাজ করতে গিয়ে কমিউনিস্টরা প্রবল বাধার সম্মুখীন হন এবং এসব বাধাকে অতিক্রমও করতে হয়। সর্বহারা বা শ্রমিকশ্রেণি না থাকা সত্ত্বেও এসব দেশের জনগণকে স্বাধীন রাজনৈতিক চিন্তা করতে ও স্বাধীন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত হতে উদ্বুদ্ধ করা সম্ভব। পশ্চিম ইউরোপের কমরেডদের তুলনায় রুশ কমরেডদের কাজ বেশ কঠিন। কারণ, রাশিয়ায় সর্বহারা শ্রেণিকে রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের কাজ করতে হচ্ছে। এটা বোধগম্য যে আধা সামন্ততান্ত্রিক নির্ভরশীলতার মধ্যে বাস করা সত্ত্বেও কৃষকেরা খুব চমৎকারভাবে সোভিয়েত সংগঠনের ধারণা আত্মস্থ করতে পারেন এবং বাস্তব অনুশীলনেও প্রয়োগ করতে পারেন। এটা স্পষ্ট যে নিপীড়িত জনগণ কেবল বাণিজ্যিক পুঁজির দ্বারা শোষিত নয়, উপরন্তু তারা সামন্তবাদীদের দ্বারাও শোষিত। সামন্তবাদভিত্তিক রাষ্ট্র সোভিয়েত সংগঠনের অস্ত্রটিও ব্যবহার করতে পারে। সোভিয়েত সংগঠনের

ধারণাটি খুব সহজ-সরল। এটা যে কেবল প্রলেতারীয় সম্পর্কে ব্যবহার হয়, তা নয়, কৃষক সামন্ত ও আধা সামন্ততান্ত্রিক সম্পর্কেও এই সংগঠন ব্যবহারযোগ্য। এ নিয়ে কমিন্টার্নে জোর বিতর্ক হয় এবং ঔপনিবেশিক দেশের কমরেডরা অকাট্যভাবে দেখাতে সক্ষম হয়েছেন যে কমিউনিষ্ট আন্তর্জাতিকের থিসিস স্পষ্টভাবে কৃষক সোভিয়েতের প্রতি নির্দেশ করবে এবং এই সোভিয়েতগুলো হবে শোষিতদের সোভিয়েত। এটা কেবল পুঁজিবাদী দেশগুলোর ক্ষেত্রেই প্রাসঙ্গিক নয়। প্রাক্-ধনবাদী সম্পর্কভিত্তিক দেশসমূহের ক্ষেত্রেও প্রাসঙ্গিক। কমিউনিষ্ট পার্টিগুলোর জন্য এবং যেসব ব্যক্তি কমিউনিষ্ট পার্টি প্রতিষ্ঠা করতে চান, তাঁদের কৃষক সোভিয়েতের পক্ষে অথবা মেহনতি মানুষের সোভিয়েতের পক্ষে প্রচারণা চালাতে হবে। এই প্রচারণা চালাতে হবে অনগ্রসর দেশ ও উপনিবেশগুলোতেও। সুযোগ পেলেই কালবিলম্ব না করে মেহনতি মানুষের সোভিয়েত গঠনের জন্য প্রচেষ্টা চালাতে হবে। এর ফলে বাস্তব কাজের ক্ষেত্রে কিছু উৎসাহব্যঞ্জক ক্ষেত্র সৃষ্টি হয়। ১৯২০ সালের প্রেক্ষাপটে এ-সংক্রান্ত অভিজ্ঞতা খুবই সীমিত। উন্নত দেশের প্রলেতারিয়েতদের উচিত অনগ্রসর দেশের মেহনতি মানুষকে সহায়তা প্রদান করা। অনগ্রসর দেশগুলো তখনই বিদ্যমান পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে, যখন সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রগুলোর বিজয়ী প্রলেতারিয়েতরা এসব জনগণের প্রতি সমর্থনের হাত বাড়িয়ে দিতে পারে এবং সমর্থন প্রদানের জন্যও তারা প্রস্তুত।

কমিউনিষ্ট আন্তর্জাতিকের বিতর্কে লেনিন স্বাক্ষরিত থিসিস এবং কমরেড রায়ের থিসিস নিয়ে প্রাণবন্ত বিতর্ক হয়। কমরেড রায়ের থিসিসটি ব্যাপকভাবে আলোচিত হয়। এ থিসিসের সপক্ষে বক্তব্য আসে এবং কতিপয় সংশোধনীসহ এটি সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয়।

পুঁজিবাদী উন্নয়ন স্তর এড়িয়ে সমাজতন্ত্র

প্রশ্ন ওঠে, পুঁজিবাদী উন্নয়নের স্তর অবশ্যম্ভাবী বলে অনগ্রসর দেশগুলোর জন্য মনে করা সঠিক কি না। প্রথম মহাযুদ্ধের পর বেশ কিছু অনগ্রসর জাতি মুক্তির পথে এগিয়ে গেছে। তাদের মধ্যে প্রগতির পথে অগ্রসর হওয়ার আন্দোলন লক্ষ করা যায়। উত্থাপিত প্রশ্নের জবাব হলো 'না'। যদি বিজয়ী প্রলেতারিয়েতরা তাদের মধ্যে ধারাবাহিকভাবে প্রচারণা চালায় এবং সোভিয়েত সরকার সব শক্তি দিয়ে তাদের সমর্থন প্রদান করে, তাহলে অনগ্রসর জনগণের জন্য পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক স্তর অবশ্যম্ভাবী মনে করা সঠিক নয়। সব উপনিবেশে এমন অনগ্রসর দেশগুলোতে কমিউনিস্টদের দায়িত্ব হবে স্বাধীন লড়াকু বাহিনী গড়ে তোলা, পার্টি সংগঠন গড়ে তোলা। কেবল জরুরি ভিত্তিতে কৃষক সোভিয়েতের পক্ষে প্রচার চালানো এবং প্রাক্-পুঁজিবাদী অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়াই যথেষ্ট নয়, কমিউনিষ্ট আন্তর্জাতিকের

উচিত তত্ত্বগতভাবে প্রমাণ করা যে অনগ্রসর দেশের প্রলেতারিয়েতদের সাহায্যে অগ্রসর দেশগুলো সোভিয়েত ব্যবস্থায় উত্তরণ ঘটাতে পারে এবং সুনির্দিষ্ট উন্নয়নের স্তরের মধ্য দিয়ে পুঁজিবাদী স্তর এড়িয়ে কমিউনিজমের পথে যেতে পারে।

উপর্যুক্ত লক্ষ্য অর্জনের জন্য পূর্বাহ্নে বলে দেওয়া সম্ভব নয়, কী কী উপায় অবলম্বন করতে হবে। বাস্তব অভিজ্ঞতাই উপায়গুলো বলে দেবে। তবে এটা সুনির্দিষ্টভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে সোভিয়েতের ধারণা মেহনতি মানুষের হৃদয়ের কাছাকাছি। খুব দূরবর্তী দেশেও এবং প্রাক্-পুঁজিবাদী অবস্থায় সোভিয়েত সংগঠনের জন্য কাজ করতে হবে। বিশ্বের সমস্ত কমিউনিস্ট পার্টিকে এর সব প্রান্তে এই লক্ষ্যে কাজ করতে হবে। দেখা যাচ্ছে, কমিন্টার্নের থিসিস অনুযায়ী জাতি প্রশ্নটিতে শেষ পর্যন্ত সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজমের উত্তরণের প্রশ্নের সঙ্গে যুক্ত ও অধীন করা হয়েছে। এভাবে জাতি প্রশ্নের সমাধান কেবল সাচ্চা কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বেই সম্ভব। ভিয়েতনামের নেতা হো চি মিন স্বপ্ন দেখতেন মুক্ত ভিয়েতনামের। ভিয়েতনামের স্বাধীনতা ও মুক্তির পথ খুঁজে বের করতে গিয়ে তিনি লেনিনবাদের প্রতি ঝুঁকে পড়েন এবং ভিয়েতনামের কমিউনিস্ট আন্দোলনের পুরোধায় পরিণত হন।

সাম্প্রতিক দশকগুলোর বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যাচ্ছে, পুঁজিবাদ না হলেও কিছু বা উল্লেখযোগ্য পুঁজিবাদী সম্পর্কের বিকাশ ছাড়া বিপ্লব-উত্তর দেশগুলোতে ক্ষমতাসীন কমিউনিস্ট দলগুলো জনগণের বৈষয়িক উন্নয়নের জন্য লেনিনের বা কমিন্টার্নের মূল থিসিসে অবিচল থাকতে পারছে না। ভিয়েতনাম ও লাওসে বাজার ও ব্যক্তি-পুঁজি বিনিয়োগকে গ্রহণযোগ্যতা প্রদান করা হয়েছে। কিউবা দীর্ঘদিন মার্কিন অবরোধের মধ্যে থেকেও বাজারব্যবস্থাকে এড়িয়ে চলার চেষ্টা করেছে। কিন্তু কিউবার মতো দেশও তাদের নীতিতে পরিবর্তন এনেছে। গণচীনের কথা বলাই বাহুল্য। আগেই বলেছি, গণচীন এখন চীনা বৈশিষ্ট্যের সমাজতন্ত্রের পথ ধরে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করছে।

জাতি প্রশ্নে মার্ক্স

জাতি প্রশ্নে মার্ক্স কোনো সুসংহত তত্ত্ব দিয়ে যাননি। জাতি প্রত্যয়টির কোনো যথার্থ সংজ্ঞা দিয়ে যাননি। এখানে প্রলেতারিয়েতের করণীয় সম্পর্কেও তিনি কোনো সাধারণ রাজনৈতিক কৌশলের কথা বলেননি। *কমিউনিস্ট মেনিফেস্টো* পুস্তিকায় সম্প্রদায় ও জাতি সম্পর্কে খুবই সংক্ষিপ্ত অনুচ্ছেদ রয়েছে। এ থেকে মার্ক্সের আপসহীন আন্তর্জাতিকতাবাদের দৃষ্টিভঙ্গি ফুটে উঠেছে। প্রলেতারিয়েতের কাজ হলো জাতিতে জাতিতে বিবাদ-বিসংবাদের অবসান ঘটানো। এসব বিবাদ-বিসংবাদের মূলে রয়েছে বুর্জোয়া শ্রেণির বিকাশ, মুক্ত বাণিজ্য ও বিশ্ববাজার। প্রায় কাছাকাছি সময়ে লেখা ভিন্ন লেখায় মার্ক্স জোর দিয়ে বলছেন, 'While the bourgeoisies of

each nation still retain separate national interest, big industry created a class, which in all nations has the same interest and with which nationality is dead.' (Marx, *The German Ideology*, Moscow 1964, p. 76)। এই উদ্ধৃতি থেকে বোঝা যায়, বৃহৎ শিল্পজাত বুর্জোয়া শেষ বিচারে জাতীয়তার মৃত্যু ঘটায়। বর্তমান বিশ্বায়নের যুগে বহুজাতিক করপোরেশনগুলোর নির্দিষ্ট কোনো জাতি বা রাষ্ট্র নেই। মার্ক্স আরও দেখিয়েছেন, বুর্জোয়ারা জাতিতে জাতিতে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে এবং তা বাড়িয়ে তোলে। কারণ, ক) বাজার নিয়ন্ত্রণের সংগ্রাম পুঁজিবাদী শক্তিগুলোর মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করে। খ) এক জাতি কর্তৃক অন্য জাতিকে শোষণ জাতীয় বিরোধের জন্ম দেয়। গ) বুর্জোয়ারা জাত্যভিমানের হাতিয়ার ব্যবহার করে প্রলেতারিয়েতের ওপর আধিপত্য বিস্তার করে।

মার্ক্স পুঁজিবাদী উৎপাদনব্যবস্থার দ্বারা অর্থনীতির আন্তর্জাতিকীকরণের ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। বিশ্ববাজারের আবির্ভাব জাতীয় ভিত্তি ভেঙে দিয়েছে এবং জাতিতে জাতিতে আন্তনির্ভরশীলতা সৃষ্টি করেছে।

মার্ক্সের একটি বিখ্যাত পরিহাসমূলক ও উসকানিমূলক বিবৃতি হচ্ছে, 'The proletariate has no country.' ব্যাখ্যা করলে এর অর্থ দাঁড়ায়, সব জাতির প্রলেতারিয়েতদের স্বার্থ অভিন্ন। *The German Ideology* গ্রন্থের উদ্ধৃতাংশ থেকে (ওপরে দেখুন) বোঝা যায়, প্রলেতারিয়েতদের জন্য ক্ষমতা দখলের সাক্ষাৎ রাজনৈতিক গঠন-কাঠামো হলো জাতি। মার্ক্সের দেশপ্রেমবিরোধী চিন্তাভাবনার একটা গভীরতর তাৎপর্য ছিল যথাক্রমে প্রলেতারীয় মানবতাবাদ অর্থাৎ সমগ্র মানবজাতি একটি অর্থপূর্ণ সমগ্র : মূল্যমান ও চূড়ান্ত লক্ষ্য। খ) ঐতিহাসিক বস্তুবাদের দিক থেকে কমিউনিজম কেবল বিশ্বপরিসরে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে, কারণ, উৎপাদিকা শক্তির নজিরবিহীন বিকাশ জাতি-রাষ্ট্রের সংকীর্ণ গঠন-কাঠামো অতিক্রম করে যাবে।

পোল্যান্ড ও আয়ারল্যান্ডের ওপর মার্ক্সের লেখাগুলো থেকে দেখা যায়, তিনি ম্যাজিনির উদার, গণতান্ত্রিক জাতীয়তাবাদের বিরোধিতা করেছেন এবং একই সঙ্গে প্রুঁধোপন্থীদের জাতীয় অস্তিত্বহীনতার বিরোধিতা করেছেন। পোল্যান্ডের জাতীয় মুক্তি ছিল ঊনবিংশ শতাব্দীর গণতান্ত্রিক মেহনতি শ্রেণির আন্দোলনের একটি ঐতিহ্য। মার্ক্স ও এঙ্গেলস—দুজনই এই ঐতিহ্যের অংশীদার। কিন্তু তাঁরা আত্মনিয়ন্ত্রণের সাধারণ গণতান্ত্রিক নীতি হিসেবে পোল্যান্ডের সংগ্রামকে সমর্থন করেননি। তাঁরা এই সংগ্রামকে সমর্থন করেছেন ইউরোপে প্রতিক্রিয়ার দুর্গ জারপন্থী রাশিয়ার বিরুদ্ধে সংগ্রাম হওয়ার কারণে। কিন্তু এর অর্থ কি এই যে রুশপন্থী স্লাভদের (চেকদের মতো) আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার নেই? ১৮৪৮-৪৯ সালে এঙ্গেলস এই প্রশ্ন নিয়ে গলদঘর্ম হয়েছেন। আয়ারল্যান্ডের ওপর লেখাগুলোর ব্যাপক প্রায়োগিক মূল্য ছিল। এতে নিপীড়িত জাতির প্রশ্ন সম্পর্কে কতগুলো সাধারণ নীতি অন্তর্নিহিত ছিল। প্রথম দিকে

মার্ক্স মনে করতেন ব্রিটেনের সঙ্গে থেকেই আয়ারল্যান্ডের স্বায়ত্তশাসনে থাকা উচিত। আইরিশদের ওপর যে নিপীড়ন, তার সমাধান আসতে পারে ইংল্যান্ডে শ্রমিকশ্রেণির (chartist)[২] বিজয়ের মাধ্যমে। ১৮৬০-এর দশকে এসে মার্ক্স ভাবতে শুরু করলেন, আয়ারল্যান্ডের মুক্তির মাধ্যমেই ইংল্যান্ডের প্রলেতারিয়েতদের মুক্তি আসতে পারে। মার্ক্সের এই চিন্তা থেকেই পরবর্তীকালে মার্ক্সবাদী জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের তত্ত্ব বিকশিত হয়েছে। এর সঙ্গে রয়েছে প্রলেতারীয় আন্তর্জাতিকতাবাদের একটি দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক: ক) নিপীড়িত জাতির মুক্তি জাতীয় বিভাজন ও দ্বন্দ্বের অবসান ঘটিয়ে নিপীড়ক ও নিপীড়িত জাতির শ্রমিকশ্রেণিকে অভিন্ন শত্রু-শ্রেণি পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ঐক্যবদ্ধ করে। খ) অন্য জাতির নিপীড়ন নিপীড়ক জাতির বুর্জোয়াদের শ্রমিকশ্রেণির ওপর আদর্শিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করে। তাই বলা হয়, 'Any nation that oppresses another forges its own chains.' গ) নিপীড়িত জাতির মুক্তি নিপীড়ক জাতির আধিপত্য বিস্তারকারী শ্রেণির অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামরিক ও আদর্শিক ভিত্তি নড়বড়ে করে দেয় এবং এর ফলে সে দেশের বিপ্লবী শ্রমিকশ্রেণির সংগ্রাম উজ্জীবিত হয়।

পোল্যান্ড ও আয়ারল্যান্ড সম্পর্কে এঙ্গেলসের অবস্থান মোটা দাগে মার্ক্সের মতো। কিন্তু তাঁর লেখায় অদ্ভুত একটি তাত্ত্বিক প্রপঞ্চ পাওয়া যায়। এটি হচ্ছে 'Non-historic nations'-এর মতবাদ। কারও কারও দৃষ্টিতে এই মতবাদের সঙ্গে মার্ক্সবাদের কোনো সম্পর্ক নেই। এর ফলে জাতি প্রশ্নে মারাত্মক ভুল করা হতে পারে। ১৮৪৮-৪৯ সালে মধ্য ইউরোপে গণতান্ত্রিক বিপ্লবের ব্যর্থতা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে এঙ্গেলস এর জন্য দায়ী করলেন দক্ষিণ স্লাভ জাতিগুলোর (চেক, স্লোভাক, ক্রোয়াট, সার্ব, রুমানিয়ান, স্লোভেন, ডালমাটিয়ান, মোরাভিয়ান, রুথিনিয়ান ইত্যাদি) প্রতিবিপ্লবী ভূমিকাকে। এসব জাতির লোকেরা দল বেঁধে অস্ট্রিয়া ও রাশিয়ার রাজকীয় বাহিনীতে ভর্তি হয়েছিল এবং প্রতিক্রিয়ার শক্তিগুলো এদেরকে ব্যবহার করে হাঙ্গেরি, পোল্যান্ড, অস্ট্রিয়া ও ইতালির উদারনৈতিক বিপ্লবকে ধ্বংস করার জন্য। আসলে অস্ট্রিয়ার রাজকীয় বাহিনী স্লাভ, জার্মান/অস্ট্রিয়ান কৃষকদের দিয়েই গঠিত হয়েছিল। প্রতিবিপ্লবীদের সাফল্যের একটা বড় কারণ ছিল বুর্জোয়া উদারনৈতিক নেতৃত্ব বিপ্লব করতে গিয়ে ছিল খুবই দোমনা, খুবই মধ্যপন্থী, খুবই ভীতসন্ত্রস্ত। তারা জাতীয় কৃষিবিপ্লবকে ভয় করছিল। ফলত তারা কৃষক ও জাতীয় সংখ্যালঘুদের তাদের পক্ষে নিতে পারেনি এবং প্রতিক্রিয়ার অন্ধ হাতিয়ার হওয়া থেকেও বিরত করতে পারেনি। ১৮৪৮ সালের বিপ্লবের ব্যর্থতা একটি চিরায়ত দৃষ্টান্ত হয়ে আছে। কারণ, কৃষি প্রশ্ন ও জাতি প্রশ্নের আমূল সমাধান দেওয়া সম্ভব হয়নি এ বিপ্লবে। ১৯১৭ সালের অক্টোবর বিপ্লবে এসব প্রশ্নের সমাধান হয়েছিল। এঙ্গেলস ১৮৪৮-৪৯ সালের বিপ্লবের ব্যর্থতার পেছনে সত্যিকার শ্রেণিগত কারণ উপলব্ধি করতে না পেরে

অধিবিদ্যক মতাদর্শের দিকে ঝুঁকে পড়েছিলেন। 'Non-historic nations'-এর তত্ত্বটি মূলত প্রতিবিপ্লবী। এঙ্গেলস এ ধরনের জাতির মধ্যে পেলমেল, দক্ষিণ স্লাভ, ব্রেটন, স্কট ও বাস্কদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এঙ্গেলসের মতে এরা হলো একটি জাতির অবশেষ, যাকে নির্দয়ভাবে ধ্বংস করা হয়েছে। (Friedrich Engels, 'The Magyan Struggle,' in Karl Marx, *The Revolution of 1848*, London 1973, pp.221-22)। এই ধারণাটি এঙ্গেলস পেয়েছেন হেগেলের কাছ থেকে। হেগেলের মতে, ইতিহাসের ধারায় এই সব জাতীয় বর্জ্য প্রতিবিপ্লবের গোঁড়া প্রতিনিধি এবং এদের অস্তিত্ব হয়ে দাঁড়ায় মহান ঐতিহাসিক বিপ্লবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদস্বরূপ। হেগেলই হলেন এই তত্ত্বের মূল নির্মাতা। যেসব জাতি রাষ্ট্র নির্মাণে ব্যর্থ হয়েছে অথবা যাদের রাষ্ট্র বহুকাল আগে ধ্বংস হয়েছে, তারাই 'Non-historic' এবং তারা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি দক্ষিণ স্লাভ অর্থাৎ বুলগেরিয়ান ও সার্বদের কথা উল্লেখ করেন। এঙ্গেলস যেকোনো কারণেই হোক, মেকি ঐতিহাসিক অধিবিদ্যক যুক্তির দিকে ঝুঁকে পড়েছিলেন।

রোজা লুক্সেমবার্গ

রোজা লুক্সেমবার্গ সম্পর্কে বলা হয়, তিনি ছিলেন এমন একজন গোঁড়া বামপন্থী, যিনি জাতীয় বিচ্ছিন্নতার বিরোধী ছিলেন। ১৮৯৬ সালে রোজা লুক্সেমবার্গ SDKP-এর (Social Democratic Party of Kingdom of Poland) প্রতিনিধি হিসেবে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের কংগ্রেসে প্রতিনিধিত্ব করেন। এই কংগ্রেসে তিনি যে অবস্থান গ্রহণ করেন, সে ব্যাপারে পরবর্তী এক লেখায় লিখেছেন, 'The liberation of Poland is as utopian as the liberation of Czechoslavakia, Ireland or Alsace-Lorraine……The unifying political struggle of the proletariate should not be supplanted by a "series of sterile national struggle"' (cited in Michael Lowy, *on Changing the World*, Akar Books, Delhi, 2016. P. 59)। তাঁর এই তাত্ত্বিক অবস্থানের পেছনে কাজ করেছে তাঁর ডক্টরাল থিসিস। থিসিসটির শিরোনাম ছিল, 'The Industrial Development of Poland', 1898। এই গবেষণাকাজের মূল বক্তব্য ছিল, অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণের বিচারে পোল্যান্ড ইতিমধ্যেই রাশিয়ার সঙ্গে একীভূত হয়ে গেছে। পোল্যান্ডের শিল্পের প্রবৃদ্ধির মূলে ভূমিকা রেখেছে রুশ বাজার। ফলে পোল্যান্ডের অর্থনীতি রুশ অর্থনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে টিকে থাকতে পারে না। পোল্যান্ডের স্বাধীনতা মূলত পোলিশ সামন্ত অভিজাতদের আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু শিল্পের বিকাশ লাভের ফলে এই আকাঙ্ক্ষার ভিত্তি নড়বড়ে হয়ে গেছে। রোজা লুক্সেমবার্গের মতে, পোল্যান্ডের বুর্জোয়ারা, যাদের অর্থনৈতিক ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে রুশ অর্থনীতির ওপর, তারা বিচ্ছিন্নতা চায় না।

অন্যদিকে পোল্যান্ডের প্রলেতারিয়েতরা, যাদের ঐতিহাসিক স্বার্থ রুশ প্রলেতারিয়েতদের সঙ্গে বৈপ্লবিক মিত্রতার মধ্যে নিহিত, তারাও জাতীয়তাবাদী নয়। কেবল পেটি বুর্জোয়া এবং প্রাক্-পুঁজিবাদী স্তরগুলো ঐক্যবদ্ধ স্বাধীন পোল্যান্ডের অলীক স্বপ্ন দেখে।

জাতীয় প্রশ্ন সম্পর্কে ১৯০৮ সালে রোজা লুক্সেমবার্গ একগুচ্ছ প্রশ্ন লেখেন। এই সব প্রশ্নের মূল কথা হলো: (ক) আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার একটি বিমূর্ত এবং অধিবিদ্যক অধিকার, যেমন ঊনবিংশ শতাব্দীর কল্পনাবিলাসীরা কাজের অধিকারের পক্ষে ওকালতি করতেন। কিংবা লেখক Cherniavsky বলেছিলেন, সব মানুষের সোনার থালায় খাওয়ার অধিকার রয়েছে। (খ) বিচ্ছিন্নতার অধিকারের প্রতি সমর্থন প্রতিটি জাতির জন্য কার্যত বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের সমর্থন হয়ে দাঁড়ায়। জাতি কোনো সমজাতীয় সত্তা নয় এবং এরূপভাবে এর কোনো অস্তিত্ব নেই। একটি জাতির অভ্যন্তরে প্রতিটি শ্রেণির দ্বন্দ্বপূর্ণ স্বার্থ ও অধিকার রয়েছে। (গ) সাধারণভাবে ক্ষুদ্র জাতির স্বাধীনতা, বিশেষভাবে পোল্যান্ডের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিকভাবে একটি অলীক মতবাদ ও ইতিহাসের সূত্র এর নিন্দা জানায়। একমাত্র ব্যতিক্রম এ ব্যাপারে রোজা লুক্সেমবার্গের জন্য ছিল তুর্কি সাম্রাজ্যের বলকান জাতিগুলো (গ্রিস, সার্বিয়া, বুলগেরিয়া, আর্মেনিয়া)। এই জাতিগুলো তুরস্কের তুলনায় অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছে। একটি ক্ষয়িষ্ণু সাম্রাজ্যের জগদ্দল পাথর এদেরকে নিপীড়ন করেছে। ক্রিমিয়ার যুদ্ধে মার্ক্স ভেবেছিলেন, তুর্কি সাম্রাজ্য টেকসই নয়। ঐতিহাসিক প্রগতির জন্য এই সাম্রাজ্যের জাতিরাষ্ট্রে টুকরো হয়ে যাওয়া উচিত।

১৯১৪ সালে রোজা লুক্সেমবার্গ ছিলেন দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের মুষ্টিমেয় নেতাদের একজন, যিনি সামাজিক দেশপ্রেমবাদের জোয়ারের কাছে আত্মসমর্পণ করেননি। যুদ্ধের মুখে ইউরোপ এই জোয়ারে প্লাবিত হয়ে গিয়েছিল। জার্মান কর্তৃপক্ষ তাঁকে আন্তর্জাতিকতাবাদী ও সমরবাদবিরোধী প্রচারণার অভিযোগে কারারুদ্ধ করেছিল। ১৯১৫ সালে তিনি জেল থেকে Junius Pamphlet নামে একটি প্রচারপত্র পাচার করেছিলেন। এই প্রচারপত্রে লুক্সেমবার্গ আত্মনিয়ন্ত্রণের নীতি কিছুটা গ্রহণ করেছিলেন: 'Socialism gives to every people the right of independence and the freedom of independent control of its own destinies.' যা-ই হোক, তাঁর মতে বিদ্যমান পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে, বিশেষ করে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার চর্চা করা যায় না। কীভাবে ফ্রান্স, তুরস্ক অথবা জারতন্ত্রী রাশিয়ার পরিপ্রেক্ষিতে free choice-এর কথা বলা যায়? সাম্রাজ্যবাদের যুগে জাতীয় স্বার্থের জন্য সংগ্রাম একটি রহস্য ছাড়া আর কিছুই নয়। এটা কেবল বৃহৎ ঔপনিবেশিক শক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। এটা ক্ষুদ্র জাতির ক্ষেত্রেও প্রাসঙ্গিক, যে জাতিগুলো

সাম্রাজ্যবাদী বৃহৎ শক্তির দাবার ঘুঁটি ছাড়া আর কিছুই নয়।

জাতীয় প্রশ্নে লুক্সেমবার্গ তাঁর তত্ত্বের বিকাশ ঘটান ১৮৯৩ থেকে ১৯১৭ সাল পর্যন্ত। এই তত্ত্ব চারটি মৌলিক তাত্ত্বিক, পদ্ধতিগত ও রাজনৈতিক ভ্রান্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। ১) বিশেষ করে ১৯১৪ সালের আগে তিনি জাতিসমস্যাটি অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার বিশ্লেষণ করেছেন, যেমনটি তিনি করেছিলেন পোল্যান্ডের ক্ষেত্রে। ১৯১৪ সালের পর তিনি এই অবস্থান থেকে ক্রমে দূরে সরে যেতে থাকেন, যা স্পষ্ট হতে থাকে Junius Pamphlet থেকে। ২) লুক্সেমবার্গ জাতিকে একটি সাংস্কৃতিক বিষয় হিসেবে দেখেছেন। এর ফলে জাতি প্রশ্নের রাজনৈতিক দিকটি গৌণ হয়ে পড়ে। জাতি প্রশ্ন নিছক অর্থনীতি অথবা মতাদর্শে (ideology) সীমিত থাকতে পারে না। এই প্রশ্নের সুস্পষ্ট রূপ হলো স্বাধীন জাতিরাষ্ট্রের জন্য সংগ্রাম করে তা প্রতিষ্ঠা করা। লুক্সেমবার্গ তাঁর চিন্তার সীমাবদ্ধতার কারণে জাতীয় নিপীড়নের অবসান চেয়েছেন শুধু স্বাধীন সাংস্কৃতিক বিকাশের জন্য, কিন্তু তিনি বিচ্ছিন্নতাবাদ বা রাজনৈতিক স্বাধীনতার অধিকার মেনে নিতে চাননি। তিনি বুঝতে পারেননি যে স্বাধীন জাতিরাষ্ট্র গঠনের অধিকার অস্বীকার করাও নিপীড়ন। লুক্সেমবার্গ জাতীয় সংগ্রামের অসংগতিপূর্ণ, পেটি বুর্জোয়াসুলভ ও প্রতিক্রিয়াশীল দিকগুলোর প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন। তিনি বুঝতে পারেননি, জারতন্ত্র কিংবা সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবাদবিরোধী সংগ্রামের মধ্যে একটি বিপ্লবী সম্ভাবনা লুকিয়ে আছে। তিনি এই সংগ্রামের জটিল ও পরস্পরবিরোধী দ্বান্দ্বিকতাকে উপলব্ধি করতে পারেননি। তিনি বুঝতে পারেননি যে জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের দ্বৈত চরিত্র আছে। রাশিয়ার ক্ষেত্রে তিনি শ্রমিকশ্রেণির মিত্র কৃষক শ্রেণির গুরুত্ব বুঝতে চাননি। তিনি রুশ বিপ্লবকে অকৃত্রিম শ্রমিকশ্রেণির বিপ্লব হিসেবে দেখেছেন। লেনিনের মতো তিনি রুশ বিপ্লবকে শ্রমিকশ্রেণির নেতৃত্বে একটি বিপ্লব বলে চিন্তা করতে পারেননি। ৪) তিনি বুঝতে ব্যর্থ হয়েছেন যে নিপীড়িত জাতির মুক্তি শুধু একটি অলীক, প্রতিক্রিয়াশীল ও প্রাক্-ধনবাদী পেটি বুর্জোয়াদের দাবিমাত্র নয়, এটি সমগ্র জনগণের দাবি, যার মধ্যে প্রলেতারিয়েতরাও আছে। রুশ প্রলেতারিয়েতরা যখন জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার সমর্থন করে, তখন এটা নিপীড়িত জাতির প্রলেতারিয়েতদের সঙ্গে সংহতির একটা অবিচ্ছেদ্য বিষয় হয়ে ওঠে।

ট্রটস্কি

১৯১৫ সালে 'Nation and Economy' শিরোনামে ধারাবাহিক কয়েকটি প্রবন্ধ লেখেন ট্রটস্কি। এসব প্রবন্ধে তিনি জাতীয় প্রশ্ন অনেকটাই ত্রুটিমুক্তভাবে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেন। তবে এগুলো দ্ব্যর্থকতামুক্ত ছিল না। তাঁর যুক্তিবিন্যাসে পরস্পরবিরোধী লাইনগুলো জানিয়ে দিচ্ছিল যে তাঁর ভাবনা জমাট বাঁধেনি। তিনি সামাজিক সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে তাঁর সমালোচনা দিয়ে বক্তব্যের সূচনা ঘটান।

সামাজিক সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের রাজনৈতিক অবস্থানের পক্ষে বাজার ও উৎপাদিকা শক্তির সম্প্রসারণের প্রয়োজন তুলে ধরেছিলেন। পদ্ধতিগত দিক থেকে তার সমালোচনা ছিল অর্থনীতিবাদের বিরুদ্ধে। এ কথা সত্য যে মার্ক্সবাদীরা অর্থনীতির পরিমণ্ডলে সর্বাধিক সম্প্রসারণের পক্ষাবলম্বন করে, কিন্তু তা কোনোক্রমেই শ্রমিকশ্রেণির আন্দোলনকে বিভক্ত, বিপর্যস্ত ও দুর্বল করে নয়। ট্রটস্কির যুক্তিগুলো ছিল বিভ্রান্তিকর। তিনি শ্রমিকশ্রেণির আন্দোলনকে আধুনিক সমাজের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উৎপাদিকা শক্তি হিসেবে দেখেছেন। তিনি যে যুক্তিগুলো হাজির করেছিলেন, তার মধ্যে রাজনৈতিক মানদণ্ডগুলোই ছিল প্রধান। তিনি তাঁর প্রবন্ধগুলোতে অর্থনৈতিক উন্নয়নকে কেন্দ্রায়িত করার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এর মানে দাঁড়ায়, উৎপাদিকা শক্তির বিকাশের জন্য জাতিরাষ্ট্রকে ধ্বংস করতে হবে। কারণ, জাতিরাষ্ট্র উৎপাদিকা শক্তির বিকাশের পথে বাধা। একদিকে ট্রটস্কি জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের স্বীকৃতি দিয়েছেন, অন্যদিকে কেন্দ্রীকরণের কথা বলেছেন। তিনি একধরনের তাত্ত্বিক ধাঁধার সৃষ্টি করেছিলেন। এই ধাঁধা থেকে বেরোনোর জন্য তাঁকে একপ্রকার তাত্ত্বিক ডিগবাজি খেতে হয়। ফলে তাঁকে তাঁরই সমালোচনা করা অর্থনীতিবাদে প্রত্যাবর্তন করতে হয়। তিনি বলেছেন, 'The state is essentially an economic organization, it will be forced to adapt to the needs of economic development.' সুতরাং জাতিরাষ্ট্র দ্রবীভূত হয়ে যাবে এবং জাতিরাষ্ট্রে বিভক্ত ইউরোপ হবে Republican United States of Europe। অন্যদিকে অর্থনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এবং রাষ্ট্রের পুরাতন গঠন-কাঠামো থেকে মুক্তি অর্জন করে যে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে, সেটা হবে সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে এবং সাংস্কৃতিক বিকাশের জন্য। শেষ পর্যন্ত ট্রটস্কিও জাতি প্রশ্নকে সাংস্কৃতিক আত্মনিয়ন্ত্রণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে বলে মন্তব্য করেন। আজ যে ইউরোপীয় ইউনিয়ন গঠিত হয়েছে, সেটা কি ট্রটস্কির চিন্তারই প্রতিফলন নয়? মনে রাখতে হবে, ইউরোপীয় ইউনিয়ন গঠিত হয়েছে ইউরোপভুক্ত জাতিরাষ্ট্রের উচ্চপর্যায়ের বিকাশের পর, যে পর্যায়ের বাজারের বিকাশ ও উৎপাদিকা শক্তির বিকাশ সংঘবদ্ধ ইউরোপকে নিশ্চিত করেছে।

স্তালিন

জাতীয় প্রশ্নে জোসেফ স্তালিনের বিখ্যাত রচনাটি হচ্ছে *Marxism and the National Question*. এটা বোধগম্য যে জাতীয় প্রশ্নে স্তালিনের কাজটি যেসব চিন্তাভাবনার ওপর গড়ে উঠেছে, তার উৎস মূলত বলশেভিক পার্টি ও লেনিন। ট্রটস্কি অবশ্য বলেছেন (Leon Trotsky, *Stalin*, Vol.1 London 1969, p.233), স্তালিনের প্রবন্ধটির প্রতিটি ছত্র লেনিন দ্বারা অনুপ্রাণিত, তদারককৃত ও শুদ্ধকৃত। তবে ট্রটস্কির

এ বক্তব্য বিশেষজ্ঞ মহলে খুব একটা গ্রহণযোগ্যতা পায়নি। এর বিপরীতে দেখা যাবে, বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে স্তালিনের কাজটি আকারে, ইঙ্গিতে ও সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ্যে লেনিনের রচনাবলির চিন্তার বিরুদ্ধে যায়। এ ব্যাপারগুলো নিচে তালিকাভুক্ত করা হলো :

১) স্তালিন জাতি সম্পর্কে 'National Character', 'Common Psychology Make-up' অথবা 'Psychological Particularity'র যে ধারণা ব্যক্ত করেছেন, তার সঙ্গে লেনিনবাদের কোনো সম্পর্ক নেই। এটা বাওয়ারের উত্তরাধিকার। লেনিন সুনির্দিষ্টভাবে ও স্পষ্টভাবে তাঁর 'Psychological Theory'র সমালোচনা করেছেন। বস্তুত জাতীয় মনস্তত্ত্বের বিষয়গুলো খুবই ভাসাভাসা এবং প্রাক্-বৈজ্ঞানিক লোককথার মতো। এর সঙ্গে জাতীয় প্রশ্নের মার্ক্সিস্ট বিশ্লেষণের কোনো সম্পর্ক নেই।

২) স্তালিন বলেছেন, 'It is only when all these characteristics {common language, territory, economic life, and 'psychic formation'} are present together that we have a nation,' স্তালিনের জাতির ধারণা আদর্শের বিচারে বস্তুত জবরদস্তিমূলক ও মর্জিনির্ভর। স্তালিন বলেছেন, ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের আগে জর্জিয়া কোনো জাতি ছিল না, কারণ, এর কোনো অভিন্ন অর্থনৈতিক জীবন ছিল না। এটি ছিল কয়েকটি স্বাধীন অর্থনৈতিক ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত। এই মানদণ্ড অনুযায়ী শুল্ক ইউনিয়নের (customs union) আগে জার্মানিও জাতি ছিল না। লেনিনের কোনো লেখায় এ রকম চূড়ান্ত, গোঁড়া ও মর্জিনির্ভর জাতির সংজ্ঞা দেওয়া হয়নি।

৩) স্তালিন খোলাখুলিভাবেই একটি বহুজাতিক রাষ্ট্রের ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা জাতীয় গ্রুপগুলোর ঐক্য বা একত্রে বসবাস মেনে নিতে রাজি ছিলেন না। দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি বাল্টিক প্রদেশগুলোর জার্মানদের সঙ্গে ট্রান্স-ককেশিয়ার জার্মানদের ঐক্যের মাধ্যমে একটি ঐক্যবদ্ধ একক জাতি গঠনের সম্ভাবনা বাতিল করে দিয়েছেন। অপর দিকে লেনিন অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে যেকোনো রাষ্ট্রে যেকোনো জাতীয়তাভুক্ত সম্প্রদায়ের স্বাধীনভাবে একসঙ্গে বসবাস করা সমর্থন করেছেন। এ ব্যাপারে তিনি ককেশাস, বাল্টিক ও পেট্রোগার্ড অঞ্চলের জার্মানদের কথা বলেছেন।

৪) স্তালিন বৃহৎ জারতন্ত্রী রাশিয়ার নিপীড়নকারী জাতীয়তাবাদ ও নিপীড়িত জাতিসমূহের জাতীয়তাবাদের মধ্যে কোনো পার্থক্য বিচার করেননি। তাঁর প্রবন্ধের একটি অনুচ্ছেদে তিনি এক নিশ্বাসে ওপর থেকে উঠে আসা যুদ্ধংদেহী ও নিপীড়নকারী জারদের জাতীয়তাবাদ ও নিচ থেকে উত্থিত হওয়া জাতীয়তাবাদের তরঙ্গ, যেটি ক্ষেত্রবিশেষে নিরেট জাত্যভিমানরূপে প্রকাশ

পেত—উভয় প্রবণতাকেই তিনি প্রত্যাখ্যান করেছেন। নিচ থেকে উঠে আসা যাদের জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে বলা হয়েছে, তারা হলো পোলিশ, ইহুদি, তাতার, জর্জিয়ান, ইউক্রেনিয়ান ইত্যাদি। তিনি ওপর থেকে উঠে আসা ও নিচ থেকে উঠে আসা জাতীয়তাবাদের পার্থক্য বিচার করতে ব্যর্থ হয়েছেন। তিনি নিপীড়িত দেশসমূহের সামাজিক গণতন্ত্রীদের কঠোর সমালোচনা করেছেন, কারণ, তারা জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মুখে শক্ত হয়ে দাঁড়াতে পারেনি। অন্যদিকে লেনিন এই দুই ধরনের জাতীয়তাবাদের মধ্যে পার্থক্যের বিচারকে চূড়ান্ত নিয়ামক হিসেবে শুধু বিচারই করেননি, বরং তাদের তীব্র সমালোচনা করেছেন, যারা সচেতন বা অচেতনভাবে বৃহৎ রুশ জাত্যভিমানের সঙ্গে আপস করেছে বা তার কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। এটা কোনো দুর্ঘটনা নয় যে লেনিনের রাজনৈতিক আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু ছিল একটি নিপীড়িত জাতি অর্থাৎ পোল্যান্ডের মার্ক্সবাদী সামাজিক গণতন্ত্রীরা। তারা পোলিশ জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে দৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করেছিল এবং এভাবেই তারা রুশ সাম্রাজ্য থেকে পোল্যান্ডের বিচ্ছিন্ন হওয়ার অধিকার অস্বীকার করেছে। সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচার বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, জাতি প্রশ্নে লেনিন ও স্তালিনের মধ্যেও মতপার্থক্য ছিল। তবে 'জাতি' সম্পর্কে স্তালিনের প্রবন্ধটি মার্ক্সবাদী মহলে ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়েছে। এমনকি পাশ্চাত্যের পণ্ডিতবর্গ 'জাতি' সম্পর্কে কোনো সংকলন গ্রন্থ তৈরি করতে গিয়ে স্তালিনের প্রবন্ধটিকে গুরুত্বের সঙ্গে অন্তর্ভুক্ত করেন।

বিশ্ব পরিস্থিতির পরিবর্তন ও জাতি প্রশ্ন

জাতি প্রশ্নের আলোচনা থেকেই স্পষ্ট হয়েছে যে বিষয়টি মার্ক্সবাদীদের মধ্যে প্রচুর বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। গভীরতা ও সূক্ষ্মতার দিক থেকে এই বিতর্ক খুবই সমৃদ্ধ। যেসব মার্ক্সবাদী তাত্ত্বিকের আলোচনা এখানে এসেছে, তাঁদের সময়কাল পেরিয়ে পৃথিবীতে অনেক পরিবর্তন হয়ে গেছে। ইতিহাস অনেকাংশেই এই সব বিতর্কের ফয়সালা করে ফেলেছে। বহুজাতিভিত্তিক অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরি প্রথম মহাযুদ্ধের পর বেশ কয়েকটি জাতিরাষ্ট্রে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এঙ্গেলস স্পেনের 'বাস্ক' জাতিকে কার্যত একটি প্রতিক্রিয়াশীল জাতি হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন। এখন বাস্করা স্পেনের বৈপ্লবিক সংগ্রামের চূড়ায় অবস্থান করছে। বাস্কদের সবচাইতে র‍্যাডিক্যাল সংগঠন ETA-এর জন্ম হয়েছিল ষাটের দশকের শেষ দিকে স্বৈরাচারী ফ্রাঙ্কো সরকারের নিপীড়ন প্রতিরোধ করার জন্য। ETA বাস্ক জনগণের মধ্যে প্রভূত জনপ্রিয়তা অর্জন করে। ETA বাস্কদের জন্য একটি স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের লড়াই করেছে। বাস্কদের ইউরোপের অন্যতম প্রাচীন জনগোষ্ঠী হিসেবে ধারণা করা হয়। তারা উত্তর-পশ্চিম স্পেনের পার্বত্য ও সমুদ্রসৈকত অঞ্চল এবং ফ্রান্সের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে তিন হাজার

বছর ধরে বসবাস করছে। তাদের ভাষা ইউসকেরা অন্য কোনো ইউরোপীয় ভাষার সঙ্গে সম্পর্কিত নয়। আজও ভাষাটি টিকে আছে এবং ৯০ শতাংশ বাস্ক শিশু ইউসকেরা স্কুলে ভর্তি হয়। ETA-এর পুরো অর্থ হচ্ছে Euskadi Ta Askatasuna। এটি একটি বামপন্থী বাস্ক জাতীয়তাবাদী ও বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠন। ৩১ জুলাই ১৯৫৯ সালে স্পেনের বিলবাওতে এর সংগঠনটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এর সদর দপ্তর ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে অবস্থিত। ETA সংগঠনটির ইংরেজি ভাষাগত অর্থ হলো Basque Homeland and Freedom। ২০১৮ সালের ১৭ জুলাইয়ের এক সংবাদভাষ্যে জানা যায়, এই সংগঠন ETA হিসেবে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। এর অর্থ এই নয়, বাস্ক জাতীয়তাবাদের প্রতি উৎসাহ চলে গেছে। বরং এর ফলে স্পেন সরকারের জন্য নতুন সমস্যার উদ্ভব হয়েছে। ETA যখন সক্রিয় ছিল (সশস্ত্র পদ্ধতিসহ), তখন স্পেন সরকার ETA-এর অজুহাত দেখিয়ে সব ধরনের নিপীড়ন চালাত। এখন আর 'সবকিছুর জন্য ETA দায়ী' অজুহাত ব্যবহার করে স্পেন সরকার যদৃচ্ছ আচরণ করতে পারবে না, অথচ বাস্ক জাতীয়তাবাদ টিকে থাকবে। মানুষের ভাবের জগতে জাতীয় পরিচয় জাতীয় রাজনৈতিক আন্দোলনের একটি চেতনা হিসেবে কাজ করে। বিষয়টি অবজ্ঞা করার মতো নয়। এই সব ভাবের জগৎভুক্ত বিষয়গুলো আকাশ থেকে পড়ে না। ঐতিহাসিক অবস্থায় অর্থাৎ অত্যাচার নিপীড়নের ফলে এগুলোর জন্ম হয়। এ থেকে বোঝা যায়, আত্মনিয়ন্ত্রণের একটি ব্যাপক প্রয়োগ আছে। এটা নিছক বিচ্ছিন্নতার বিষয় নয়, এটা জাতীয় পরিচয়ের বিষয়। একদল বিশেষজ্ঞ কিছুসংখ্যক বস্তুগত তালিকার ভিত্তিতে নির্ধারণ করতে পারে না, কোনো জনগোষ্ঠী একটি জাতি বা জাতি নয়। এই সিদ্ধান্তের ভার জনগোষ্ঠীর ওপরই ন্যস্ত করা উচিত।

উড্রো উইলসনের সময় থেকে বৃহৎ শক্তিগুলো জাতীয়তাবাদকে তাদের ভাবাদর্শ ও অস্ত্রশস্ত্রের মজুত গড়ে তোলার পক্ষে যৌক্তিকতা হিসেবে ব্যবহার করেছে। এখন আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে 'গণতন্ত্র', 'জাতিসমূহের সমতা' ও 'আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার' প্রায় প্রতিনিয়তই উচ্চারিত হয়। এই নীতিগুলোকে বুর্জোয়া রাষ্ট্রনায়কেরা ব্যবহার করেন। ১৯৬৬ সালে মার্কিন প্রেসিডেন্ট লিন্ডন জনসন ভিয়েতনামে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের (?) পক্ষে দাঁড়ানোর ঘোষণা দিয়েছিলেন (A. Schleshinger Jr., *The Bitter Heritage*, Boston, 1967, p.108 থেকে উদ্ধৃত)। অথচ শ্বেতাঙ্গ শক্তিগুলো ইতিহাসের এক বিশাল পর্যায়জুড়ে অনগ্রসর জাতিগুলোর ওপর বীভৎস অত্যাচার ও দমননীতি চালিয়েছে এবং এর পক্ষে সাফাই গেয়েছে। Treieschke ঊনবিংশ শতাব্দীতে আফ্রিকার একটি গোত্রের অভ্যুত্থান সম্পর্কে লিখেছেন, 'It is pure mockery to apply normal principles of war in wars with savages. A negro tribe must be chastised by setting its villages on fire, because this is the only kind of remedy that is effective.' (Heinrich von Treieschke,

Politics, vol.2, London 1916, p.614)। এ কথা সত্য যে বর্তমান পৃথিবীতে কেউ এ ধরনের বর্বরোচিত উক্তি করতে সাহস পায় না, বরং লজ্জা পায়। অন্তত বাচন ও উক্তির ক্ষেত্রে কিছুটা ভব্যতা এসেছে। তারপরও এই মুহূর্তে কাশ্মীরে যা ঘটছে, ১৯৭১ সালে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে যা ঘটেছিল, তাতে প্রমাণিত হয়, বর্বরতা থেকে সভ্যতায় মানবজাতির সম্পূর্ণ উত্তরণ ঘটেনি। আজকের যুগের শ্রমিকশ্রেণির আন্দোলনে রাজনৈতিক দুর্বলতার উৎস লুক্সেমবার্গীয় 'খোকা রোগ' নয়। লুক্সেমবার্গের ভুল ছিল আন্তরিক ধ্যানধারণা থেকে উদ্ভূত। বর্তমান যুগে নিপীড়িত জাতির জন্য বিপদটি আসছে বৃহৎ শক্তিসুলভ দাম্ভিকতা থেকে। এর পেছনে রয়েছে এসব শক্তি-গোষ্ঠীর আমলাতন্ত্র। জাতীয় প্রশ্নকে লুক্সেমবার্গের মতো গোঁড়া বামপন্থী দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হয় না। প্রশ্নটিকে শুধু শ্রমিকশ্রেণির একতা ও আন্তর্জাতিকতার দোহাই তুলে অবজ্ঞা করা হয় না। এঙ্গেলস 'প্রতিক্রিয়াশীল জাতি'র যে ধারণা পোষণ করতেন, সে রকম ধারণাও আজকাল আর কেউ পোষণ করে না। বর্তমান যুগের জাতি প্রশ্নগুলো পরীক্ষা-নিরীক্ষা করলে দেখা যাবে, এগুলো বেশ জটিল। এসব জাতীয় প্রশ্নে জাতীয়, ঔপনিবেশিক, ধর্মীয় ও এথনিক বিষয়গুলো জড়িয়ে আছে এবং একে অপরের ওপর ক্রিয়াশীল। দৃষ্টান্ত হিসেবে 'আরব-ইসরায়েলি বিরোধ', উত্তর আয়ারল্যান্ডে 'ক্যাথলিক ও প্রোটেস্ট্যান্টদের বিরোধ' প্রভৃতি উল্লেখ করা যায়। এগুলোকে কেন্দ্র করে বিপ্লবী বামপন্থীরা খোকা রোগে ভোগে। এদের একাংশ ফিলিস্তিনিদের ও আলস্টারের ক্যাথলিকদের আন্দোলনকে পেটি বুর্জোয়া আন্দোলন বলে সমালোচনা করে এবং এই সব আন্দোলন শ্রমিকশ্রেণির আন্দোলনে বিভাজন সৃষ্টি করে বলে অভিযোগ তোলে। তারা মনে করে, এসব জাতি প্রশ্ন প্রলেতারীয় আন্তর্জাতিকতাবাদের চেতনাবিরোধী। দ্বিতীয় প্রবণতা হলো এই সব জাতীয়তাবাদী মতাদর্শকে প্রশ্নহীনভাবে সমর্থন করা এবং সব ইহুদি অথবা উত্তর আইরিশ প্রোটেস্ট্যান্টদের নিন্দা করা। অর্থাৎ শ্রেণি প্রশ্নকে বেমালুম এড়িয়ে যাওয়া।

বিপ্লবী মার্ক্সবাদীদের এই উভয় প্রবণতা থেকে দূরে থাকতে হবে। বাস্তব অবস্থার বাস্তব বিশ্লেষণ করে সঠিক আন্তর্জাতিকতাবাদের নীতিতে অটল থাকতে হবে। তাঁদের লেনিনের নেতৃত্বাধীন কমিন্টার্নের থিসিস থেকে প্রেরণা নিতে হবে। তাঁরা দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের ১৮৮৬ সালের কংগ্রেসের প্রস্তাবটিও স্মরণ করতে পারেন। এই প্রস্তাব একটি বিরল ঘটনা। প্রস্তাবটি লেনিন ও লুক্সেমবার্গ উভয়েই অনুমোদন করেছিলেন। প্রস্তাবে বলা হয়েছিল, 'The Congress proclaims the full right to self determination of all nations; and it expresses its sympathy to the workers of all countries at present suffering beneath the yoke of military, national or any other kind of absolutism; the Congress calls on the workers of these countries to join the ranks of the conscious workers of

the whole world, in order to struggle beside them to defeat international capitalism and attain the goals of international social democracy.'

(ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখকের দেওয়া নাজমুল করিম স্মারক বক্তৃতার ওপর ভিত্তি করে লেখাটি তৈরি করা হয়েছে।)

টীকা

১. The Communist International (Comintern), known also as the Third International (1919-1943), was an international organization that advocated world communism. The Comintern resolved at its Second Congress to 'struggle by all available means, including armed force, for the overthrow of the international bourgeoisie and the creation of an international Soviet republic as a transition stage to the complete abolition of the state'. (Source : Wikipedia)

২. Chartism was a working-class movement for political reform in Britain that existed from 1838 to 1857. It took its name from the People's Charter of 1838 and was a national protest movement, with particular strongholds of support in Northern England, the East Midlands, the Staffordshire Potteries, the Black Country, and the South Wales Valleys. Support for the movement was at its highest in 1839, 1842, and 1848, when petitions signed by millions of working people were presented to the House of Commons.

গ্রন্থপঞ্জি

১. A. Schleshinger Jr., *The Bitter Heritage*, Boston,1967

২. Chantal Mouffe, *FOR A LEFT POPULISM*, Verso, London, 2018. *Correspondence between Mahatma Gandhi and P.C Joshi*, p.12

৩. ERNESTO LACLAU and CHANTAL MOUFFE, *Hegemony and Socialist Strategy Towards a Radical Democratic Politics Second Edition*, VERSO, London • New York, 2001

৪. Frederick Engels, *The Condition of the Working Class in England*, Penguin Books, London, 2009

৫. Frederick Engels, *Anti-Duhring*, Foreign Languages Publishing House, Moscow, 1962

৬. Frederick Engels, *Origin of the Family*, Private Property and the State, Foreign Languages Publishing House, Moscow

৭. Georg Wilhelm Friedrich Hegel, *The Philosophy of Right*, Translated into English by S W Dyde, G Bell, London, 1896

৮. J.V. Stalin, *Marxism and the National and Colonial Question*, Co-operative Publishing Society of Foreign Workers in the USSR, Moscow, 1935

৯. Karl Marx, *Capital-III*, Ch.47

১০. Karl Marx, *'Critique of Hegle's Philosophy of the State'*, 1844

১১. Karl Marx, 'The Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte', in Marx & Engels, *Selected Works*, Vol. 1 Foreign Languages Publishing House, Moscow, 1962

১২. Karl Marx, *The Civil War in France*, English Edition, 1871

১৩. Karl Marx, *The Revolutions of 1848*, Verso, 2010

১৪. Karl Marx, *Theories of Surplus Value*,1863 (Trans. From the German, Ed., S. Ryazanskaya, Progress Publishers, 1968)

১৫. Karl Marx & Frederick Engels, *German Ideology*, Progress Publishers, Moscow, 1964

১৬. Karl Marx & Frederick Engels, *Menifesto of the Communist Party, in Marx & Engels Selected Works*, Foreign Languages Publishing House, Moscow, 1962

১৭. Karl Kautsky, *Die Agrarfage, Germany, 1898 (See English Translation by Pete Burgess, The Agrarian Question, Zwan Publications*, 1988)

১৮. L*enin on the National and Colonial Questions, Three Articles*, Foreign Languages Press, Beijing, 1967

১৯. Leon Trotsky, 'Nation and Economy', cited in Michael Lowy, *On Changing the World*, Aakar, Delhi, 2016

২০. Mao Ze Dong, 'An Analysis of Classes in Chinese Society', Beijing, 1965

২১. Mao Ze Dong, *Selected Works*, vol.2, p.264

২২. Paul A. Baran, *THE POLITICAL ECONOMY of GROWTH*, Monthly Review Press, New York, 1957

২৩. Paul Mason, *POST CAPITALISM—A GUIDE TO OUR FUTURE*, Penguin Books, London, 2015

Polemics in the General Line of the International Communist Movement, Beijing

২৪. V. I. Lenin, *Development of Capitalism in Russia*, Progress Publishers, Moscow, 1977

২৫. V. I. Lenin, Collected Works, Vol. 24, Progress Publishers, Moscow, 1964

২৬. V. I. Lenin, 'The State', A Lecture Delivered at the Sverdlov University, July 11, 1919 in *Selected Works, Vol. 3*, Gospolitizdat, Moscow, 1961

২৭. V. I. Lenin, Speech Delivered at the Second All Russia Congress of Soviets of Peasants' Deputies, December 2, 1917. First published : Izvestia, No 244,

Dec 6, 1917. Source, Lenin, *Collected Works*, Progress publishers, Moscow,1972, pp 357-360

২৮. V. I. Lenin, '*Left-Wing' Communism, An Infantile Disorder, in Selected Works*, Gospolitizdat, Moscow 1961

২৯. V. I. Lenin, *The State and Revolution, in Selected Works*, Gospolitizdat, Moscow, 1964, আরও দেখুন, *Collected Works, Vol.25*, pp 419-420

রাজনীতি

পুঁজিবাদ তো ব্যর্থ হলো, এরপর কী?

জন বেলামি ফস্টার

২১ শতকের দুই দশক এখনো পেরোয়নি, কিন্তু এর মধ্যে সামাজিক ব্যবস্থা হিসেবে পুঁজিবাদের ব্যর্থতার নজিরগুলো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। অর্থনৈতিক স্থবিরতা, অর্থনীতির আর্থিকীকরণ ও মানবেতিহাসের সবচেয়ে তীব্র অসমতায় পৃথিবী এখন মুখ থুবড়ে পড়েছে। সঙ্গে আরও যা যা ঘটছে, তা লিখতে গেলে লম্বা একটি ফিরিস্তিই দিতে হয় : বেকারত্ব, কাজের অভাব, অনিশ্চয়তা, দারিদ্র্য, ক্ষুধা, জীবন ও সম্পদের অপচয় এবং আজকের দিনে যাকে বলা যায় বাস্তুতন্ত্রের 'মৃত্যুর সর্পিল সিঁড়ি'।[১] আমাদের সময়ে প্রযুক্তির সেরা উদ্ভাবন হচ্ছে ডিজিটাল বিপ্লব, কিন্তু সেই বিপ্লব মুক্ত যোগাযোগ ও স্বাধীন উৎপাদনের প্রতিশ্রুতি থেকে সরে গিয়ে নজরদারি, নিয়ন্ত্রণ ও শ্রমিকদের স্থানচ্যুত করার মাধ্যমে পরিণত হয়েছে। উদার গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলো ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে চলে গেছে। অন্যদিকে পুঁজিবাদী গণতন্ত্রের পশ্চাদ্দেশ সুরক্ষাকারী ব্যবস্থা ফ্যাসিবাদ আবারও সামনের দিকে হাঁটা শুরু করেছে, সঙ্গে আছে পিতৃতন্ত্র, বর্ণবাদ ও যুদ্ধ।

তবে ব্যবস্থা হিসেবে পুঁজিবাদ ব্যর্থ হওয়া মানে এই নয় যে এর পতন ও ভাঙন আসন্ন।[২] তবে এর অর্থ হলো এটি শুরুর দিকে ঐতিহাসিকভাবে প্রয়োজনীয় ও সৃজনশীল ব্যবস্থা ছিল, কিন্তু এখনকার বাস্তবতায় তা অপ্রয়োজনীয় ও ধ্বংসাত্মক ব্যবস্থায় পরিণত হয়েছে। আজকের পৃথিবী আগের যেকোনো সময়ের তুলনায় এক যুগসন্ধির বাস্তবতার সম্মুখীন হয়েছে, তার সামনে দুটি বিকল্প, 'একদিকে সমাজের বিপ্লবী পুনর্গঠন আর অন্যদিকে বিবদমান শ্রেণির ধ্বংস'।[৩]

ব্যাপারটা হলো, পুঁজিবাদের ধ্বংসের লক্ষণ কিন্তু সবখানেই দেখা যাচ্ছে। তথাকথিত মুক্তবাজার বিনিয়োগ স্থবিরতায় ধুঁকছে, সঙ্গে আছে আর্থিক বাজারের

● অনুবাদ : **প্রতীক বর্ধন**

বুদ্‌বুদের মতো ফুলে-ফেঁপে ওঠা, যে বুদ্‌বুদ আবার একসময় ফেটেও যায়।[৪] আয় ও সম্পদের বৈষম্য এমন পর্যায়ে গেছে যে সিংহভাগ মানুষের বস্তুগত অবস্থা পড়তির দিকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শ্রমিকের উৎপাদনশীলতা গত ৪০ বছরে অনেক বাড়লেও শ্রমিকের প্রকৃত মজুরি বাড়েনি বললেই চলে।[৫] কাজ আরও নিবিড় হয়েছে, কিন্তু একই সঙ্গে আবার কর্মীর নিরাপত্তা ও কর্ম সুরক্ষা কমেছে। এখন আবার গিগ অর্থনীতির যুগ শুরু হয়েছে, অর্থাৎ মানুষের নির্দিষ্ট কোনো কাজ নেই, সে সকালে এক কাজ করবে এবং বিকেলে আরেক কাজ। এটি এক ধরনের প্রাতিষ্ঠানিক বেকারত্ব। এ কারণে যেটা হয়েছে, তা হলো বেকারত্ববিষয়ক তথ্য-উপাত্ত একরকম অকার্যকর হয়ে গেছে।[৬] কারখানায় বা কার্যালয়ে পুঁজিবাদের একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ কায়েম হয়েছে, ফলে একসময় ট্রেড ইউনিয়নের যে গৌরব ছিল, তা আজ হৃত। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন হয়েছে এবং সেই সঙ্গে 'স্বাধীন পুঁজিবাদের' নতুন বাস্তবতায় ইউরোপের সামাজিক গণতন্ত্র ক্ষয়ে গেছে।[৭]

বহুজাতিক কোম্পানিগুলো বিশ্বের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। এরা শ্রমশক্তিকে অতিমাত্রায় শোষণ করে সব নিংড়ে বের করে নিচ্ছে। এতে বিশ্ব অর্থনীতির কেন্দ্রগুলোতে বিপুল পরিমাণ আর্থিক সম্পদ জড়ো হচ্ছে। অন্যদিকে প্রান্তিক অঞ্চলগুলোতে সৃষ্টি হচ্ছে দারিদ্র্য।[৮] আজ ক্যারিবীয় দ্বীপপুঞ্জের নিরাপদ কর অঞ্চলগুলোতে বিভিন্ন দেশের ধনীরা সম্পদ পাচার করতে করতে ২১ ট্রিলিয়ন ডলার পাঠিয়ে দিয়েছে। এটা এখন 'বড় পুঁজির নিরাপদ ঘাঁটিতে পরিণত হয়েছে'।[৯] যোগাযোগ বিপ্লবের কারণে প্রযুক্তিভিত্তিক একচেটিয়াত্ব গড়ে উঠেছে। এটি যুক্ত হয়েছে ওয়াল স্ট্রিটভিত্তিক সন্দেহজনক সম্পদের সঙ্গে। এই দুইয়ে মিলে বিশ্বের 'শীর্ষ ১ শতাংশ' ধনীর সম্পদ আরও বাড়ছে। আজ বিশ্বের শীর্ষ ৪২ জন বিলিয়নিয়ার বা ধনকুবেরের সম্পদের পরিমাণ বিশ্বের অর্ধেক মানুষের সম্পদের সমান। আর সবচেয়ে ধনী তিন মার্কিন ধনকুবের অর্থাৎ জেফ বেজোস, বিল গেটস ও ওয়ারেন বাফেটের সম্পদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্ধেক মানুষের সম্পদের চেয়ে বেশি।[১০] সাম্প্রতিক দশকগুলোতে বিশ্বের সবখানেই অসমতা বেড়েছে।[১১] বিশ্বের ধনীতম ও দরিদ্রতম মানুষের আয় ও সম্পদবৈষম্য আবারও দ্রুতগতিতে বাড়ছে।[১২] এই মুহূর্তে যারা কোনো না কোনো কাজের সঙ্গে যুক্ত, পৃথিবীতে সেই মানুষদের ৬০ শতাংশের বেশি অনানুষ্ঠানিক খাতে কাজ করছে। এরাই আজ এক বৃহৎ প্রলেতারিয়েত শ্রেণি হয়ে উঠেছে। দেখা গেছে, বিশ্বের আনুষ্ঠানিক খাতে কর্মরত কর্মীদের চেয়ে অনানুষ্ঠানিক খাতে কর্মরত শ্রমিকদের সংখ্যা ৭০ শতাংশ বেশি।[১৩]

আজ শুধু দরিদ্র অঞ্চলেই নয়, উত্তর আমেরিকার মতো সচ্ছল অঞ্চলেও মানুষ পর্যাপ্ত স্বাস্থ্যসেবা, গৃহায়ণ, শিক্ষা, পরিষ্কার পানি ও বিশুদ্ধ বায়ু পাচ্ছে না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ অন্যান্য অঞ্চলে অটোমোবাইলের ব্যবহার বাড়ার কারণে পরিবহনব্যবস্থা

অপ্রতুল ও কঠিন হয়ে পড়ছে। গণযোগাযোগব্যবস্থা থেকে বিনিয়োগ উঠে যাওয়ার কারণেও এমনটি ঘটছে। নগরকাঠামো দিনকে দিন আরও বিচ্ছিন্ন ও সচ্ছল মানুষের উপযোগী হয়ে উঠছে। ফলে শহর ক্রমেই পয়সাওয়ালা মানুষের খেলনা হয়ে উঠছে, যেখানে গরিব মানুষেরা ঠাঁই পাচ্ছে না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি রাতে প্রায় ৫০ লাখ মানুষ গৃহহীন অবস্থায় রাত কাটায়, যাদের বেশির ভাগই আবার শিশু।[১৪] তাপমাত্রা বাড়ার কারণে যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক শহরে ইঁদুরের ব্যাপক উপদ্রব শুরু হয়েছে। এটি শুধু নিউইয়র্ক নয়, সারা পৃথিবীরই বৈশিষ্ট্য।[১৫]

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ অন্যান্য উচ্চ আয়ের দেশে গড় আয়ু কমছে। সেই ভিক্টোরীয় যুগে দারিদ্র্য ও শোষণজনিত যেসব রোগবালাই হতো, সেগুলোরও পুনঃ প্রাদুর্ভাব দেখা যাচ্ছে। ব্রিটেনের মতো দেশে গেঁটেবাত, স্কারলেট ফিভার, হুপিং কাশি ও স্কার্ভির মতো রোগ আবার দেখা যাচ্ছে; সঙ্গে আছে যক্ষ্মা। কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তাজনিত যথাযথ ব্যবস্থা না নেওয়ার কারণে যুক্তরাষ্ট্রের কয়লাখনি অঞ্চলে ফুসফুসের কালো রোগ আবার বেড়েছে।[১৬] পুঁজিবাদী কৃষি ব্যবসার কারণে অ্যান্টিবায়োটিকের অতি ব্যবহার হচ্ছে, আর এতে মানুষের শরীরে অ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধক্ষমতা তৈরি হচ্ছে। জন্ম হচ্ছে বিপজ্জনক সুপারবাগের। বাড়ছে মৃত্যুর সংখ্যা। এই শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে গিয়ে হয়তো দেখা যাবে, অ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধক্ষমতাজনিত মৃত্যুর সংখ্যা ক্যানসারজনিত কারণে মৃত্যুকে ছাড়িয়ে যাবে। তখন হয়তো বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা 'বৈশ্বিক স্বাস্থ্য পরিস্থিতি' জারি করতে বাধ্য হবে।[১৭] এ ব্যবস্থা থেকেই এই ভয়ানক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। ব্যাপারটা হলো, ফ্রেডরিখ এঙ্গেলস 'কন্ডিশন অব দ্য ওয়ার্কিং ক্লাস ইন ইংল্যান্ড' শীর্ষক প্রবন্ধে যা বলেছিলেন, তার সঙ্গে এর যথেষ্ট মিল আছে—সামাজিক হত্যা বা সোশ্যাল মার্ডার।

বিশালাকার করপোরেশন, মানবহিতৈষী-পুঁজিবাদী ফাউন্ডেশন ও নব্য উদারনীতিবাদী সরকারের প্ররোচনায় সরকারি শিক্ষা করপোরেট পরীক্ষা-নিরীক্ষানির্ভর হয়ে উঠেছে। রোবটিক প্রযুক্তির মানের ভিত্তিতে এটি করা হচ্ছে। এই প্রক্রিয়ায় ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে বিপুল পরিমাণ তথ্যভান্ডার গড়ে উঠছে, যার অনেক কিছুই এখন চুপিচুপি বাজারজাত ও বিক্রি হচ্ছে।[১৯] শিক্ষাব্যবস্থার করপোরেটাইজেশন ও বেসরকারীকরণ শিক্ষার্থীদের চাহিদাকে বাজারের পণ্যে পরিণত করেছে। তাই আমরা ঔপন্যাসিক চার্লস ডিকেন্সের *হার্ড টাইমস* উপন্যাসে টমাস গ্রাদগ্রিন্দস ও এমচোকুমচাইল্ডসের ডাঁহা উপযোগবাদী দর্শনের পুনর্জাগরণ দেখলাম : 'জীবনে শুধু সত্যেরই প্রয়োজন হয়' এবং 'তোমার কখনো কল্পনা করার দরকার নেই'।[২০] মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে দরিদ্র ও বর্ণে বিভক্ত বিদ্যালয়গুলো বুদ্ধিবৃত্তিক কয়েদখানায় পরিণত হয়েছে। এগুলো এখন কারাগারের বা সামরিক বাহিনীর পাইপলাইনে পরিণত হয়েছে।[২১]

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ২০ লাখের বেশি মানুষ এখন কারাবন্দী, পৃথিবীর আর কোনো দেশে এত মানুষ কারাগারে নেই। এটা এক নতুন জিম ক্রো হয়ে উঠেছে। এই কারাবন্দী মানুষের সংখ্যা টেক্সাসের হিউস্টন শহরের জনসংখ্যার প্রায় সমান। এই কারাবন্দীদের মধ্যে আফ্রিকান-মার্কিন ও লাতিনোদের সংখ্যা প্রায় ৩২ শতাংশ। প্রাপ্তবয়স্কদের মার্কিন জনগণের মধ্যে অর্ধেক বা আফ্রিকান-মার্কিনদের মধ্যে তার চেয়ে বেশিসংখ্যক মানুষের অন্তত একজন আত্মীয় এখন কারাবন্দী। আর পুলিশের গুলিতে শ্বেতাঙ্গদের মৃত্যুর যত না আশঙ্কা, তার চেয়ে তিন গুণ বেশি আশঙ্কা স্থানীয় মার্কিন ও কালোদের; আর হিস্পানিকদের আশঙ্কা দ্বিগুণ।[২২] বর্ণগত বিভাজন তো পুরো পৃথিবীতেই বাড়ছে।

নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা বাড়ছে এবং তাঁদের মূল্যহীন শ্রমশোষণও চলছে। বলা যায়, পুঁজিবাদী সমাজের ক্ষমতাকাঠামো এভাবেই গড়ে ওঠে। এভাবেই সে মানুষে মানুষে বিভাজন তৈরি করে, তাদের ঐক্যবদ্ধ করে না। পৃথিবীর এক-তৃতীয়াংশের বেশি নারী শারীরিক ও যৌন সহিংসতার সম্মুখীন হয়েছে। বিশেষ করে নারীর শরীরকে বানানো হয়েছে পণ্য, পুঁজিবাদী বাজারের স্বাভাবিক একচেটিয়া প্রবণতার কারণেই তা হয়েছে।[২৩]

গণমাধ্যমভিত্তিক প্রচারণাব্যবস্থা, এর কথা আর কী বলব! এটি বৃহত্তর করপোরেট ম্যাট্রিক্সের অংশ; এখন সেটা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমভিত্তিক প্রচারণার মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে, যে যোগাযোগমাধ্যম আবার দৃশ্যত সেকেলে এবং অনেক সূক্ষ্ম রন্ধ্রযুক্ত। সেই মাধ্যম এখন অনেক বেশি বিশ্বজনীন এবং তা আগের চেয়ে আরও বেশি হারে ক্ষমতা ও টাকাকে আঁকড়ে ধরছে। আধুনিক বিপণন ও নজরদারি ব্যবস্থা অনুসরণ করে কায়েমি স্বার্থবাদী গোষ্ঠীগুলো এখন আরও সুচারুরূপে নিজেদের বার্তা ছড়িয়ে দিতে পারছে। এর একটি বড় অংশই অনিয়ন্ত্রিত। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে গেছে যে সব পক্ষের মানুষ এখন 'ভুয়া খবর' নিয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে।[২৪] ভোটারদের প্রভাবিত করার মতো প্রতিষ্ঠান সারা পৃথিবীতেই গড়ে উঠছে। যে পক্ষ বেশি টাকা দিচ্ছে, এরা তাদেরই সেবা দিচ্ছে।[২৫] মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ইন্টারনেট-ব্যবস্থার নিরপেক্ষতা নেই বললেই চলে। এর অর্থ হলো, পুরো ইন্টারনেট-ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ একচেটিয়া সেবাদাতাদের হাতে কেন্দ্রীভূত হয়ে পড়েছে।

নির্বাচনও এখন আর নির্বাচন নেই। করপোরেট ও ধনিকগোষ্ঠীর অনিয়ন্ত্রিত 'কালো টাকার' প্রভাবে নির্বাচন স্বরূপ হারিয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিজেকে পৃথিবীর সবচেয়ে গণতান্ত্রিক দেশ হিসেবে দাবি করলেও পল বারান ও পল সুইজি সেই ১৯৬৬ সালে 'মনোপলি ক্যাপিটাল' শীর্ষক প্রবন্ধে বলেছিলেন, যুক্তরাষ্ট্র 'আধারের দিক থেকে গণতান্ত্রিক হলেও আধেয়র দিক থেকে ধনিকতান্ত্রিক।'[২৬] ট্রাম্প প্রশাসনও যুক্তরাষ্ট্রের দীর্ঘদিনের প্রথা মেনে ৭২ শতাংশ মন্ত্রী নিয়োগ দিয়েছে করপোরেট গোষ্ঠী

থেকে, বাকিরা এসেছে সামরিক বাহিনী থেকে।[২৭]

তেলের জন্য কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ অন্যান্য বড় শক্তি চিরস্থায়ী যুদ্ধের বন্দোবস্ত করে রেখেছে। এই যুদ্ধ আবার বৈশ্বিক তাপপারমাণবিক যুদ্ধে মোড় নিতে পারে, এমন আশঙ্কাও আছে। ওবামা প্রশাসনের সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সাতটি দেশে বোমাবর্ষণ করেছে বা যুদ্ধ চালিয়েছে। এই দেশগুলো হলো আফগানিস্তান, ইরাক, সিরিয়া, লিবিয়া, ইয়েমেন, সোমালিয়া ও পাকিস্তান।[২৮] যাঁদের সন্ত্রাসী আখ্যা দেওয়া হয়, তাঁদের নির্যাতন বা হাপিশ করে দেওয়ার রীতি আবারও প্রতিষ্ঠিত করেছে যুক্তরাষ্ট্র, যুদ্ধাস্ত্র হিসেবে প্রয়োগ করছে এসব তারা। রাশিয়ার সঙ্গে আবারও যুক্তরাষ্ট্রের স্নায়ু ও পারমাণবিক যুদ্ধ শুরু হলো বলে। এদিকে যুক্তরাষ্ট্র আবার চীনের উত্থানে বাদ সাধতে চাইছে। ট্রাম্প প্রশাসন সামরিক বাহিনীর মহাশূন্য বাহিনী গঠন করেছে। মহাশূন্যকে সামরিকীকরণের যে প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে, সেই খেলায় প্রভুত্ব করতেই যুক্তরাষ্ট্রের এই ব্যবস্থা। পারমাণবিক যুদ্ধের ক্রমবর্ধমান ভীতি ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সমস্যা মোকাবিলায় বুলেটিন অব অ্যাটমিক সায়েন্টিস্টস ২০১৮ সালে ডুমস ডে ক্লক মধ্যরাতের দুই মিনিট আগে সরিয়ে এনেছে, ১৯৫৩ সালের পর যা সবচেয়ে কাছের। সেবার তাপপারমাণবিক অস্ত্রের আগমন ঘোষণা করা হয়েছিল।[২৯]

এদিকে ভেনেজুয়েলা ও নিকারাগুয়ার মতো দেশগুলো গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচন করলেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এদের ওপর নিষেধাজ্ঞা দিয়েই যাচ্ছে। অথবা বলা যায়, নির্বাচনের জন্যই তাদের ওপর এই নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হচ্ছে। বড় বড় দেশগুলো সক্রিয়ভাবে বাণিজ্য ও মুদ্রাযুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে। অন্যদিকে অভিবাসনের বিরুদ্ধে ইউরোপ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বর্ণবাদী প্রতিরোধ গড়ে উঠছে। অথচ পৃথিবীতে এখন ৬ কোটি শরণার্থী ও অভ্যন্তরীণভাবে বাস্তুচ্যুত মানুষ বিপর্যস্ত জলবায়ু ও পরিবেশ থেকে বাঁচতে ঘর ছেড়েছে। সারা পৃথিবীতে আজ শরণার্থীর সংখ্যা ২৫ কোটিতে পৌঁছেছে। তাদের মধ্যে যারা উচ্চ আয়ের দেশগুলোতে বসবাস করছে, তারা সেসব দেশের মোট জনসংখ্যার ১৪ শতাংশ, ২০০০ সালে যা ছিল ১০ শতাংশের কম। শাসকশ্রেণি ও ধনী দেশগুলো নিজেদের ক্ষমতার কেন্দ্রগুলো সুরক্ষিত রাখতে চায়, সুবিধাপ্রাপ্ত শ্রেণি হিসেবে তারা মানবতার বড় অংশ থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন রাখতে চায়। আর এই হতভাগ্য মানুষদের ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দিতে চায় তারা।

বিশ্বের জনসংখ্যার ১০ শতাংশের বেশি মানুষ চরম অপুষ্টিতে ভুগছে।[৩০] মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মানুষের খাদ্যচাপ বাড়ছেই। ফলে নিম্নমানের ও বিষাক্ত খাবার বিক্রি করে, এমন দোকানের সংখ্যা বাড়ছেই। আজ যুক্তরাষ্ট্রের চার কোটি মানুষ খাদ্যনিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। এর মধ্যে ১ কোটি ৩০ লাখই শিশু, অর্থাৎ সব মিলিয়ে প্রতি আট পরিবারের একটি পরিবার খাদ্যনিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে।[৩১] কৃষি ব্যবসার

কারণে চাষাবাদনির্ভর কৃষকেরা টিকে থাকতে পারছে না। ব্যক্তিগত পুঁজি ও সার্বভৌম সম্পদ তহবিল বৈশ্বিকভাবে কৃষকবিরোধী তৎপরতা শুরু করেছে। পরিণামে ইতিহাসে মানুষের সবচেয়ে বৃহৎ স্থানান্তর শুরু হয়েছে।[৩৩] শহরে মানুষের আগমন ও দারিদ্র্য এত বেড়ে গেছে যে এই ধরিত্রীকে যৌক্তিকভাবেই 'বস্তির পৃথিবী' আখ্যা দেওয়া যায়।[৩৪] আবার বৈশ্বিক গৃহায়ণ বাজারের আকার ১৬৩ ট্রিলিয়ন ডলারে উঠেছে (পৃথিবীতে এযাবৎকাল সোনার খনির ব্যবসার পরিমাণ ছিল ৭ দশমিক ৫ ট্রিলিয়ন ডলার)।[৩৫]

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর মানুষের অর্থনৈতিক তৎপরতা এত বেড়ে গেছে যে জলবায়ুতে এর সুদূরপ্রসারী প্রভাব পড়ছে। এতে ধরিত্রীর সীমানায় বিশাল ফাটল ধরেছে। একদিকে জলবায়ু পরিবর্তন হচ্ছে, অন্যদিকে সাগরে অ্যাসিড বাড়ছে, ভেঙে পড়ছে নাইট্রোজেন ও ফসফরাস চক্র, কমছে সুপেয় পানি, উজাড় হচ্ছে বন। এখানেই শেষ নয়, এ প্রক্রিয়ায় বিষাক্ত রাসায়নিক ও তেজস্ক্রিয় বিষক্রিয়া ছড়াচ্ছে।[৩৬] হিসাব করে দেখা গেছে, বিশ্বের ৬০ শতাংশ বন্য মেরুদণ্ডী প্রাণী ১৯৭০ সালের পর হারিয়ে গেছে। আর সাম্প্রতিক কয়েক দশকে অমেরুদণ্ডী প্রাণীর ৪৫ শতাংশ হারিয়ে গেছে।[৩৭] আবহাওয়া বিশারদ জেমস হ্যানসেন একে 'প্রজাতির বিলোপ' হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন। জলবায়ু পরিবর্তন ও জলবায়ু অঞ্চলের ধারাবাহিক পরিবর্তনের কারণে জীববৈচিত্র্য কমে যাওয়ার হার বেড়েছে। জীববিজ্ঞানীরা ধারণা করছেন, এই শতকের শেষ নাগাদ প্রজাতির অর্ধেক হারিয়ে যাবে।[৩৮]

আর জলবায়ু পরিবর্তনের এই হার যদি বজায় থাকে, তাহলে বৈশ্বিক গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধির হার ২ শতাংশের মধ্যে রাখার যে বাজেট, তা আর টিকবে না (তবে এক দশকের মধ্যে লক্ষ্যমাত্রা ১ দশমিক ৫ শতাংশের মধ্যে নেমে আসবে, জলবায়ুর দীর্ঘমেয়াদি স্থিতিশীলতার জন্য এটি জরুরি)। ধরিত্রীব্যবস্থার বিশেষজ্ঞ বিজ্ঞানীরা মনে করেন, আমাদের এই পৃথিবী খুবই বিপজ্জনকভাবে হট হাউস আর্থের কাছাকাছি চলে এসেছে, যে পরিস্থিতিতে মারাত্মক প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটবে এবং যেখান থেকে ফেরার আর পথ থাকবে না।[৩৯] ব্যাপারটা হলো, কার্বন নিঃসরণের হার বছরে ২ শতাংশ হারে বৃদ্ধি চলতে থাকলে (২০১৮ সালে বৈশ্বিক হার ছিল ২ দশমিক ৭ শতাংশ আর যুক্তরাষ্ট্রে ছিল ৩ দশমিক ৪ শতাংশ) এবং বিপর্যয় এড়ানোর জন্য বছরে ৩ শতাংশ হারে নিঃসরণ কমানোর লক্ষ্যমাত্রা পূরণে ব্যর্থ হলে তার পরিণতি যে কী হবে, তা অকল্পনীয়।[৪০]

এসব সত্ত্বেও বড় বড় জ্বালানি কোম্পানিগুলো জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে মিথ্যা কথা বলেই যাচ্ছে। তারা ক্রমেই অস্বীকারের সংস্কৃতি তৈরি করছে, যদিও অভ্যন্তরীণ নথিপত্রে তা স্বীকার করছে এরা। এরা জীবাশ্ম জ্বালানি আহরণ ও উৎপাদনে জোর দিচ্ছে। এমনকি সবচেয়ে বেশি দূষণকারী ও গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণকারী জীবাশ্ম

জ্বালানি উৎপাদনেও এরা পিছপা হচ্ছে না। বলাই বাহুল্য, এই প্রক্রিয়ায় এরা বিপুল মুনাফা করে নিচ্ছে। আর্কটিকের বরফ গলা এদের কাছে নতুন এল ডোরাডোর মতো। এটি তাদের কাছে নতুন তেল ও গ্যাসক্ষেত্র উন্মোচিত হওয়ার মতো। ধরিত্রীর দিকে খেয়াল না করেই এরা সেই তেল-গ্যাস আহরণ করতে চায়। জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে বৈজ্ঞানিক প্রতিবেদনের জবাবে এক্সন মবিল বলেছে, তাদের কাছে যত জীবাশ্ম জ্বালানি আছে, পুরোটা তারা বিক্রি করে দিতে চায়।[৪১] জ্বালানি করপোরেশনগুলো জলবায়ুবিষয়ক আলোচনায় হস্তক্ষেপ করেই যাচ্ছে, কেননা তারা চায়, কার্বন নিঃসরণ কমানোর সব আয়োজনই যেন নখর-দন্তহীন হয়ে পড়ে। পৃথিবীর সব পুঁজিবাদী দেশ জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলা বা কার্বন নিঃসরণ কমানোর চেয়ে ধনসম্পদ আহরণেই বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে। এতে যে মানবতার ভবিষ্যৎই হুমকির মুখে পড়ছে, সেই খেয়াল এদের নেই।

পুঁজিবাদ হলো এমন এক ব্যবস্থা, যেখানে প্রতিযোগিতামূলক উৎপাদন ও বিনিময়ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে পুঁজির ব্যক্তিগত সঞ্চয় এবং উদ্বৃত্ত মূল্যের ব্যক্তিগত ব্যবহার হয় (শ্রমিকের জীবনযাপনের জন্য প্রয়োজনীয় অংশটুকুর বাইরে)। এ ব্যবস্থায় পণ্য বা সেবা বাজারব্যবস্থার মধ্য দিয়ে যাওয়ার ফলে আয় সৃষ্টি করে। এই মূল্যায়নে যেটা ঘটে, তা হলো বাজারের বাইরে উৎপাদনের সামাজিক ও পরিবেশগত মূল্য এই প্রক্রিয়ার বাইরে থেকে যায় এবং তাকে শুধু নেতিবাচক 'বাহ্যিকতা' হিসেবে দেখা হয়, যার সঙ্গে পুঁজিবাদের সম্পর্ক নেই, তা সে প্রকৃতির ধ্বংসের ক্ষেত্রেই হোক বা মানুষের জীবনের জীবনমানের বেলাতেই হোক। পরিবেশবাদী অর্থনীতিবিদ কে উইলিয়াম কাপ বলেছেন, পুঁজিবাদকে অবশ্যই অপরিশোধিত মূল্যের অর্থনীতি হিসেবে বিবেচনা করা উচিত।[৪২]

এখন কথা হলো, আজ একুশ শতকে দাঁড়িয়ে আমরা এমন এক জায়গায় পৌঁছে গেছি, যেখানে এই অযৌক্তিক ব্যবস্থার বাহ্যিকতা, যেমন যুদ্ধের খরচ, প্রাকৃতিক সম্পদের ধ্বংস, জীবনের অপচয় ও ধরিত্রীর পরিবেশ বিপর্যয়—সবকিছুর মূল্য এখন পুঁজিবাদের সামাজিক অবদানের চেয়ে বেশি হয়ে গেছে। এখন পুঁজি ও সম্পদ সংগৃহীত হচ্ছে সামাজিক ও পরিবেশগত এমন অপূরণীয় ক্ষতির বিনিময়ে, যার ফলে ধরিত্রীতে মানুষের জীবনযাপনই অসম্ভব হয়ে উঠতে পারে।[৪৩]

অনেকেই বিতর্ক করতে পারেন এ কথা ভেবে যে চীন এর বিকল্প, যার অর্থনৈতিক উন্নয়নের নজির দ্বিতীয়টি খুঁজে পাওয়া ভার, যদিও এতে সমাজ ও প্রতিবেশে গভীর পরিবর্তন ঘটছে। তবে চীনা উন্নয়নের শেকড় ১৯৪৯ সালের বিপ্লবের মধ্যে, যার নেতৃত্বে ছিল মাও সে-তুংয়ের নেতৃত্বাধীন চীনা কমিউনিস্ট পার্টি, যার বদৌলতে সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থা থেকে বেরিয়ে এসেছিল দেশটি। এতে বাইরের হস্তক্ষেপ ছাড়া দীর্ঘদিন এর পক্ষে পরিকল্পিত অর্থনীতির মধ্য দিয়ে উন্নয়ন করা সম্ভব হয়েছে। কিন্তু

মাও সে-তুংয়ের পর দেশটিতে সংস্কার শুরু হয়, এতে এর কৃষি ও শিল্পের ভিত দাঁড়িয়ে যায়। তখন থেকে দেশটি রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা ও বাজারব্যবস্থায় সংমিশ্রণে চলতে শুরু করে, একই সঙ্গে তার ঋণ ও ছায়বাজারও (স্পেকুলেশন) বড় হতে থাকে। তবে ধীরে ধীরে বাজারই বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এখন বাণিজ্যযুদ্ধের মধ্য দিয়ে চীনের অর্থনীতির রাশ টেনে ধরতে চাইছে, তাকে চ্যালেঞ্জ করছে। ফলে চীনের এখন মুমূর্ষ পুঁজিবাদের সুযোগ নিয়ে সফল হওয়ার যতটা না সম্ভাবনা, তার চেয়ে বেশি সম্ভাবনা হচ্ছে এই সীমাবদ্ধতার খপ্পরে পড়ার। বর্তমান চীনা মডেলে এখন পুঁজি সংগ্রহের অনেক ধ্বংসাত্মক প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। চূড়ান্ত অর্থে বললে, এখন চীনের সম্ভাবনা নির্ভর করছে তার বিপ্লবী রূপান্তরের যুগে ফেরত যাওয়ার মধ্যে, যার চালিকাশক্তি হবে তার নিজের জনগণ।[৪৪]

কথা হলো, পুঁজিবাদের এই ধ্বংসাত্মক প্রবণতা কীভাবে গড়ে উঠল? ২০ শতকে পুঁজিবাদের ব্যর্থতা বুঝতে হলে আমাদের নব্য উদারনীতিবাদের ঐতিহাসিক পর্যবেক্ষণ করতে হবে, অর্থাৎ এটি কীভাবে এই ব্যবস্থার ধ্বংসোন্মুখ প্রবণতাকে আরও তীব্র করেছে। তাহলেই কেবল আমাদের পক্ষে ২১ শতকের ভবিষ্যৎ আমলে নেওয়া সম্ভব হবে।

নব্য উদারনীতিবাদ ও পুঁজিবাদের ব্যর্থতা

পুঁজিবাদের যে ব্যর্থতার কথা এতক্ষণ বললাম, তা সবাই জানে। তথাপি অনেক সময় এই ব্যর্থতার দায় কখনো কখনো শুধু নব্য উদারনীতিবাদের ঘাড়ে চাপানো হয়, ব্যবস্থা হিসেবে পুঁজিবাদের ঘাড়ে নয়। অনেকেই মনে করেন, নব্য উদারনীতিবাদের চেয়ে উন্নত ও বিকল্প ব্যবস্থা আছে। আবার বামপন্থীদের মধ্যে অনেকেই মনে করেন, এর বিকল্প হচ্ছে উদার পুঁজিবাদ : নিয়ন্ত্রিত বাজার, কল্যাণমূলক রাষ্ট্র বা একধরনের সীমিত আকারের সামাজিক গণতন্ত্র। তাঁরা অধিকতর যৌক্তিক পুঁজিবাদের স্বপ্ন দেখেন। অর্থাৎ সমস্যাটা তাঁদের কাছে নব্য উদারনীতিবাদের, পুঁজিবাদী ব্যবস্থার নয়।

এর বিপরীতে মার্ক্সবাদী ধারার কাছে নব্য উদারনীতিবাদ হলো পুঁজিবাদের ক্ষয়িষ্ণু ধাঁচের একধরনের অভ্যন্তরীণ বিকাশ, যার সঙ্গে লগ্নি পুঁজির সম্পর্ক আছে। সে জন্য নব্য উদারনীতিবাদের ঐতিহাসিক ও সমালোচনামূলক বিশ্লেষণ জরুরি। প্রথমত, পুঁজিবাদের আজকের রূপের বোঝাপড়ার জন্য যেমন এটি জরুরি, তেমনি নব্য উদারনীতিবাদের বিকল্প হিসেবে যে কোনো কিছু কাজ করবে না, সেই বোধের উন্মেষের জন্যও এটি জরুরি।

নব্য উদারনীতিবাদ—এই শব্দবন্ধের জন্ম ১৯২০-এর দশকের শুরুর দিকে। মার্ক্সবাদের সমালোচক লুডউইগ ভন মিসেজের *নেশন, স্টেট অ্যান্ড ইকোনমি* (১৯১৯) এবং *সোশ্যালিজম : অ্যান ইকোনমিক অ্যান্ড সোশিওলজিক্যাল অ্যানালিসিস* (১৯২২)

শীর্ষক গ্রন্থ দুটোয় তিনি প্রথম এই শব্দবন্ধ ব্যবহার করেন। দুটি গ্রন্থই অত্যন্ত সমাজতন্ত্রবিরোধী। এই দুটি রচনার মধ্যেই নব্য উদারনীতিবাদী আদর্শ নিহিত আছে।[৪৫] ভিয়েনা চেম্বার অব কমার্স কর্তৃক নিয়োজিত হয়ে মিজেস এই দুটি রচনায় বললেন যে সমাজতন্ত্রকে পরাজিত করতে 'পুরোনো ধাঁচের' উদারনীতি নতুন করে রচনা করতে হবে। এটা করতে গিয়ে সমাজতন্ত্রকে তিনি ধ্বংসের সঙ্গে তুলনা করেন। বললেন, মুক্ত প্রতিযোগিতার সঙ্গে একচেটিয়াতন্ত্র এঁটে যায়, এরা সাংঘর্ষিক হয়। লাগামহীন অসমতার পক্ষে দাঁড়িয়ে তিনি বললেন, ভোক্তারা বাজার থেকে কিছু কেনার মাধ্যমেই নিজের স্বাধীনতা প্রয়োগ করেন, যা নাকি ব্যালটের সমতুল্য। তিনি শ্রমিকের জন্য আইন, বাধ্যতামূলক সামাজিক বিমা, ট্রেড ইউনিয়ন, বেকারত্ব ভাতা, জাতীয়করণ, কর, মূল্যস্ফীতি—এগুলোকে নবরূপের উদারনীতিবাদের শত্রু ঘোষণা করেন।[৪৬] তিনি এত চরম জায়গায় চলে গিয়েছিলেন যে চার্লস ডিকেন্সের *হার্ড টাইমস* উপন্যাসের নায়িকা সিসি জুপের তীব্র সমালোচক এমচোয়াকুমচাইল্ডের পক্ষাবলম্বন করেন। মিজেসের দাবি, ডিকেন্স 'লাখ লাখ মানুষকে উদারনীতিবাদ ও পুঁজিবাদ ঘৃণা করতে' শিখিয়েছেন।[৪৭]

১৯২১ সালে অস্ট্রীয় মার্ক্সবাদী ম্যাক্স অ্যাডলার এই নব্য উদারনীতিবাদ শব্দবন্ধটি ব্যবহার করেন। মূলত মিজেস যে ক্ষয়িষ্ণু উদারনীতিবাদী ব্যবস্থাকে নতুন আদর্শ ও বাজার ফেটিশিজমের মধ্য দিয়ে পুনর্জাগ্রত করতে চাইছিলেন, সেই প্রক্রিয়াকেই তিনি নব্য উদারনীতিবাদ বলে আখ্যা দেন। এরপর আরেক অস্ট্রীয় মার্ক্সবাদী হেলেন বয়্যার ১৯২৩ সালে মিজেসের এই প্রচেষ্টার তীব্র সমালোচনা করেন। ১৯২৪ সালে জার্মান-মার্ক্সবাদী আলফ্রেড মিউসেল মিজেসের নব্য উদারনীতিবাদের দীর্ঘ সমালোচনা করেন।[৪৮]

মার্ক্সবাদী বিশ্লেষণে ভর করে অ্যাডলার, বয়্যার ও মিউসেল মিজেসের এ দাবির তীব্র সমালোচনা করেন যে পুঁজিবাদ একমাত্র যৌক্তিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও সমাজতন্ত্র ধ্বংসের সমার্থক। মিজেস যে ইতিহাস পরিপন্থী এবং মুক্তবাণিজ্য ও মুক্ত বিনিময়ের মাধ্যমে এক সামঞ্জস্যপূর্ণ পুঁজিবাদের চিত্র আমাদের সামনে হাজির করেছিলেন, তাঁরা সে ব্যবস্থার তীব্র সমালোচনা করেন। স্বনির্ভর বাজারের নামে মিজেস রাষ্ট্র কর্তৃক শ্রমিক আন্দোলন দমনের সমর্থন করেছেন ঠিকই, কিন্তু আবার শ্রমিকের পক্ষে রাষ্ট্রের কিছু করার প্রচেষ্টাকে তিনি মুক্তবাজারবিরোধী হিসেবে সমালোচনা করেছেন। মিউসেল মিজেসকে চলমান পুঁজির বা আন্তর্জাতিক পুঁজির বিশ্বস্ত সেবক হিসেবে চিত্রিত করেছেন। ১৯২৬ সালের শেষ দিকে এক নব্য ফ্যাসিস্ট অর্থনীতিবিদ ওথমার স্প্যান পুরোনো বা ধ্রুপদি ধাঁচের উদারনীতিবাদে ফেরত যাওয়ার প্রবণতার সমালোচনা করেন।[৪৯] ১৯২৭ সালে উদারনীতিবাদ শীর্ষক এক রচনায় মিজেস 'পুরোনো উদারনীতিবাদ ও নব্য উদারনীতিবাদের' মধ্যে পার্থক্য রচনা

করেন। বলা বাহুল্য, পুরোনো উদারনীতিবাদ ধারাটি যেখানে সমতামুখী, নব্য উদারনীতিবাদ সেখানে সমতাকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করে। সেখানে সুযোগের সমতার তথাকথিত নীতি নেই।[৫০]

এই যে মিজেসের কলম থেকে নব্য উদারনীতিবাদের তত্ত্ব বের হলো, ১৯২০-এর দশকে মার্ক্সবাদী সমালোচকদের দৃষ্টিতে তা হলো একচেটিয়াতন্ত্র বা লগ্নিপুঁজিকে যৌক্তিক করার চেষ্টা, যা উদারতাবাদ থেকে যোজন যোজন দূরে। শুধু সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে পুঁজিবাদী শ্রেণিকে লড়াই চালানোর জন্য বুদ্ধিবৃত্তিক ভিত দেওয়ার লক্ষ্যে এটা করা হয়েছে, তা নয়, বরং সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ও সামাজিক গণতন্ত্রের সব প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে এটা করা হয়েছে, অর্থাৎ শ্রমিকশ্রেণিকে ন্যূনতম জায়গা না দেওয়া এর লক্ষ্য।

এই সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে মিজেসের আক্রমণ, তা অনেকটা রেড ভিয়েনা ও অস্ট্রো-জার্মান সমাজতন্ত্রীদের তাঁর মোহভঙ্গের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছে। এর বিপরীতে সেই একই রেড ভিয়েনার রাজনৈতিক পরিবেশ আবার কার্ল পোলানিকে নব্য উদারনীতিবাদ ও স্বনিয়ন্ত্রিত বাজারের তত্ত্বকে খারিজ করেছে, যেটা পরবর্তীকালে আবার *দ্য গ্রেট ট্রান্সফরমেশন* গ্রন্থের ভিত রচনা করেছে।[৫১]

১৯৩০ থেকে ১৯৬০-এর দশক পর্যন্ত অর্থাৎ মহামন্দার পর থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পর্যন্ত পুঁজিবাদের সংকটের পশ্চিমে নব্য উদারনীতিবাদ অনেকটা ক্ষয়িষ্ণু হয়ে গিয়েছিল। মূলত পুঁজিবাদের ঘনায়মান সংকটের পরিপ্রেক্ষিতে এটি ঘটে। ১৯৩০-এর দশকে ইউরোপের আকাশে রীতিমতো দুর্যোগের ঘনঘটা দেখা যাচ্ছিল, আর সে সময় মিজেস অস্ট্রিয়ার চ্যান্সেলর একনায়ক এঞ্জেলবার্ট ডোলফাসের অর্থনৈতিক উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করেন।[৫২] এরপর তিনি সুইজারল্যান্ড ও একপর্যায়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসন করেন। রকফেলার ফাউন্ডেশনের সমর্থন পান তিনি। তখন তিনি নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়েও পড়ানো শুরু করেন।

বিশ্বযুদ্ধোত্তর কাল কেইনসের যুগ নামে পরিচিত। রাষ্ট্রীয় ব্যয় বৃদ্ধি (বিশেষ করে স্নায়ুযুদ্ধের কারণে সামরিক ব্যয় বৃদ্ধি), যুদ্ধবিধ্বস্ত ইউরোপ ও জাপানের অর্থনীতি পুনর্গঠন, বিক্রয় তৎপরতা বৃদ্ধি, অটোমোবাইলের বাড়বাড়ন্ত ও এশিয়ায় দুটি গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক যুদ্ধের কারণে প্রায় সিকি শতকজুড়ে পুঁজিবাদী অর্থনীতির ভালো বিকাশ হয়েছে।[৫৪] অন্যদিকে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিকল্প মডেলের হুমকির মুখে পড়ে এবং শক্তিশালী ট্রেড ইউনিয়নের কারণে পশ্চিমা বিশ্ব কেইনসীয় মতবাদের দিকে ঝুঁকে পড়ে—সামাজিক গণতন্ত্র ও কল্যাণমূলক রাষ্ট্র।

কিন্তু স্থবিরতার চিহ্নগুলো ছিলই। একদিকে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিস্তার এবং অন্যদিকে ডলারের ব্যাপ্তি—এই দুইয়ে মিলে ব্রেটন উডস ইনস্টিটিউটের পতন শুরু হয়। অথচ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর সময়ে এই ব্রেটন উডস ইনস্টিটিউটের কারণেই বিশ্ববাণিজ্য স্থিতিশীল হয়েছিল। ফলে ১৯৭১ সালে এসে তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট

রিচার্ড নিক্সন ডরার-সোনা প্রমিত মানের অবসান ঘটান। ১৯৬০-এর দশকের শেষ দিক থেকে যে মার্কিন অর্থনীতিতে শ্লথগতি শুরু হয়, তার সঙ্গে এর যোগ আছে। তখন ভিয়েতনাম যুদ্ধের দামামাও বাজতে শুরু করেছে। আর পরিণতিতে ১৯৭০-এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় কাঠামোগত সংকট শুরু হয়। অর্থাৎ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে যেসব কারণে পুঁজিবাদের পালে হাওয়া লেগেছিল, সেগুলো এর মধ্যে দূর হয়ে যায় এবং উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলো বিপদে পড়ে।[৫৫]

পুঁজিবাদের এই কাঠামোগত সংকট কাটাতে ১৯৭০-এর দশকে প্রথম যে ব্যবস্থা নেওয়া হয়, তা হলো কেইনসীয় চাহিদা-বাড়ানোর তত্ত্ব। রাষ্ট্রীয় ব্যয়বৃদ্ধির লক্ষ্যে এটি করা হয়। তাই দেখা গেল, নিক্সন প্রশাসনের আমলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জিডিপির অনুপাতে পণ্য ও সেবায় ব্যয় বেড়ে গেল।[৫৬] এ সময় ইউনিয়নগুলো প্রকৃত মজুরির হার বজায় রাখার চেষ্টা করে। অন্যদিকে একচেটিয়া করপোরেশনগুলো আগ্রাসীভাবে দাম বাড়িয়ে মুনাফার হার বজায় রাখার চেষ্টা করে। ফলে একদিকে তৈরি হয় মূল্যস্ফীতি এবং আরেক দিকে তৈরি হয় স্থবিরতা, যাকে বলে স্ট্যাগফ্লেশন।

অর্থনৈতিক স্থবিরতার চেয়ে মূল্যস্ফীতি পুঁজিপতিদের কাছে বড় বিপদ। কারণ, এতে যে টাকার মান পড়ে যায় এবং পরিণামে তাঁদের সম্পদের মূল্য কমে। কিন্তু শ্রমিকশ্রেণির জন্য ব্যাপারটা উল্টো। ফলে যেটা দেখা গেল, তা হলো, পুঁজিবাদী শ্রেণির মধ্যে কেইনসীয় মতবাদবিরোধী একধরনের আন্দোলন শুরু হলো। এরা নব্য উদারনীতিবাদের বাম দিকে যা-ই দেখল, তাকেই একধরনের কট্টর বাম বা সমগ্রতাবাদী বলে আখ্যা দিতে থাকল। শ্রমিকশ্রেণির অবস্থা যে এত দিন ধরে কিছুটা ভালো হলো, সেটা তারা উল্টে দিতে চাইল।[৫৭] কৃচ্ছ্রসাধন ও অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের দিকে দ্রুত মোড় নিচ্ছিল সরকার। প্রাথমিকভাবে মুদ্রানীতি ও সরবরাহ খাতের ছদ্মবেশে এটি করা হয়েছে। পরবর্তীকালে যা আরও নিরাকারমুক্ত বাজারের রূপ লাভ করে। সম্মিলিত রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও বিচারিক পদ্ধতিতে ট্রেড ইউনিয়নকে ধ্বংস করা হয়। অন্য কথায়, জন কেনেথ গ্যালব্রিয়েথ *আমেরিকান ক্যাপিটালিজম* শীর্ষক গ্রন্থে একসময় যাকে শ্রমের ভারসাম্য রক্ষাকারী শক্তি হিসেবে আখ্যা দিয়েছিলেন, সেই শক্তি ধ্বংস হয়ে যায়।[৫৮] তবে দ্বিতীয় বিশ্বযযুদ্ধের পর নব্য উদারনীতিবাদের পুনর্জন্মের পেছনে মন্ট পেলেরিন সোসাইটির বড় ভূমিকা আছে, যার নামকরণ হয়েছিল আ সুইস স্পায়ের নামানুসারে। মিজেস, হায়েক, রবিনস, মিল্টন ফ্রিডম্যান, জর্জ স্টিগলার, রেমন্ড অ্যারনসহ অন্যরা এই সংগঠনের পতাকাতলে ১৯৪৭ সালের দিকে মিলিত হন, যাঁদের উদ্দেশ্য ছিল নব্য উদারনীতিবাদী অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক চিন্তাকে তুলে ধরা। এ সমাজের সভ্যরা নিজেদের ইউরোপীয় ধাঁচের ধ্রুপদি উদারবাদী হিসেবে আখ্যা দিতেন। সন্দেহ নেই, ১৯২০-এর দশকে নব্য উদারনীতিবাদী আদর্শের তীব্র মার্ক্সবাদী সমালোচনার মুখে তারা এই নাম বাদ

দিয়েছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে ১৯২৭ সালে মিজেস নিজেই আবার এই নাম ব্যবহার শুরু করেন এবং ১৯৩৮ সালের ওয়াল্টার লিপম্যান কলোকুইয়ামে এটি উত্থাপিত হয়, যেখানে আবার মিজেস ও হায়েক উপস্থিত ছিলেন।[৫৯] বরং দেখা গেল, মন্ট পেলেরিন সোসাইটির সভ্য ও নব্য উদারনীতিবাদের মূল প্রবক্তারা এটিকে পৃথক আদর্শ হিসেবে হাজির না করে ধ্রুপদি উদারতাবাদের সম্প্রসারণ হিসেবে দেখলেন, যা মানব প্রকৃতির অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্য। এ ক্ষেত্রে মিশেল ফুকো যা বলেছেন, সেই সূত্র ধরে বলতে হয়, এটি একধরনের বায়োপলিটিকসে[৬০] রূপান্তরিত হয়েছে।

তা সত্ত্বেও নব্য উদারনীতিবাদী মার্কা বাদ দিলেও মন্ট পেলেরিন সোসাইটি ও শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগ মিলে নব্য উদারনীতিবাদী তত্ত্বের ঘাঁটি হয়ে ওঠে। ১৯৫০ ও ৬০-এর দশকের কেইনসীয় সময়ে মিজেস, হায়েক, ফ্রিডম্যান ও জেমস বুকাননের মতো মানুষেরা মূলধারার বাইরে ছিলেন, যদিও তাঁরা অনেক বেসরকারি ফাউন্ডেশনের ব্যাপক পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছিলেন।[৬১] কিন্তু ১৯৭০-এর দশকে অর্থনৈতিক স্থবিরতার সময় নব্য উদারনীতিবাদী বুদ্ধিজীবীদের একচেটিয়া পুঁজিবাদী প্রতিষ্ঠানগুলোর শীর্ষ স্থানে বসানো হয়। অর্থনীতিকে পুনর্গঠনের জন্য করপোরেট প্রতিষ্ঠানগুলো যে প্রচারণা চালাচ্ছিল, তাকে বুদ্ধিবৃত্তিক ভিত্তি দেওয়ার জন্য এটা করা হয়েছে। আর পুনর্গঠনের লক্ষ্য ছিল উদ্দেশ্যমূলকভাবে শ্রমিক, রাষ্ট্র আর অনুন্নত অর্থনীতিকে লক্ষ্যবস্তু করা।

শুরু থেকেই নব্য উদারনীতিবাদী দর্শনের মূল কথা ছিল পুঞ্জীভূত করপোরেট পুঁজি ও শ্রেণিগত রাজতন্ত্রগুলোকে রক্ষা করা, যাদের মুক্তবাজার প্রতিযোগিতা ও উদ্যোগের প্রতিনিধি মনে করা হতো।[৬২] নব্য উদারনীতিবাদী সমাজতন্ত্রবিরোধী এ তীব্র তৎপরতার অর্থ হলো, এটি মানুষের সামাজিক জীবনের সম্পূর্ণ বাজারকেন্দ্রিক বেসরকারীকরণের দিকে নিয়ে চলেছে। মার্গারেট থ্যাচারের লন্ডন ও রোনাল্ড রিগ্যানের ওয়াশিংটনে হায়েক ও ফ্রিডম্যানের মতো চরিত্রগুলো নব্য উদারনীতিবাদের প্রতীক হয়ে ওঠে। লক্ষণীয় দিক হলো, ১৯৬৯ সালে ব্যাংক অব সুইডেনের অর্থানুকূল্যে অর্থনীতিতে যে নোবেল পুরস্কার প্রবর্তিত হয়, তার নিয়ন্ত্রণ শুরু থেকেই এই অতি রক্ষণশীল অর্থনীতিবিদদের হাতে ছিল। ১৯৭৪ সাল থেকে শুরু করে ১৯৯২ সাল পর্যন্ত মন্ট পেলেরিন সোসাইটির সদস্যদের মধ্যে হায়েক, ফ্রিডম্যান, স্টিগলার ও বুকানন এই পুরস্কার পান। এমনকি মৃদু প্রকৃতির সামাজিক গণতন্ত্রী অর্থনীতিবিদেরাও বাদ পড়ে যান।[৬৩]

স্বাভাবিক অর্থনৈতিক নীতির সাপেক্ষেও বিবেচনা করলে বলতে হয়, নব্য উদারনীতিবাদ মূলত একটি অকার্যকর নীতি। কারণটা হলো, নব্য ধ্রুপদি নীতির মতো এই নব্য উদারনীতিবাদী অর্থনীতিও মূলত বড় বড় করপোরেট ও পুঞ্জীভূত শক্তির বাস্তবতা অস্বীকার করে বা তাকে যৌক্তিক রূপ দেওয়ার চেষ্টা করে।[৬৪] তা

সত্ত্বেও বড় বড় ব্যবসা-বাণিজ্য ও উদীয়মান ধনকুবের শ্রেণির ক্ষেত্রে এটি কার্যকর রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক নীতি। বলা বাহুল্য, এ সমাজে অর্থের সব প্রবাহ একচেটিয়া আর্থিক পুঁজি নিয়ন্ত্রণ করতে চায়।[৬৫] পুঁজিবাদী অর্থনীতি স্থবির হচ্ছে এবং প্রবৃদ্ধির হার দশকের পর দশক ধরে কমছে, কিন্তু করপোরেট ধনীদের হাতে উদ্বৃত্ত পুঁজি সঞ্চয়ের হার তো কমেনি, বরং পুঁজিবাদের আর্থিকীকরণ, বিশ্বায়ন, ডিজিটাল প্রযুক্তির বিস্তার—এসব কারণে পুঁজি সংগ্রহের নতুন নতুন পথ তৈরি হয়েছে।[৬৬]

বিশ্বায়নের কারণে শুধু নতুন বাজারই সৃষ্টি হয়নি, বিশ্বের প্রান্তীয় অঞ্চলগুলোতে শ্রমিকশ্রেণিকে শোষণ করে বিপুল উদ্বৃত্ত পুঁজি সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছে। পরিণামে এই প্রান্তীয় অঞ্চলগুলো বহুজাতিক করপোরেশন ও ধনী ব্যক্তিদের খপ্পরে পড়েছে।[৬৭] ডিজিটাল প্রযুক্তি আবার নতুন নতুন পথ খুলে দিচ্ছে। এই প্ল্যাটফর্মে কোটি কোটি মানুষের কেনাবেচার তথ্য একত্র করে তারা নজরদারির এক বৈশ্বিক ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে। ফলে তথ্যপ্রযুক্তি খাতে মহিরুহ প্রকৃতির একচেটিয়া গড়ে উঠেছে।[৬৮]

পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে চলে যায় যে রাষ্ট্রও পুঁজিবাদের আর্থিকীকরণের নীতির বশীভূত হয়ে পড়ে। রাষ্ট্রের ভূমিকা এখানে পরিবর্তিত হয়ে অর্থের মূল্য রক্ষার মধ্যে সীমিত হয়ে পড়ে।[৬৯] ২০০৭-০৮ সালের মহা আর্থিক সংকটের সময় বড় বড় ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে প্রায় পুরোটাই বেইল আউট করে বাঁচানো হলেও জনগণের জন্য কিছু করা হয় না। এই সংকট নব্য উদারনীতিবাদের তীব্র সংকটের প্রতিরূপ ছিল না, বরং নব্য উদারনীতিবাদকে সে আরও প্রণোদনা জুগিয়েছে। এতে এটাই বোঝা গেল যে এ সর্বগ্রাসী শোষণমূলক আর্থিক ব্যবস্থার আদর্শিক প্রতিরূপ হয়ে উঠেছে এই নব্য উদারনীতিবাদ।[৭০]

এই নতুন যুগের আর্থিকীকৃত সংগ্রহব্যবস্থার মূল বৈশিষ্ট্য হলো, এটি ক্রমেই উৎপাদন ও ব্যবহারিক মূল্যের বাস্তবতা থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। এতে সামগ্রিক উৎপাদন ও সঞ্চয়প্রক্রিয়ায় বিনিময় মূল্য ও ব্যবহার মূল্যের মধ্যকার সংঘাতটা আরও তীব্র হয়।[৭১] ফলস্বরূপ আমরা এক 'সামাজিক ও প্রতিবেশিক জরুরি অবস্থার' সম্মুখীন হয়েছি।[৭২] প্রাকৃতিক পরিবেশ যে দ্রুত ধ্বংস হচ্ছে, তার মধ্য দিয়েই ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়। করপোরেশনের খাতায় জীবাশ্ম জ্বালানি আর্থিক সম্পদ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে, এমনকি মাটির নিচের জ্বালানিও। ওয়াল স্ট্রিটের লাখ লাখ কোটি ডলার এভাবে জীবাশ্ম পুঁজির সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে আছে।[৭৩] এসব কারণে তাদের পক্ষে জীবাশ্ম জ্বালানি ছেড়ে নবায়নযোগ্য জ্বালানির দিকে যাওয়া দ্বিগুণ কঠিন হয়ে গেছে। বাজারভিত্তিক সমাজের শক্তি মানুষ ও গ্রহের ক্ষতির বিনিময়ে এই মুনাফার ধারা টিকিয়ে রাখছে।

নব্য উদারনীতিবাদ অবাধ প্রতিযোগিতার একদম বিপরীত। জেমস কে গ্যালব্রিয়েথ এর নামকরণ করেছেন আগ্রাসী রাষ্ট্র।[৭৪] নব্য উদারনীতিবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে পুঁজিবাদের চরম রূপটা এমনি এমনি সৃষ্টি হয় না, বরং তাকে তৈরি করতে হয়।

এখানে রাষ্ট্রের ভূমিকা কেবল সম্পদ রক্ষা করা নয়, অ্যাডাম স্মিথ যেমনটা বলতেন। বরং মিশেল ফুকো *বার্থ অব বায়োপলিটিকস*-এ যা বলেছেন, তা অনেক বেশি প্রাসঙ্গিক : জীবনের সর্বক্ষেত্রে বাজারব্যবস্থার সক্রিয় প্রভাব। এর মানে হলো রাষ্ট্র ও সমাজকে করপোরেশন ও বাজারের মডেলে গড়ে তোলা।

মিশেল ফুকো বলেছেন, 'নব্য উদারনীতিবাদের সমস্যা হলো, বাজার অর্থনীতির নীতির ভিত্তিতে কীভাবে রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রয়োগ করা যায়।' বাজারের ধ্বংসাত্মক প্রভাবকে মোকাবিলা করা রাষ্ট্রের কাজ নয়, বরং এই ধ্বংসের সুযোগ নিয়ে বাজারের প্রভাব আরও ব্যাপক করা, এটাই রাষ্ট্রের কাজ।[৭৬] লক্ষ্যটা কিন্তু রাষ্ট্রকে অতিক্রম করে যাওয়া নয়, বরং একচেটিয়া পুঁজির লক্ষ্যের সঙ্গে তার গাঁটছড়া বেঁধে দেওয়া, যে দৃষ্টিভঙ্গির কথা বুকানন জোরের সঙ্গে বলেছেন।[৭৭] এ ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় ব্যাংক মূলত রাষ্ট্রের স্বায়ত্তশাসিত শাখায় পরিণত হয়, বস্তুত তারা ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। রাজস্ব বিভাগ ঋণের সীমা দ্বারা নির্ধারিত হয়ে যায়। নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলো একচেটিয়া পুঁজির হাতে বন্দী হয়ে যায় এবং মূলত সরকারের নিয়ন্ত্রণের বাইরে করপোরেশনের স্বার্থে এরা কাজ করতে থাকে।[৭৮]

এ রকম স্বনিয়ন্ত্রিত বাজারভিত্তিক সমাজ বা আগ্রাসী রাষ্ট্র গঠনের মূল উদ্দেশ্য হলো পোলিয়ানি যা অত্যন্ত শক্তভাবে বলেছেন, সমাজের ভিত ও জীবনকেই খাটো করা।[৭৯] কিন্তু আজকের পুঁজিবাদে তো আর পেছনে ফেরার উপায় নেই। স্থবিরতা, আর্থিকীকরণ, বিশ্বায়ন, বাজারীকরণ—এসব চলবেই। এই পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, নব্য উদারনীতিবাদ অনিবার্যভাবে বাজারের কর্তৃত্ব ও এমনকি নব্য ফ্যাসিজমের দিকে আমাদের নিয়ে যায়। এ ব্যবস্থায় ডোনাল্ড ট্রাম্প তো আর ব্যতিক্রম হবেন না।[৮০]

১৯২৭ সালে মিজেস *লিবারেলিজম* গ্রন্থে খোলামেলাই বলেছেন, 'এটা অস্বীকার করার জো নেই যে ফ্যাসিবাদ বা স্বৈরাচার কায়েম করার এমন যত ব্যবস্থা আছে যে সেগুলো আমাদের চূড়ান্ত স্বার্থে প্রণীত। ফ্যাসিবাদের বাড়বাড়ন্ত আমাদের এ সময় ইউরোপীয় সভ্যতাকে বাঁচিয়ে দিয়েছে। তাই বলতে হয়, ফ্যাসিবাদ যে গুণাবলি প্রদর্শন করেছে, তা ইতিহাসে চিরস্থায়ী হয়ে থাকবে।'[৮১] অন্যান্য নব্য উদারনীতিবাদী, যেমন ফ্রিডম্যান ও বুকাননের সঙ্গে হায়েক ১৯৭৩ সালে চিলিতে সালভাদর আয়েন্দের বিরুদ্ধে অগাস্টো পিনোশের সামরিক অভ্যুত্থানের সমর্থন করেছেন। এই অভ্যুত্থান চিলির জনগণকে বড় ধরনের এক অর্থনৈতিক ধাক্কা দেয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৭৮ সালে চিলি সফরে গিয়ে হায়েক পিনোশেকে ব্যক্তিগতভাবে সীমাহীন গণতন্ত্রের ব্যাপারে সতর্ক করে দেন। ১৯৮১ সালে দ্বিতীয় সফরের পর তিনি আবার বলেন, 'গণতান্ত্রিক সংসদের চেয়ে স্বৈরাচারী ব্যবস্থা অনেক বেশি উদার হতে পারে।'[৮২] ১৯৪৯ সালে *ইন্ডিভিজুয়ালিজম অ্যান্ড ইকোনমিক অর্ডার* শীর্ষক গ্রন্থে তিনি লিখেছিলেন, 'আমাদের এই সত্য এড়িয়ে যাওয়ার কোনো উপায় নেই যে

ন্যায্যতার পূর্ণাঙ্গ প্রয়োগ ও ব্যক্তিস্বাধীনতা রক্ষা একসঙ্গে যায় না।'[৮৩] সংক্ষেপে বললে, নব্য উদারনীতিবাদ কেবল একটি চিন্তাকাঠামো নয়, বরং এটি একচেটিয়া আর্থিক ব্যবস্থার যুগে এক চরম প্রবণতার স্মারক। মিশেল ফুকো যেমনটা বলেছেন, 'পুঁজিবাদের টিকে থাকা' নির্ভর করে আমাদের সমগ্র সামাজিক অস্তিত্বে এর অর্থনৈতিক যুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে।[৮৪] কিন্তু পুঁজিবাদ ব্যর্থ হলে এখন নতুন প্রশ্ন হচ্ছে, এর পরে কী?

এর পরে কী?

মার্ক্সবাদী ইতিহাসবিদ এরিক হবসবম তাঁর অতি গুরুত্বপূর্ণ *দ্য এজ অব এক্সট্রিম : আ হিস্ট্রি অব দ্য ওয়ার্ল্ড ১৯১৪-১৯৯১* গ্রন্থে বলেছেন, তিনটি কারণে একুশ শতক মানবতার জন্য আরও হুমকিস্বরূপ হয়ে উঠতে পারে। আগের শতক ছিল 'চরমপন্থার' যুগ, যে শতকে একাধারে দুটি বিশ্বযুদ্ধ, সাম্রাজ্যিক দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও অর্থনৈতিক মন্দা হয়েছে। এসব কারণে মানবতাই এই প্রথম নিশ্চিহ্ন হওয়ার পর্যায়ে চলে যায়। তা সত্ত্বেও সামনের দিকে তাকিয়ে তিনি দেখেছেন, নতুন শতাব্দী (সহস্রাব্দ) আরও বিপজ্জক হবে বলেই তাঁর ধারণা। ১৯৯৪ সালে তিনি দেখলেন, 'আমরা এমন এক পৃথিবীতে বাস করি, যেখানে আমরা বড় বড় অর্থনৈতিক ও প্রাযুক্তিক-বৈজ্ঞানিক পরিবর্তনের দ্বারা বদলে যাচ্ছি। আমরা জানি, বা অন্তত ধরে নিতে পারি, এটি অনন্তকাল ধরে চলবে না। ভবিষ্যৎ কেবল অতীতের ধারাবাহিকতা হতে পারে না। বাইরের দিক থেকে যেমন, ভেতরের দিক থেকেও তেমনি আমরা এমন অনেক লক্ষণ দেখতে যাচ্ছি, যাতে আমরা বলতে পারি, আমরা এক ঐতিহাসিক সংকটের সম্মুখীন হয়েছি।...আমরা জানি না, কোথায় আমাদের গন্তব্য। আমরা শুধু এটাই জানি যে ইতিহাস আমাদের এই জায়গায় নিয়ে এসেছে। তবে একটা ব্যাপার পরিষ্কার, মানবতার যদি জ্ঞাত ভবিষ্যতের কথা বলি, তাহলে এটা শুধু অতীত বা বর্তমানের ধারাবাহিকতা হতে পারে না। তৃতীয় সহস্রাব্দকে এই ভিত্তির ওপর দাঁড় করানোর চেষ্টা করলে আমরা ব্যর্থ হব। সেই ব্যর্থতার মূল্য দিতে হবে, বদলে যাওয়া সমাজের বিকল্প, সেটা হলো, অন্ধকার।'[৮৫]

হবসবমের মনে এ ব্যাপারে তেমন একটা সন্দেহ ছিল না যে বর্তমানের মূল বিপদ হচ্ছে, 'এমন এক অর্থনীতিতে ধর্মের মতো বিশ্বাস স্থাপন করা, যেখানে সম্পদ ভাগ হয় পুরোপুরি অনিয়ন্ত্রিত এক বাজারব্যবস্থায়, প্রতিযোগিতা যেখানে অসীম। যার নিয়ন্ত্রণ থাকে আগের চেয়েও ঘনীভূত করপোরেশনের হাতে। এই ব্যবস্থার একটা বড় বিপদ হতে পারে এই যে 'এখানে পরিবেশ অপূরণীয় ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারে এবং মানুষও তার হাত থেকে রেহাই পাবে না, কারণ, সে-ই এর অংশ'। এখন সবাই হবসবমের সমালোচনা করেন, ডান বা বাম, কেউই বাদ রাখেন না। তাঁরা হবসবমকে

অতি হতাশাবাদী মনে করেন, বিশেষ করে পুঁজিবাদী উন্নয়নের সাপেক্ষে।[৮৭] আজ সিকি শতক পরে বলতে হয়, তিনি জায়গামতোই গুলি ছুড়েছিলেন। তিনি যেসব শঙ্কার কথা বলেছিলেন, তার অনেকগুলোই আজ পরিষ্কার। তা সত্ত্বেও পুঁজিবাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে এমন বাস্তববাদী হওয়া আজ অনেক ধনী দেশের বামপন্থীদের পক্ষেই সম্ভব হচ্ছে না, এমনকি এ রকম বছরের পর বছর ধরে নব্য উদারনীতিবাদের ধাক্কা খাওয়ার পরও। আর সঙ্গে তো অর্থনৈতিক স্থবিরতা, ক্রমবর্ধমান অসমতা ও পরিবেশ বিপর্যয় আছেই। এ ক্ষেত্রে তাঁরা পোলানির দ্বৈত আন্দোলনের দোহাই দেন। তিনি বলেছেন, এ রকম স্বনিয়ন্ত্রিত বাজারভিত্তিক সমাজে সমাজ ও পরিবেশ রক্ষায় আত্মরক্ষামূলক আন্দোলন গড়ে ওঠে।[৮৮] ব্যাপারটা অনেকটা রূপকথার মতো। এখানে একধরনের আশাবাদ আছে, সেটা হলো, পেন্ডুলাম আবার ঘুরে যাবে এবং সেখান থেকে আরও ইতিবাচক ঘরানার উদারতাবাদ ও সামাজিক গণতন্ত্রের সূচনা হবে।

সামাজিক গণতান্ত্রিক দলগুলো সেই পরস্থিতিতে ক্ষমতায় এলেও তারা পুঁজিবাদের অনিবার্য গতির সামনে মুখ থুবড়ে পড়বে, সে তারা যতই মৃদু প্রকৃতির পুঁজিবাদ তৈরির অঙ্গীকার করুক না কেন। মাইকেল ইয়াটস লিখেছেন, ব্যর্থ পুঁজিবাদের পরিপ্রেক্ষিতে 'আজ এটা বিশ্বাস করা অসম্ভব হয়ে পড়েছে যে কিছুটা হলেও পরিস্থিতির উত্তরণ ঘটবে, শ্রমিক ইউনিয়ন ও রাজনৈতিক দলগুলো যা একসময় লক্ষ্য হিসেবে নিয়েছিল, যাকে একটা পরিণতির দিকেও তারা নিয়ে গিয়েছিল।'[৮৯]

লিমিটস টু গ্রোথ গ্রন্থেও মূল লেখকদের একজন ইয়ুর্গেন র‍্যানডার্স ২০১২ সালে ৪০ বছর পরের অর্থাৎ ২০৫২ সালের সমাজের কল্পনা করেছেন। তিনি বলেছেন, এই শতকের মাঝামাঝি সময়ে একধরনের 'পরিবর্তিত পুঁজিবাদের' উদ্ভব হবে, যেখানে সামষ্টিক কল্যাণ ব্যক্তিকল্যাণের ঊর্ধ্বে স্থান পাবে। সরকারব্যবস্থায় প্রজ্ঞার দেখা পাওয়া যাবে। যে সরকার আবার পরিচালনা করবে টেকনোক্র্যাটরা, যার বৈশিষ্ট্য হবে 'স্বল্প গণতন্ত্র ও স্বল্প বাজার স্বাধীনতা'। মূল বিষয়টা এ রকম দাঁড়াবে যে পুঁজিবাদ তখন আরও দক্ষ ও টেকসই হবে, তবে ভৌগোলিকভাবে আরও কিছুটা সীমাবদ্ধ হতে পারে সে।[৯০]

অন্যদিকে, রক্ষণশীল ইতিহাসবিদ জ্যাকব বার্কহার্ড ১৯ শতকে ঘোষণা দিয়েছিলেন, পুরো জমানা বা মানুষ যখন কোনো সংকটের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়, তখনই ঐতিহাসিক সংকট সৃষ্টি হয়। তখন ইতিহাসের পায়ে যেন কেউ চাকা লাগিয়ে দেয়। সাধারণভাবে যা ঘটতে শত শত বছর লাগে, সে সময় তা সপ্তাহ বা মাসখানেকের মধ্যে ঘটে যায়। তিনি এটিকে 'ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার গতি বৃদ্ধি' হিসেবে আখ্যা দেন।[৯১]

এখন কথা হচ্ছে, পুঁজিবাদী সামাজিক সম্পর্কের কারণে মানবতার সামনে যে বস্তুগত চ্যালেঞ্জ হাজির হয়েছে, তা মানবতা আর কখনো দেখেনি।[৯২] পুঁজি সঞ্চয়ের পাশাপাশি এক আসন্ন বিপর্যয়ের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছি আমরা।[৯৩] এ পরিস্থিতিতে

লাখ লাখ মানুষ ইতিমধ্যে এই ব্যবস্থার সঙ্গে এক সংগ্রামমুখর সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েছে। ফলে পৃথিবীব্যাপী সমাজতন্ত্রের অভিমুখে নতুন আন্দোলনের ভিত তৈরি হয়েছে। *ক্যান দ্য ওয়ার্কিং ক্লাস চেঞ্জ দ্য ওয়ার্ল্ড* শীর্ষক গ্রন্থে ইয়াটস বলেছেন, হ্যাঁ, শ্রমজীবী শ্রেণি পৃথিবীকে বদলে দিতে পারে। আর শ্রমজীবী শ্রেণিসহ সব শ্রেণির সম্মিলিত সংগ্রাম যদি প্রকৃত সমাজতন্ত্রের অভিমুখে পরিচালিত হয়, তবেই তা সম্ভব।[৯৪]

অনেকেই আপত্তি করতে পারেন এই বলে যে সমাজতন্ত্র তো ব্যর্থ, ফলে সে আর বিকল্প হতে পারে না। কথা হচ্ছে, মধ্যযুগে ইতালির নগররাষ্ট্রে তো সামন্তবাদের বাড়বাড়ন্তের মুখে পুঁজিবাদ টিকতে পারেনি। তেমনি সমাজতন্ত্রের প্রথম যুগের ব্যর্থতার অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে সমাজতন্ত্রের নতুন রূপ গড়ে উঠবে।[৯৫] এমনকি ব্যর্থতার মধ্যেও পুঁজিবাদের ওপরে সমাজতন্ত্রের সুবিধা আছে। এর অনুপ্রেরণা হলো 'স্বাধীনতার সামগ্রিক' চাহিদা, সমতা ও টেকসই মানব উন্নয়নের মধ্যে যার মূল নিহিত।[৯৬]

একজন রক্ষণশীল অর্থনীতিবিদ জোসেফ সুমপিটার একসময় অস্ট্রিয়ার অর্থমন্ত্রী থাকাকালে সমাজতন্ত্রের প্রতি ঝুঁকে পড়েছিলেন। সেই তিনি একবার পুঁজিবাদ সম্পর্কে বলেছিলেন, পুঁজিবাদ এমন এক পরিস্থিতি সৃষ্টি করছে যে একসময় তার পক্ষেই টিকে থাকা সম্ভব হবে না। অনিবার্যভাবে তার উত্তরসূরি হিসেবে সমাজতন্ত্র আসবে।[৯৭] অনেক ক্ষেত্রেই তিনি সঠিক, যদিও যেভাবে তিনি হতে চেয়েছিলেন, সেভাবে হতে পারেননি। পুঁজিবাদের একচেটিয়াকরণ ও আর্থিকীকরণের ফলে বিদ্যমান সমাজব্যবস্থার প্রতি একধরনের সর্বজনীন বৈরিতা তৈরি হয়েছে, যদিও বিদ্যমান বাস্তবতায় ব্যাপারটা কিছুটা বিভ্রান্তি তৈরি করেছে। এই বৈরিতা যতটা নব্য উদারনীতিবাদের প্রতি, ততটা পুঁজিবাদের প্রতি নয়।[৯৮]

এখন ব্যাপারটা এই দাঁড়িয়েছে যে আমাদের সামনে যে সংকট সৃষ্টি হয়েছে, তা যেমন একাধারে সামাজিক, একই সঙ্গে প্রতিবেশিক। এই পরিস্থিতির উত্তরণে মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির যৌক্তিক সম্পর্ক প্রয়োজন। আর তা হতে হবে সম্মিলিত মানবতার নিয়ন্ত্রণে। ইতিহাসে মানুষের তৎপরতার মূল সূত্রটি নিহিত আছে মানুষের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা এবং বিশ্বমাঝে মানুষে-মানুষে ও মানুষে-প্রকৃতিতে সম্পর্কের মধ্যে। প্রথমটির জন্য চূড়ান্তভাবেই সমতা ও সমাজের প্রয়োজন; দ্বিতীয়টির জন্য দরকার টেকসই মানব উন্নয়ন। ফলে মানবতার ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করতে হলে আমাদের সামষ্টিক উন্নয়নের জন্য সংগ্রাম করতে হবে।

ঈষৎ সংক্ষেপিত

তথ্যসূত্র

১. George Monbiot, 'The Earth Is in a Death Spiral. It will Take Radical Action to Save Us', *Guardian*, November 14, 2018; Leonid Bershidsky, 'Underemployment is the New Unemployment', Bloomberg, September 26, 2018.

২. For an insightful historical analysis of the general problem of the breakdown and disintegration of civilizations, see Arnold J. Toynbee, *A Study of History*, abridged by D.C. Somerveil (Oxford : Oxford University Press, 1946), 244-428.

৩. Karl Marx and Frederick Engels, *The Communist Manifesto* (New York : Monthly Review Press, 1964), 2.

৪. For analyses of stagnation and financialization, see Harry Magdoff and Paul M. Sweezy, *Stagnation and the Financial Explosion* (New York : Monthly Review Press, 1986); John Bellamy Foster and Fred Magdoff, *The Great Financial Crisis* (New York : Monthly Review Press, 2009); John Bellamy Foster and Robert W. McChesney, *The Endless Crisis* (New York : Monthly Review Press, 2012); Costas Lapavitsas, *Profits Without Production : How Finance Exploits Us All* (London : Verso, 2013).

৫. Drew Desilver, 'For Most U.S. Workers, Real Wages Have Barely Budged in Decades', Pew Research Center, August 7, 2018.

৬. Yuki Noguchi, 'Gig Economy Renews Debate Over whether Contract Laborers Are Really Employees', *NPR*, March 7, 2018.

৭. The concept of liberated capitalism is taken from Henryk Szlajfer (interviewed by Grzegorz Konat), 'Liberated Capitalism', forthcoming, *Monthly Review*.

৮. John Smith, *Imperialism in the Twenty-First Century* (New York : Monthly Review Press, 2016).

৯. Heather Stewart, '13trn Horde Hidden from Taxman by Global Elite', *Guardian*, July 21, 2012; Sam Ro, 'The Mega Rich Are Holding at Least $21 Trillion in Offshore Tax Havens', Business Insider, July 22, 2012; Nicholas Shaxson, *Treasure Islands* (London : Palgrave Macmillan, 2011).

১০. Larry Elliott, 'Inequality Widens as 42 People Hold Same Wealth as 3.7bn Poorest', *Guardian*, January 21, 2018; Rupert Neate, 'Bill Gates, Jeff Bezos, and Warren Buffett are Wealthier than Poorest Half of US', *Guardian*, November 8, 2017.

১১. World Inequality Report 2018 (World Inequality Lab, 2018).

১২. Lant Pritchett, 'Divergence, Big Time', *Journal of Economic Perspectives* 11, no. 3 (1997) : 3-17; Jason Hickel, 'Global Inequality May Be Worse than We Think', *Guardian*, April 8, 2016; John Bellamy Foster, 'The New Imperialism of Globalized Monopoly-Finance Capital', *Monthly Review* 67, no. 3 (July-August 2015) : 11-12.

১৩. 'More than 60 percent of the World's Employed Population Are in the Informal Economy', International Labour Organisation, April 30, 2018; Foster and McChesney, *The Endless Crisis*, 144-51.

১৪. 'State of Homelessness', National Alliance to End Homelessness, accessed January 9, 2019, http ://endhomelessness.org.

১৫. Oliver Milman, '"We Are at War" : New York's Rat Crisis Made Worse by Climate Change', *Guardian*, December 21, 2018.

১৬. Lisa Rapaport, 'Life Expectancy Declines Seen in the US and Other High-Income Countries', *Reuters*, August 22, 2018; 'Life Expectancy in America Has Declined Two Years in a Row', *Economist*, January 4, 2018; Rebecca Voelker, 'Black Lung Resurgence Raises New Challenges for Coal Country Physicians', *JAMA Network*, December 12, 2018; Thea Jourdan, 'Return of the Victorian Diseases : Scarlet Fever, TB, Whooping Cough, Even Scurvy', *Daily Mail*, April 4, 2016.

১৭. Claas Kirchelle, 'Pharming Animals : A Global History of Antibiotics in Food Production (1935-2017)', *Palgrave Communications* 4, no. 96 (2018); Amanda Holpuch, 'UN Meeting Tackles the 'Fundamental Threat' of Antibiotic Resistant Superbugs', *Guardian*, September 21, 2016 : 'Antimicrobial Resistance a 'Global Health Emergency', UN, Ahead of Awareness Week', UN News, November 12, 2018; Rob Wallace, Big Farms Make Big Flu (New York : Monthly Review Press, 2016).

১৮. Frederick Engels, *The Condition of the Working Class in England* (London : Penguin, 1987), 127-28.

১৯. Stephanie Simon, 'K-12 Student Databases Jazzes Tech Startups, Spooks Parents', *Reuters*, March 3, 2013; Sharon Lurye, 'Why Your Student's Personal Data Could Be Freely Bought and Sold', Hechinger Report, June 14, 2018; Gerald Coles, *Miseducating for the Global Economy* (New York : Monthly Review Press, 2018); Howard Ryan, *Educational Justice* (New York : Monthly Review Press, 2017); John Bellamy Foster, 'Education and the Structural Crisis of Capital', *Monthly Review* 63, no. 3 (July-August 2011) : 6-37.

২০. Charles Dickens, *Hard Times* (London : Penguin, 1995), 10-15.

২১. Erica R. Meiners and Therese Quinn, 'Militarism and Education Normal', *Monthly Review* 63, no. 3 (July-August 2011) : 77-86.

২২. 'Half of Americans Have Family Members Who Have Been Incarcerated', Equal Justice Institute, December 11, 2018; Michelle Alexander, *The New Jim Crow* (New York : New Press, 2012); Drew Kann, 'Five Facts Behind America's High Incarceration Rate', *CNN*, July 10, 2018; 'Criminal Justice Fact Sheet', NAACP, accessed January 12, 2019 (data on incarceration from 2015); Jacqueline Howard, 'Black Men Nearly 3 Times as Likely to Die from Police Use of Force, Study Says', *CNN*, December 20, 2016; Keeanga-Yamahtta Taylor, From #BlackLivesMatter to Black Liberation (Chicago : Haymarket, 2016).

২৩. 'Facts and Figures : Ending Violence Against Women', UN Women, last updated in November 2018; L. A. Sharp, 'The Commodification of the Body and Its Parts', *Annual Review of Anthropology* 29 (2000) : 287-328; Robin McKie, 'Biologists Think 50% of Species Will Be Facing Extinction by End of the Century', *Guardian*, February 25, 2017.

২৪. John Bellamy Foster and Robert W. McChesney, 'Surveillance Capitalism', *Monthly Review* 66, no. 3 (July-August 2014) : 1-31.

২৫. 'Who's Working for Your Vote', Tactical Technology Collective, November 29, 2018.

২৬. Paul A. Baran and Paul M. Sweezy, *Monopoly Capital* (New York : Monthly Review Press, 1966), 155; Doug Henwood, 'Trump and the New Billionaire Class', in *Socialist Register* 2019, ed. Leo Panitch and Greg Albo (New York : Monthly Review Press, 2018), 100-25; Jane Mayer, *Dark Money* (New York : Random House, 2017).

২৭. Timothy M. Gill, 'Why the Power Elite Continues to Dominate American Politics', *Washington Post*, December 24, 2018.

২৮. John Pilger, 'New Cold War and Looming Threats', *Frontline*, December 21, 2018; Christi Parsons and W. J. Hennigan, 'President Obama Who Hoped to Sow Peace, Instead Led the Nation in War', *Los Angeles Times*, January 13, 2017.'

২৯. John Mecklin, 'It is Now Two Minutes to Midnight', *Bulletin of the Atomic Scientists*, accessed December 19, 2018.

৩০. Zack Beauchamp , '9 Maps and Charts that Explain the Global Refugee Crisis', *Vox*, June 30, 2017; 'International Migration Report 2017 Highlights', United Nations, December 18, 2017; Philippe Rekacewicz, 'Mapping Europe's War on Immigration', *Le Monde Diplomatique*, October 16, 2013; Joseph S. Nye, '2050 : How Can We Avoid a Gated World', *World Economic Forum*, January 19, 2014; James Randerson, 'Expert Warns Climate Change Will Lead to "Barbarisation"', *Guardian*, May 15, 2008; John Bellamy Foster, *Trump in the White House* (New York : Monthly Review Press, 2017), 104.

৩১. '2018 World Hunger and Poverty Facts', Hunger Notes, accessed December 19, 2018, http ://worldhunger.org; Fred Magdoff, 'Twenty-First-Century Land Grabs : Accumulation by Agricultural Dispossession', *Monthly Review* 65, no. 6 (November 2013) : 1-18.

৩২. David Ruccio, 'Dollarization in the United States', Occasional Links and Commentary blog, December 10, 2018, http ://anticap.wordpress.com; '41 Million People in the United States Face Hunger', Feeding America, September 6, 2017.

৩৩. Farshad Araghi, 'The Great Global Enclosure of Our Times', in *Hungry for Profit*, eds. Fred Magdoff, John Bellamy Foster, and Frederick H. Buttel (New York : Monthly Review Press, 2000), 145-60.

৩৪. Mike Davis, *Planet of Slums* (London : Verso, 2006).

৩৫. Vijay Prashad, 'We Have No Choice But to Live Like Human Beings', *Tricontinental*, December 14, 2018, http ://thetricontinental.org; "Shameful' : What's Driving the Global Housing Crisis?', *Al Jazeera*, November 3, 2018.

৩৬. Will Steffen, et al., 'Planetary Boundaries', *Science* 347, no. 6223 (2015); Ian Angus, *Facing the Anthropocene* (New York : Monthly Review Press, 2016); John Bellamy Foster, Brett Clark, and Richard York, *The Ecological Rift* (New York : Monthly Review Press, 2010).

৩৭. Damian Carrington, 'Humanity Has Wiped Out 60% of Animal Populations Since 1970, Report Finds', *Guardian*, October 29, 2018; M. Grooten and R. E. A. Almond, eds., Living Planet Report—2018 : Aiming Higher (Gland, Switzerland : World Wildlife Foundation, 2018); Ben Guarino, 'Hyperalarming Study Shows Massive Insect Loss', *Washington Post*, October 15, 2018; Rodolfo Dirzo, Hilary S. Young, Mauro Galetti, Geraldo Ceballos, Nick J. B. Isaac, and Ben Collen, 'Defaunation in the Anthropocene', *Science* 35, no. 6195 (2014) : 401-6.

৩৮. James Hansen, 'Climate Change in a Nutshell : The Gathering Storm', December 18, 2018, 25.

৩৯. Will Steffen, et al., 'Trajectories of the Earth System in the Anthropocene', Proceedings of the National Academy of Sciences 115, no. 33 (2018). For estimated cumulative emissions from fossil-fuel use, cement production, and land-use change since the beginning of industrialization, see trillionthtonne.org.

৪০. Hansen, 'Climate Change in a Nutshell', 42-47; Kendra Pierre-Louis, 'Greenhouse Gas Emissions Accelerate Like a 'Speeding Freight Train' in 2018', *New York Times*, December 5, 2018; Brad Plumer, 'U.S. Carbon Emissions Surged in 2018 Even as Coal Plants Closed', *New York Times*, January 8, 2019.

৪১. Marcelo Gleiser, 'ExxonMobil vs. the World', *NPR*, November 30, 2016; Andy Rowell, 'Exxon's 25 Year 'Drop Dead' Denial Campaign', *Oil Change International*, April 14, 2014.

৪২. K. William Kapp, *The Social Costs of Private Enterprise* (Cambridge, Massachusetts : Harvard University Press, 1950), 231.

৪৩. Herman Daly, *From Uneconomic Growth to a Steady State Economy* (Brookfield, Vermont : Edward Elgar, 2016), 131-44.

৪৪. Samir Amin, 'China 2013', *Monthly Review* 64, no. 10 (March 2013) : 14-33.

৪৫. Ludwig von Mises, *Nation, State, and Economy* (Indianapolis : Liberty Fund, 1983); Ludwig von Mises, *Socialism : An Economic and Sociological Analysis* (Indianapolis : Liberty Fund, 1981).

৪৬. Mises, *Socialism*, 323-54, 399-406, 413-62, 488-92; *Nation, State, and Economy*, 36-37, 143, 163-65.

৪৭. Mises, *Socialism*, 421-22.

৪৮. Phillip W. Magness, 'The Pejorative Origins of the Term "Neoliberalism"', American Institute for Economic Research, December 10, 2018; Alfred Meusel, 'Zur Brgerlichen Sozialkritik der Gegenwart : Der Neu-Liberalismus (Ludwig von Mises)', *Die Gesellschaft : Internationale Revue fr Sozialismus und Politik* 1, no. 4 (1924) : 372-83. (The article 'Der Neu-Liberalismus' was the first of a two-part series; the second article went on to critique Othmar Spann.) Peter Goller, 'Alfred Meusel als Kritiker von Ludwig Mises und Othmar Spann : Gegen 'Neolberalismus' and 'Neoromantik' (1924)', Mitteilungen der Alfred Klahr Gesellschaft 2 (2003); Peter Goller, 'Helene Bauer Gegen die Neoliberal Brgliche Ideologie von Ludwig Mises (1923)', *Mitteilungen der Alfred Klahr Gesellschaft* 4 (2005), http ://klahrgesellschaft.at—includes Helene Bauer, "Gemeine Mann' und ein Besserer Herr.' Adler strongly criticized Mises's attempt to claim that Marx's ideas were closely related to the traditional authoritarian Prussian state, on the grounds that everything outside of neoliberalism was essentially the same and that even democratic socialism was authoritarian in its rejection of liberalism. Max Adler, 'Excursus on Anarchism', in *Austro-Marxism : The Ideology of Unity*, ed. Mark E. Blum and William Smalldone (Boston : Brill, 2016), 207.

৪৯. Magness, 'The Pejorative Origins of the Term 'Neoliberalism'"; Meusel, 'Der Neu-Liberalismus', 383; Bauer, '"Gemeine Mann" und ein Besserer Herr'; Othmar Spann, Types of Economic Theory (London : George Allen and Unwin, 1930), 278-79 (reference to the 'neoliberal trend' first appeared in the 1926 edition). In his 1925 book Trends of Economic Ideas, the Swiss economist Hans Honegger wrote on theoretical neoliberalism, but, in contrast to Meusel's earlier treatment, he used it to address neoclassical economics instead of the neoliberalism of thinkers like Mises. See Dieter Plehwe, introduction to *The Road from Mount Plerin*, ed. Philip Morowski and Plehwe (Cambridge, Massachusetts : Harvard University Press, 2009), 10. The term mobile capital is often associated with Max Weber, where he made a brief allusion to it in his posthumous 1923 General Economic History, but the term in fact entered Marxian theory with the earlier analysis of international finance (and commercial) capital by Rudolf Hilferding. See Rudolf Hilferding, *Finance Capital* (London : Routledge, 1981), 342, 325-30; Max Weber, *General Economic History* (New York : Collier, 1961), 242.

৫০. Ludwig von Mises, *Liberalism* (Indianapolis : Liberty Fund, 2005), 9.

৫১. Kari Polanyi-Levitt and Marguerite Mendell, 'The Origins of Market Fetishism', *Monthly Review* 41, no. 2 (June 1989) : 11-32; Johannes Maerk, 'Plan Oder Markt : The Battle of Ideas Between Austro-Marxism and Neoliberalism in Vienna' (lecture, Institute for the Humanities, Simon Fraser University, Burnaby, British Columbia, Canada, September 13, 2016). Available at http ://youtube.com.

৫২. Karl Polanyi, *The Great Transformation* (Boston : Beacon, 1944); Felix Schaffer, 'Vorgartenstrasse 203 : Extracts from a Memoir', in Karl Polanyi in Vienna, ed. Kenneth McRobbie and Kari Polanyi-Levitt, (Montreal : Black Rose, 2006), 328-46; Kari Polanyi-Levitt, 'Tracing Polanyi's Institutional Political Economy to its Central European Source', in Karl Polanyi in Vienna, 378-91; Eduard Mrz, *Joseph Schumpeter : Scholar, Teacher, and Politician* (New Haven : Yale University Press, 1991), 101.

৫৩. Gareth Dale, *Karl Polanyi : A Life on the Left* (New York : Columbia University Press, 2016), 102-3.

৫৪. Harry Magdoff, 'International Economic Distress and the Third World', *Monthly Review* 33, no. 11 (April 1982) : 3-5.

৫৫. These economic developments are presented in great detail, as a running commentary, in the extraordinary set of books, based on collected articles, written by Harry Magdoff and Paul Sweezy in the late 1960s to the late 1990s : Paul M. Sweezy and Harry Magdoff, *The Dynamics of U.S. Capitalism* (New York : Monthly Review Press, 1972); Paul M. Sweezy and Harry Magdoff, *The End of Prosperity* (New York : Monthly Review Press, 1973); Paul M. Sweezy and Harry Magdoff, *Stagnation and the Financial Explosion* (New York : Monthly Review Press, 1987); and Paul M. Sweezy and Harry Magdoff, *The Irreversible Crisis* (New York : Monthly Review Press, 1988).

৫৬. Hannah Holleman, Robert W. McChesney, John Bellamy Foster, and R. Jamil Jonna, 'The Penal State in an Age of Crisis', *Monthly Review* 61, no. 2 (June 2009) : 2.

৫৭. Friedrich von Hayek, *The Road to Serfdom* (London : Routledge, 1944). As Paul Sweezy wrote of Hayek's The Road to Serfdom, 'the choice of liberalism—in the sense of individualism and competition—as the standard of judgment, deviation from which is to be regarded as error, permits him to lump all anti-individualist thought and policy together as simply totalitarian.' Paul M. Sweezy, *The Present as History* (New York : Monthly Review Press, 1953), 285.

৫৮. John Kenneth Galbraith, *American Capitalism : The Concept of Countervailing Power* (London : Hamish Hamilton, 1957).

৫৯. Philip Mirowski, *Never Let a Serious Crisis Go to Waste* (London : Verso, 2013), 24, 37-50; David Stedman Jones, *Masters of the Universe* (Princeton : Princeton University Press, 2012). Mirowski and Jones, despite providing detailed accounts of the formation of neoliberalism in the post-Second World War years, have little or no awareness of the Marxian (and other) critiques of neoliberalism in the 1920s, nor of the conflict as it arose in the context of Red Vienna.

৬০. Michel Foucault, *The Birth of Biopolitics* (New York : Palgrave McMillan, 2008), 317. An extreme example of such naturalization is the corporate use of the term ecosystem to refer to commodity supply chains, such as Apple's ecosystem—a way of avoiding reference to the system of exploitation embedded in the global labor arbitrage. See John Patrick Leary, *Keywords : The New Language of Capitalism* (Chicago : Haymarket, 2018), 72-76.

৬১. Friedman's role as a spokesperson of neoliberalism is well known. On the role of James Buchanan, see Nancy McLean, *Democracy in Chains* (New York : Viking, 2017).

৬২. Foucault, *The Birth of Biopolitics*, 133-38; Mirowski, *Never Let a Serious Crisis Go to Waste*, 64; Mises, *Socialism*, 344-51. In his memoirs, Stigler emphasized that a key objective of the Chicago School of Economics, and of neoliberalism more generally, was the destruction of the concept of monopoly power in order to counter 'the growing socialist critique of capitalism [that] emphasized monopoly'; '"monopoly capitalism' is almost one word in that literature'. George J. Stigler, *Memoirs of an Unregulated Economist* (New York : Basic, 1988), 92, 162-63.

৬৩. Avner Offer and Gabriel Sderberg, *The Nobel Factor* (Princeton : Princeton University Press, 2016), 101, 130-31.

৬৪. See John Cassidy, *How Markets Fail* (New York : Farrar, Straus, and Giroux, 2009), 3-110; Foster and McChesney, *The Endless Crisis*, 1-28.

৬৫. On how neoliberalism took on new significance in the age of the financialization of the accumulation process, see Grard Dumnil and Dominique Levy, *Capital Resurgent : Roots of the Neoliberal Revolution* (Harvard : Harvard University Press, 2004), 119-20, 156-67; Foster and McChesney, *The Endless Crisis*, 44-45.

৬৬. Foster and McChesney, *The Endless Crisis*, 4, 18. On the concentration of wealth, see Thomas Piketty, *Capital in the Twenty-First Century* (Cambridge, Massachusetts : Harvard University Press, 2014), 336-76.

৬৭. Smith, *Imperialism in the Twenty-First Century*; Ernesto Screpanti, *Global Imperialism and the Great Crisis* (New York : Monthly Review Press, 2014).

৬৮. Foster and McChesney, '*Surveillance Capitalism.*'

৬৯. Prabhat Patnaik, *The Value of Money* (New York : Columbia University Press, 2009).

৭০. Mirowski, *Never Let a Serious Crisis Go to Waste*, 1-6.

৭১. Karl Marx, 'The Value-Form', *Capital & Class* no. 4 (1978) : 134.

৭২. Fred Magdoff and Chris Williams, *Creating an Ecological Society* (New York : Monthly Review Press, 2017), 25-47.

৭৩. Andreas Malm, *Fossil Capital* (London : Verso, 2016).

৭৪. James K. Galbraith, *The Predator State* (New York : Free Press, 2008); Foucault, *The Birth of Biopolitics*, 133.

৭৫. Mirowski, *Never Let a Serious Crisis Go to Waste*, 56-57; Foucault, *The Birth of Biopolitics*, 131.

৭৬. Foucault, *The Birth of Biopolitics*, 131, 145.

৭৭. Mirowski, *Never Let a Serious Crisis Go to Waste*, 57; McLean, Democracy in Chains.

৭৮. Marco Boffo, Alfredo Saad-Filho, and Ben Fine, 'Neoliberal Capitalism : The Authoritarian Turn', in *Socialist Register* 2019, 256.

৭৯. Polanyi's *Great Transformation* was a critique of the neoliberalism of theorists like Mises and Hayek who in the context of Red Vienna had argued for a self-regulating market economy and devised the main tenets of what is now known as neoliberalism. However, Polanyi's powerful critique was also meant to reflect a moment of triumph, the defeat of neoliberal tendencies in the form of the 'great transformation.' It is ironic, therefore, that the Mont Plerin Society was

established the year after the publication of Polanyi's book, and it was only with the rise to power of neoliberalism in the 1970s and '80s that the current fascination with Polanyi emerged.

৮০. See Robert W. McChesney, foreword to *Trump in the White House*, 7-13.

৮১. Mises, *Liberalism*, 30. See also Herbert Marcuse, *Negations* (Boston : Beacon, 1968), 10.

৮২. Hayek quoted in Renato Cristi, Carl Schmitt and Authoritarian Liberalism (Cardiff : University of Wales Press, 1998), 168.

৮৩. Friedrich von Hayek, *Individualism and Economic Order* (London, 1949), 22; Paul A. Baran, 'On Capitalism and Freedom', *Monthly Review* 42, no. 6 (November 1990) : 36.

৮৪. Foucault, *The Birth of Biopolitics*, 164.

৮৫. Eric Hobsbawm, *The Age of Extremes* (New York : Vintage, 1994), 584-85.

৮৬. Hobsbawm, *The Age of Extremes*, 563, 569.

৮৭. See Edward Said, 'Contra Mundum', *London Review of Books* 17, no. 5 (1995) : 22-23; Justin Rosenberg, 'Hobsbawm's Century', *Monthly Review* 47, no. 3 (July-August 1995) : 139-56; Eugene Genovese, 'The Age of Extremes—Review', *New Republic*, April 17, 1995.

৮৮. Polanyi, *The Great Transformation*, 76.

৮৯. Michael D. Yates, *Can the Working Class Change the World?* (New York : Monthly Review Press, 2018), 134.

৯০. Jrgen Randers, 2052 : A Report to the Club of Rome Commemorating the Fortieth Anniversary of the 'Limits to Growth' (White River Junction, Vermont : Chelsea Green, 2012), 14-15, 19-23, 210-17, 248-49, 296-97.

৯১. Jacob Burckhardt, *Reflections on History* (Indianapolis : Liberty, 1979), 213, 224.

৯২. Georges Lefebvre, *The Coming of the French Revolution* (Princeton : Princeton University Press, 1947), 212.

৯৩. John Bellamy Foster, 'Capitalism and the Accumulation of Catastrophe', *Monthly Review* 63, no. 7 (December 2011) : 1-17.

৯৪. Yates, *Can the Working Class Change the World?*, 184-85.

৯৫. Paul M. Sweezy, 'Socialism and Ecology', *Monthly Review* 41, no. 4 (September 1989) : 5.

৯৬. Karl Marx and Frederick Engels, *Collected Works*, vol. 1 (New York : International, 1975), 157.

৯৭. Joseph Schumpeter, *Capitalism, Socialism, and Democracy* (New York : Harper and Row, 1942), 61. Schumpeter was a genuine product of the Austrian School of Economics, but he was, at the same time, a very independent thinker. He was the first to provide a strong criticism of Mises's notion that a rational price system could not be developed under socialism. His independence was shown by his willingness to serve as finance minister in a socialist government. See Mrz, Joseph Schumpeter, 99-113, 147-63.

৯৮. Schumpeter, *Capitalism, Socialism, and Democracy*, 143.

৯৯. As Antonio Negri emphasizes, an inclusive, class-based movement starts with a 'social concept' of class divorced from a merely economic construction. This means that the question of the working class cannot be separated from issues such as women's domestic work, the environment, race formation, and so on. Antonio Negri, 'Starting Again from Marx', *Radical Philosophy* 203 (2018).

দর্শন

বিচ্ছিন্নতার বয়ান : বাইবেলীয় ধারণার মার্ক্সবাদী তত্ত্বে উত্তরণ

মুহাম্মদ তানিম নওশাদ

সারসংক্ষেপ

দার্শনিক জায়গা থেকে মানুষ পর্যবেক্ষণের কাজে মার্ক্স অনেক চিত্তাকর্ষক তত্ত্বের উপস্থাপনা করেছেন। তার অন্যতম একটি হলো বিচ্ছিন্নতার (alienation) তত্ত্ব। তবে এই তত্ত্বের মূল ভিত্তি বাইবেলের আদি পুস্তক (The old Testament)। সেখানে আব্রাহামীয় বিশ্বাসের অনুসারী মানুষদের সম্পর্কে বয়ান প্রথম হাজির হয়েছে। আর বাইবেলের আদি পুস্তকের ভিত্তিগুলোর মধ্যে অন্যতম গিলগামেশের মহাকাব্য। সেখানেও বিচ্ছিন্নতার ধারণার শিকড় প্রোথিত রয়েছে। ইউরোপে রেনেসাঁ-পরবর্তী সময়ে হুগো গ্রোটিয়াস থেকে শুরু করে হবস, লক, রুশো হয়ে হেগেল পর্যন্ত বিচ্ছিন্নতার ধারণা পরিবর্ধিত, পরিমার্জিত হয়ে নানাভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। আর মার্ক্স এই ধারণার সবচেয়ে সম্প্রসারিত ব্যাখ্যা হাজির করেছেন। এই প্রবন্ধে বিচ্ছিন্নতার ধারণার ক্রমবিবর্তন ও ইতিহাস আলোচনা করা হয়েছে। সেই সঙ্গে মানুষের শ্রমের পর্যালোচনায় এ ধারণার কার্যকর ব্যবহার নিয়ে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে। ফ্র্যাঙ্কফুর্ট বিদ্যানিকেতনের প্রাজ্ঞজন এরিখ ফ্রমের সঙ্গে এই তত্ত্বের অপরাপর চিন্তাবিদ ও দার্শনিকদের বিশ্লেষণও বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে বিস্তৃতভাবে হাজির করা হয়েছে। বর্তমান যুগে মানবসত্তার বিশ্লেষণে এই তত্ত্ব কতটা কার্যকরী, তা খতিয়ে দেখাও এই প্রবন্ধের অন্যতম উদ্দেশ্য।

১.

Wir haben bisher die Entfremdung, die Entuerung des Arbeiters nur nach der einen Seite hin betrachtet, nmlich sein Verhltnis zu den Produkten seiner Arbeit. Aber die Entfremdung zeigt sich nicht nur im Resultat, sondern im Akt der Produktion, innerhalb der produzierenden Ttigkeit selbst.

'আমরা এত দিন পর্যন্ত শ্রমিকের বিচ্ছিন্নতা, বিযুক্তিকে শুধু একটি নিরিখে বিবেচনা করেছি, আর তা এককথায় উৎপাদনের সঙ্গে শ্রমিকের সম্পর্কের নিরিখে।

কিন্তু বিচ্ছিন্নতা শুধু ফলাফলের মধ্য দিয়ে নিজেকে প্রকাশ করে না, উৎপাদনকর্মেও সে প্রকাশিত হয় উৎপাদনশীল তৎপরতার মধ্যে অবস্থান করে' (কার্ল মার্ক্স, *ইকোনমিক অ্যান্ড ফিলোসফিক ম্যানুস্ক্রিপ্ট*, ১৮৪৪)।

মার্ক্সীয় দর্শন অনুসারে বিচ্ছিন্নতার ধারণা মানুষের ঐতিহাসিক পথচলার এক অনবদ্য পরিণতি। মার্ক্স-এঙ্গেলসের লেখালেখিতে আমরা যেটা পাই, তা হলো, ব্যক্তিগত সম্পদ সৃষ্টির কারণে সমাজ যখন ধনী-গরিব (জার্মানে die Begterten und die Habenichtse)—এই দুই কাতারে বিভক্ত হলো, তখন দরিদ্র যারা কৃতদাসে (জার্মানে Sklave বা Hrige) বা ভূমিদাসে (জার্মানে Leibeigene) রূপান্তরিত হলো, তারা নিজেদের সত্তাগত জায়গা থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করল। অবশ্য এর আগে সে তার উৎপাদন সরঞ্জাম, তার সৃজনশীলতা এবং তার স্বজাতির সঙ্গে নিজের বিচ্ছিন্নতার সূত্রপাত্র ঘটিয়েছে। কয়েক প্রজন্মে ওই দাসশ্রেণি তার নিজের সত্তা বা সারবত্তা (জার্মানে Dasein বা Wesen) থেকে তার বিচ্ছেদ চূড়ান্ত করেছে। ভুলে গেলে চলবে না, ইউরোপে দর্শনচর্চা সার্বিক অর্থে শুরু হয়েছে ক্যাথলিক রোমের খ্রিষ্টধর্মীয় কর্তৃত্বকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে এবং বাইবেলের বস্তুনিষ্ঠ পর্যালোচনার প্রয়োজনীয়তা থেকে। ফলে বিচ্ছিন্নতার ধারণাও তার ব্যতিক্রম নয়। বাইবেলের পুরোনো সন্ধির আদি পুস্তকের (Genesis) তৃতীয় অধ্যায়ে আছে যে স্বর্গোদ্যানে যখন আদম ও হাওয়া বাস করছিলেন, তখন সাপের পরামর্শে হাওয়া নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল খাওয়াতে এবং আদমকেও তা খেতে প্ররোচিত করার কারণে তাঁদের মধ্যে এক নতুন উপলব্ধির জগৎ উন্মোচিত হয়। তাঁরা আবিষ্কার করলেন যে ঈশ্বরের কর্তৃত্বের বাইরেও তাঁদের আলাদা ব্যক্তিত্ব আছে এবং নিজেদের মতো করে জগৎকে উপলব্ধির জায়গা আছে। পরিণতিতে আদিতে তাঁরা ঈশ্বর বা প্রকৃতির বা সমগ্রের সঙ্গে যে অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন, তা থেকে বিচ্ছিন্ন হলেন। এতে ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ ও মূল্যবোধের জায়গা থেকে তাঁদের জন্য ভালো কি মন্দ হলো, আমরা সে আলোচনায় যাচ্ছি না। কিন্তু বিচ্ছিন্নতার সূত্রপাত এখান থেকেই (নওশাদ, ২০১৯, পৃ : ১৪২)।

যাহোক, ইহুদি ও খ্রিষ্টধর্মে এ-ই হলো আদি পাপ (The Original Sin)। তবে বাইবেলের বিচ্ছিন্নতার ইতিহাস এখানেই শেষ নয়। ফ্র্যাঙ্কফুর্ট বিদ্যানিকেতনের অন্যতম পুরোধা এরিখ ফ্রম (১৯০০-১৯৮০) বাইবেলের পুরোনো সন্ধির আরেক প্রস্থ উদাহরণ টেনেছেন। ফ্রম বলছেন যে আব্রাহামীয় বিশ্বাসের অনুসারীরা বলেন যে তাঁরা একজন মাত্র ঈশ্বরের ভজনা করেন। কিন্তু সাকার বিশ্বাসের ধারায় তাঁরা ঈশ্বরের শারীরিক রূপ দেন এবং তা হয় নানাবিধ। আর মানুষ তার নিজের গড়া মূর্তির সামনে প্রণতি জানায়, তার প্রতি আনত হয়। এই প্রতিমা পূজায় ব্যক্তি তার সত্তা হারিয়ে ফেলে, সেই সঙ্গে তার সঙ্গে বিলুপ্ত হয় তার সৃজনশীলতা আর জীবনী

শক্তি। এরিখ ফ্রম বাইবেলের পুরোনো সন্ধি থেকে উদ্ধৃত করেন, '(ওই সব মূর্তির) চোখ আছে কিন্তু তারা দেখে না, কান আছে কিন্তু তারা শোনে না [...]। ওই মূর্তির মধ্যে তার স্রষ্টা যেটুকু সৃজনশীলতা আবিষ্কার করে, সে বোঝে না যে তা ওই মূর্তির নয়, বরং তার নিজের আরোপিত' (Fromm, 2005, পৃ. ৫১)।

প্রখ্যাত হাঙ্গেরীয় মার্ক্সবাদী দার্শনিক ইস্টভান মেসজারোস (১৯৩০-২০১৭) দেখিয়েছেন যে নিজেদের ঈশ্বরের নির্বাচিত জাতি বলে ইহুদি জাতি নিজেদেরই সমগ্র মানবজাতি থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছে। যেমন তিনি বাইবেলের পুরোনো সন্ধি থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে জুদাহ বলেছেন, 'তোমরা আমার কোনো নিজেদের লোককে টাকা ধার দিয়ে সুদখোর হোয়ো না, আর নিজেদের ঘাড়েও সুদের ভার নিয়ো না। সুদ খাওয়াটা তোমরা ভিন্ন জাতির সঙ্গে বনিবনাতেই সীমাবদ্ধ রেখো, নিজের ভাইদের মধ্যে নয়।' অন্যদিকে যিশুর তত্ত্ব 'আমার কোনো নিজেদের লোক' এবং 'ভিন্ন জাতির লোকের' মধ্যকার ব্যবধান ও দ্বন্দ্ব ঘুচিয়ে মানবজাতির মধ্যকার সর্বজনীন ভ্রাতৃত্বের অবতারণা কোরো (Meszaros, 1970, পৃষ্ঠা. ৫)।

এই বরাতে মেসজারোস মার্ক্সকে উদ্ধৃত করে বলছেন যে ইহুদি ধর্ম যে অশোধিত, পুরোদস্তর আত্মকেন্দ্রিক, নিজেদের মধ্যে সংঘবদ্ধ, ব্যবহারিক ও তত্ত্বীয় জায়গায় পক্ষপাততুষ্ট, তাতে সে খ্রিষ্টধর্মের অস্পষ্ট তত্ত্বীয় সর্বজনীনতাকে তার আত্মকেন্দ্রিকতা দিয়ে অধিকার করতে পারে। [...] মার্ক্সের মতে, খ্রিষ্টধর্মের সর্বজনীনতাও বিচ্ছিন্নতার ছেদচিহ্ন টানতে অনেকাংশেই অক্ষম (Karl Marx, On Jewish Question)। এর কারণ সম্ভবত ওই সর্বজনীনতা তার নিজ জনগণের অর্থাৎ অন্য ইহুদিদের সঙ্গে বিচ্ছিন্নতার অবতারণা করে। ফলে বিচ্ছিন্নতাকে নানাভাবে বোঝার অবকাশ আছে।

ব্যাবিলনের প্রাচীন গাথা, যেটি গিলগামেশের মহাকাব্য নামে সর্বজনবিদিত এবং অনেকে যেটিকে হিব্রু বাইবেলের প্রথম সন্ধির উৎস হিসেবে বিবেচনা করেন, সেখানেও আমরা বিচ্ছিন্নতার আভাস পাই। ২ হাজার ৮০০ থেকে ২ হাজার ৫০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দের মধ্যে কোনো একসময় আক্কাডিয়ান রাজা গিলগামেশ প্রাচীন ব্যাবিলনে ইউফ্রেটিস ও টাইগ্রিস নদীর কোল ঘেঁষে রাজত্ব করতেন, যদিও গিলগামেশের মহাকাব্যের ঐতিহাসিকতা নিয়ে মতভেদ আছে। দৈব সৌন্দর্যের অধিকারী গিলগামেশ 'এরেখ' রাজ্যের রাজা হয়েছিলেন। মনে করা হয়, এই এরেখ থেকেই ইরাক নামের সূত্রপাত। যাহোক, প্রথম যৌবনে গিলগামেশের মধ্যে অনেক অস্থিরতার প্রাবল্য থাকলেও পরে বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মধ্যে গাম্ভীর্য আসে, চরিত্রে স্থৈর্যের আবির্ভাব ঘটে। তাঁর প্রতিপক্ষ 'এংকিদু'কে তৈরি করেন দেবতা অরুরু, যার মধ্যে দেবতা চিত্রায়িত করেন প্রকৃতির সরলতা ও স্বাভাবিক সৌন্দর্য। প্রকৃতির সঙ্গে বেড়ে ওঠে সে, তৈরি হয় তার প্রকৃতির সঙ্গে এক অবিচ্ছেদ্য বন্ধন। হরিণের পালের সঙ্গে সে ঘুমায়, গাভির স্তন্য পান করে তার তৃষ্ণা মেটে। বনের জীবজন্তুদের

রক্ষাকবচে পরিণত হয় সে। এরেখের শিকারিদের ফাঁদ সে নষ্ট করে দেয়। সব জেনে ও শুনে গিলগামেশ শিকারিদের শহরের সবচেয়ে সুন্দরী বারাঙ্গনাকে সঙ্গে নিতে বলেন এংকিদুর জন্য। সেই সুন্দরী এংকিদুর সামনে বিবসনা অবস্থায় হাজির হলে এংকিদু তার সঙ্গে উন্মত্ত হয়। তার সঙ্গে অন্তরঙ্গ সময় কাটানোর পরে এংকিদু লক্ষ করে, পশুপাখিরা আর তার বশে নেই। নগরীর নগরকেন্দ্রিক যৌনতার ছোঁয়ায় সে প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে। তাই পশুপাখি তাকে সভয়ে এড়িয়ে চলছে (আরিফ, ২০১৯, পৃ. ৭-৮)।

এই হলো বিচ্ছিন্নতার সূত্রপাত। এখানে এংকিদু যেন আদম। আর ওই বারাঙ্গনা যেন হাওয়া। তাদের দৈহিক অন্তরঙ্গতা অর্থাৎ যৌনতা যেন সেই নিষিদ্ধ ফল, যা সাপের প্ররোচনায় আদম ও হাওয়া খেয়েছিল, আর যা ঈশ্বর তথা প্রকৃতি থেকে আদম ও হাওয়াকে বিচ্ছিন্ন করল। গিলগামেশের মহাকাব্যে বিচ্ছিন্ন হলো এংকিদু। এই মহাকাব্যের প্রতিচ্ছবি এভাবে পরে হিব্রু বাইবেলের ওপর পড়েছে, যা সর্বজনবিদিত। এরপর বারাঙ্গনা এংকিদুকে জঙ্গল ছেড়ে শহরে যেতে প্ররোচিত করল এবং এংকিদু তার অভিমতে সায় দিল। এ যেন আদমের স্বর্গোদ্যান তথা প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার আরেক প্রকাশ। নিষিদ্ধ ফলকে যৌনতার সঙ্গে তুলনা করছি বা যৌনতার রূপক ছিল বলছি এ কারণে যে স্বর্গোদ্যানে নিষিদ্ধ ফল খাওয়ার আগে কিন্তু আদম ও হাওয়া কোনো সন্তান উৎপাদন করেননি। যাহোক এরপরই প্রকৃতি, সমগ্র কিংবা ঈশ্বরের সঙ্গে তাঁদের বিচ্ছেদের সূত্রপাত হয় অর্থাৎ বিচ্ছিন্নতার আবির্ভাব ঘটে। এর সঙ্গে গিলগামেশের মহাকাব্যের চরিত্রগত মিল আছে। এ কারণেই বোধ হয় ইহুদি-খ্রিষ্টধর্মে যৌনতাকে এত নেতিবাচকভাবে দেখা হয়। আর ক্যাথলিক বিশ্বাসে বলা হয়, মানুষের জন্ম হয় পাপের মধ্য দিয়ে। এ কারণেই খ্রিষ্টধর্মে বিশ্বাসের বচন হলো, একমাত্র যিশুই পাপমুক্ত, কারণ তাঁকে নিষ্পাপ রাখতে ঈশ্বর পিতৃহীনভাবে কুমারী মরিয়মের গর্ভে জন্ম দিলেন।

মেসজারোস ইহুদি ও খ্রিষ্টধর্মের মধ্যে কিছু পার্থক্য অবলোকন করেছেন। তাঁর মতে, ইহুদি ধর্ম পক্ষপাততুষ্ট আর খ্রিষ্টধর্ম সর্বজনীন। সেই সঙ্গে ইহুদি ধর্ম একাধিপত্যবাদী আর খ্রিষ্টধর্ম প্রতিযোগিতামূলক। এ বয়ান মূলত অর্থ ও ক্ষমতাকেন্দ্রিক। ক্যাথলিক সমাজের আলোচনা নির্দ্বিধায় বলা চলে এ অনুষঙ্গের বাইরে। কর্তৃত্ববাদী ক্যাথলিক সমাজ ছিল সামন্তবাদী। ফলে পুঁজিবাদের বিকাশে তার ভূমিকা তেমন নেই। ইহুদি ধর্মে অর্থ সঞ্চয়ের ও নিজেদের মধ্যকার অর্থনৈতিক শ্রীবৃদ্ধির ব্যবস্থা আছে। কিন্তু এসবই শুধু তাদের নিজেদের জন্য। ফলে তারা পক্ষপাততুষ্ট। খ্রিষ্টধর্মে ইহুদিদের মতো জেনটাইল (Gentile) বা গোয়িমের (Goyim) ধারণা অর্থাৎ অ-ইহুদি কি ইহুদি—এ মেরুকরণ নেই। ফলে সে সর্বজনীন। কিন্তু সর্বজনীনতা তৈরি করে প্রতিযোগিতার উন্মুক্ত ক্ষেত্র, যেহেতু অর্থ ও ক্ষমতার ক্ষেত্র

মানুষের সংখ্যার তুলনায় সীমিত। ক্যাথলিক কর্তৃত্বকে খর্ব করে তৈরি হলো প্রটেস্ট্যান্ট মতাদর্শ, যা আবার কালে বহুভাগে বিভক্ত হলো। কারণ, কর্তৃত্ব ও ক্ষমতার প্রশ্নে খ্রিষ্টধর্ম প্রতিযোগিতামূলক। প্রটেস্ট্যান্ট মতাদর্শ সম্পদ তৈরি ও সঞ্চয়ের পক্ষপাতী। ফলে তার নিজের লোকদের মধ্যে প্রতিযোগিতার অবকাশ তৈরি করে তা তাদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতার আরেক সম্ভাবনাকে নিশ্চিত করল (Istvan Meszaros, 1970, পৃ. ৬-৭)।

২.

ইস্টভান মেসজারোস দেখিয়েছেন যে ইউরোপে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা সামগ্রিকভাবে কায়েম হওয়ার আগে, অর্থাৎ সামন্তবাদী সমাজে সবকিছুর মূল্যায়ন বিশেষত যখন অর্থের মাপকাঠিতে হচ্ছিল, সেখানে অবধারিতভাবে বিচ্ছিন্নতার অবতারণা হচ্ছিল। আর বুর্জোয়া সমাজের পত্তনের পর সেটা যে আরও ব্যাপকভাবে শুরু হবে, তা বলাই বাহুল্য। ফলে সামন্তবাদী সমাজের শেষভাগে এবং বুর্জোয়া ব্যবস্থা পত্তনের পর সবকিছুর মাপকাঠি হলো তার বিক্রয়ের উপযুক্ততা। এতে সবকিছুর সত্তারই অন্তর্ধান হলো, বহাল থাকল শুধুই তাদের বস্তুগত উপযোগিতা এবং পয়সার মাপকাঠিতে মূল্যায়ন। যে কারণে থমাস ম্যুনসার (Thomas Muntzer, ১৪৮৯-১৫২৫) মার্টিন লুথারের (১৪৮৩-১৫৪৬) ধর্ম সংস্কারের সমালোচনা করলেন এভাবে, 'মেনে নেওয়া কঠিন যে প্রতিটি সৃষ্টিকেই পরিণত হতে হচ্ছে সম্পত্তিতে—পানির মাছ, আকাশের পাখি, পৃথিবীর গাছপালা।' ম্যুনসার এই পণ্য-সমাজের বিষোদ্‌গার করেছেন, বিরুদ্ধাচরণ করেছেন এই সর্বজনীন বিক্রয়োপযুক্ততার। এখানে আরেকটি বিষয় স্মর্তব্য। লুথার আদি পাপের কারণে মানুষের স্বর্গ থেকে পতন-তত্ত্বের বিরোধিতা করেছিলেন এ কারণে যে তিনি মনে করতেন, মানুষকে সবকিছুতেই স্বাধীন সিদ্ধান্ত নিতে হবে। ফলে আদম ও হাওয়ার নিষিদ্ধ ফল খাওয়ার সিদ্ধান্ত আদতে তাঁদের স্বাধীন সিদ্ধান্তই ছিল। অবশ্য বিষয়টি আরও তলিয়ে দেখার অবকাশ আছে। ইউরোপে যে ক্যাথলিকবিরোধী ধর্ম সংস্কার বাইবেলের ওপরেও হস্তক্ষেপ করেছে এবং বাইবেলের বিভিন্ন তথ্য ও বাণীর গ্রহণ-বর্জন চলেছে, তা অনেকাংশেই বুর্জোয়া আন্দোলনের দাবিগুলো ও বুর্জোয়াদের স্বার্থ মাথায় রেখে। এখন মানুষ যদি স্বাধীন না হয়, তবে ধর্মের ওপর এই হস্তক্ষেপ কী করে সম্ভব, বুর্জোয়া স্বার্থই বা কীভাবে রক্ষা করা যাবে? ভুলে গেলে চলবে না যে শেষ বিচারে লুথার বুর্জোয়াদেরই স্বার্থসিদ্ধি করেছেন। সাধারণ কৃষকদের স্বার্থের বিরুদ্ধাচারী লুথারের বক্তব্যেও তাদের প্রতি তাঁর মনোভাবের উপস্থাপন এঙ্গেলস এভাবে করেছেন, 'জ্ঞানীজন বলেন, *Cibus, Onus et Virga asino* (গাধার দরকার খাদ্য, বোঝা আর বেতের বাড়ি)। একজন কৃষকের ঘটে থাকে খড়। সে কথা বোঝে না এবং হয় নির্বোধ প্রকৃতির। তাই তার

দরকার বেত্রাঘাত, তার বিরুদ্ধে দরকার রাইফেল, সে এতে কথা শুনবে এবং এটাই তার জন্য উচিত।'

বলা বাহুল্য, জার্মানিতে ১৫ ও ১৬ শতাব্দীর ওই কৃষক আন্দোলন ছিল বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে তাঁদের স্বাধিকারের আন্দোলন এবং গূঢ়ার্থে তাঁদের বিচ্ছিন্নতার অবসানেরও আন্দোলন।

অ্যাডাম স্মিথ (১৭২৩-১৭৯০) বিষয়টিকে বস্তুনিষ্ঠভাবে অবলোকন করেছেন। তিনি বলেছেন যে বুর্জোয়া সমাজে ব্যক্তি বস্তুর ওপর কর্তৃত্বের দাবিদার হয় রাজার আদেশে, দাবি ছাড়েও রাজার ইচ্ছায়। এই পর্যালোচনা তাঁর চতুর্দশ শতাব্দীর ইউরোপকে কেন্দ্র করে। সমাজে বুর্জোয়াতন্ত্র বিকাশের জন্য দরকার পণ্যকে রাজার কর্তৃত্ব থেকে তার 'মুক্ত বিচ্ছিন্নতা' নিশ্চিত করার। আর এ ক্ষেত্রে তিনি টমাস হবসের (১৫৮৮-১৬৭৯) সঙ্গে একমত। ফলে বুর্জোয়াতন্ত্রের বিকাশের মূল সূত্রের প্রতিষ্ঠা স্বভাবতই পণ্যের উৎপাদন ও সরবরাহকে স্বাধীন করার মধ্য দিয়ে তার ওপর ধর্মের, পাদ্‌রির ও রাজার কর্তৃত্ব খর্ব করার মাধ্যমে।

এ জায়গায় ইমানুয়েল কান্ট (১৭২৪-১৮০৪) যে বয়ান দিয়েছেন, তা মার্ক্সের মতোই। বোঝা যায় বিচ্ছিন্নতার ধারণা তাঁর মার্ক্স থেকেই আহরিত। কান্ট মনে করতেন যে কোনো কিছুকে তার প্রকৃত মালিকের সান্নিধ্য থেকে সরিয়ে নেওয়াতে বিচ্ছিন্নতার সৃষ্টি হয় এবং ওই কিছুকে বস্তুগত চরিত্র দান করা বা বস্তুগত মূল্যায়ন করার মধ্য দিয়ে তার বিচ্ছিন্নতা পোক্ত হয়। কিন্তু কান্টের এই প্রকৃত মালিক কোনো একজন মানুষ, অর্থাৎ রাজা, সামন্ত প্রভু, সাধারণ প্রজা ইত্যাদি। মার্ক্সের বিচ্ছিন্নতার অবসান (de-alienation) সবকিছুর ক্ষেত্রেই সেই আদি প্রকৃত মালিকের করায়ত্তে, যাকে আমরা বলি 'প্রকৃতি' বা 'সমগ্র'। ফলে এক অর্থে বিচ্ছিন্নতার অবসানের মানে হলো বস্তুর বা ব্যক্তির বিক্রয়োপযুক্ততারও অবসান, যা নিয়ে সামনে আমাদের আরও আলোচনার অবকাশ আছে। কিন্তু এখানে একটা কথা বলে নেওয়া ভালো যে মেসজারোস মার্ক্সের মতোই দাস প্রথাকে স্বাভাবিক প্রাকৃতিক ব্যবস্থা বলে মানেননি। ফলে গ্রিস দেশে অ্যারিস্টটল (৩৮৪-৩২২ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ) দাস প্রথাকে যে স্বাভাবিক বা প্রাকৃতিক বলেছেন, মেসজারোস তার বিষোদ্‌গার করেছেন। মানুষ স্বভাবতই স্বাধীন বলে তিনি উল্লেখ করেছেন। সম্পদের অসম বণ্টনই দাস প্রথার নির্ণায়ক। আর সব মার্ক্সবাদীর মতো মেসজারোসও তা-ই মনে করতেন।

৩.

অ্যারিস্টটলসহ আর যারাই ইতিহাসকে প্রাকৃতিক ও দৈবনির্ধারিত এবং তার ফলে জৈবিক বলে চাউর করেছেন এবং দাসপ্রথাকে তার অনিবার্য পরিণতি আকারে হাজির করেছেন, মেসজারোস ওই সব ব্যাখ্যাকে অনৈতিহাসিক বলে বিবৃত করেছেন। তিনি

শ্রেণিবিভক্ত সমাজ দৈবাজ্ঞাধীন ও প্রকৃতি-নির্ধারিত—এই বয়ানকে এবং তার ফলে সৃষ্ট প্রাকৃতিক মডেলকে ঐতিহাসিকতার তরলীকরণ বলে অভিহিত করেছেন। পরবর্তীকালে মধ্যযুগেও ধর্মের নিক্তিতে মানুষের মধ্যকার বৈষম্যকে যে বিজ্ঞানভিত্তিক বলে প্রতিষ্ঠিত করার নৃবিজ্ঞান গড়ে ওঠে, তাকেও মেসজারোস ছদ্ম-নৃবিজ্ঞান বলে আখ্যায়িত করেছেন। লুডভিগ ফয়েরবাখ (১৮০৪-১৮৭২) প্রথম সত্য ও ধর্মাশ্রিত বয়ানের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে গিয়ে ধর্মতত্ত্ব ও নৃবিজ্ঞানের মধ্যে মেরুকরণ করেন। কিন্তু তারও আগে ভিকো (Giambattista Vico, ১৬৬৮-১৭৪৪) মানবতার বিকাশের সময়কে তিন ভাগে ভাগ করেন, যথা ১. দেবতাদের যুগ, ২. বীরদের যুগ এবং ৩. মানুষের যুগ। আর ভিকোর মানুষের যুগে সব মানুষই সমান; ফলে দাস প্রথার নামে বিচ্ছিন্নতার বিরুদ্ধে এ এক বলিষ্ঠ কুঠারাঘাত।

তবে ভিকো যেমনটা বলেছেন যে প্রকৃতিগতভাবে সব মানুষই সমান—এই বিষয়টা কিছুটা বিমূর্ত। দিদেরো (Denis Diderot, ১৭১৩-১৭৮৪) বরং বাস্তবিক জগতের প্রেক্ষাপটে বিষয়টি সুস্পষ্ট করেছেন। ফরাসি এনলাইটেনমেন্ট বা আলোকিতকরণের যুগে তিনি বলেছেন, যদি শ্রমিকেরা দুর্ভোগ পোহায়, তবে তা জাতির জন্য হবে দুর্ভাগ্যজনক। ফলে অর্থনৈতিকভাবে মানুষকে সমান করার চেষ্টা করতে হবে অথবা কোনোভাবে তাতে সমতা আনতে হবে।

৪.

মার্ক্স জার্মান ভাবাদর্শে হবসীয় দর্শনের সূত্রপাত নিয়ে আলোচনা করেছেন। হবস মনে করতেন, প্রকৃতির মধ্যে যে স্ববিরোধিতা রয়েছে, তাতেই মানুষ বাহ্যত গোষ্ঠীবদ্ধ, কিন্তু স্বার্থসংশ্লিষ্ট চেতনাগত জায়গায় প্রত্যেকে বিচ্ছিন্ন। যার ফলে স্বার্থসংশ্লিষ্ট কারণে মানুষের মধ্যে যে যুদ্ধ, তা হলো প্রত্যেকের যুদ্ধ প্রত্যেকের সঙ্গে, লাতিনে হোমারের ভাষায় Bellum omnium contra omnes। ফলে মার্ক্সের বিচ্ছিন্নতার চিন্তায় হবস অনেকটা ভূমিকা পালন করেছেন।

এরিখ ফ্রমের মতো অনেকে মনে করেন যে মার্ক্স বিচ্ছিন্নতার বয়ান ধার করেছেন হেগেল (Georg Wilhelm Friedrich Hegel, ১৭৭০-১৮৩১) থেকে। আমরা দেখলাম মার্ক্সের বিচ্ছিন্নতার ধারণায় হবসের ভূমিকা আছে। কিন্তু আমার মনে হয়, হেগেলের পূর্বে রুশোর (Jean-Jacques Rousseau, ১৭১২-১৭৭৮) বিচ্ছিন্নতার ধারণাই সবচেয়ে সুচিন্তিতভাবে উপস্থাপিত হয়েছে তাঁর বিখ্যাত *সোশ্যাল কন্ট্রাক্ট* বইয়ে। ১৭৬২ সালে যখন এই বই প্রকাশিত হয়, তখনো হেগেল জন্মগ্রহণ করেননি। মার্ক্স যেভাবে ভাবতেন যে ভূস্বামী ও ভূমিদাসের আবির্ভাবে ভূমিদাস একপর্যায়ে তার নিজসত্তা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়, রুশোর ধারণা পরিবারকেন্দ্রিকতা ও গোষ্ঠীতন্ত্রও বিচ্ছিন্নতার জন্ম দেয়। রুশো লিখেছেন, যেভাবে আমরা দেখি, পরিবার

হচ্ছে রাজনৈতিক সমাজের প্রথম উদাহরণ; যেখানে দলপতি হচ্ছেন পিতৃতুল্য আর জনগণ তাঁর সন্তানতুল্য। সবাই জন্মগতভাবে স্বাধীন এবং প্রয়োজনের বাইরে তারা বিচ্ছিন্ন নয়। সামগ্রিক পার্থক্যের জায়গাটা হচ্ছে পিতার ভালোবাসা, যেটি তিনি তাঁর সন্তানদের দেন। তার বিনিময়ও তিনি পান। রাষ্ট্রীয় পরিসরে হুকুমকর্তা হুকুম-আহকামের দণ্ড দিয়ে সেই ভালোবাসা অর্জন করতে পারেন না (দ্বিতীয় অধ্যায়, আদি সমাজ)।

তার মানে দেখা যাচ্ছে, গোষ্ঠীপ্রধান পিতৃবৎ স্নেহশীল হওয়ার পরও যেহেতু তার কথাই সর্বাগ্রে গুরুত্বপূর্ণ, ফলে ব্যক্তির নিজস্ব সৃজনশীলতা ও চিন্তা 'বিচ্ছিন্নতা'র শিকার হয়। মজার ব্যাপার হলো, হুগো গ্রোটিয়াস (Hugo Grotius, ১৫৮৩-১৬৪৫) রুশোরও আগে বিচ্ছিন্নতার ধারণা দিয়েছেন, কিন্তু রাজতন্ত্রের বশংবদ গ্রোটিয়াস তাঁর মতো করে বিচ্ছিন্নতার উপাদেয় দিকের বয়ান হাজির করেছেন। রুশো তা তাঁর সামাজিক চুক্তিতে উদ্ধৃত করেছেন।

গ্রোটিয়াস বলেন, যদি কোনো ব্যক্তি তার স্বাধীনতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তার প্রভুর ক্রীতদাস হতে পারে, তাহলে একটি রাজত্বে কেন জনগণ তাদের নিজেদের নিজ সত্তা থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাজার অধীনস্থ হতে দিতে পারবে না? (চতুর্থ অধ্যায়, ক্রীতদাসত্ব)।

হুগো গ্রোটিয়াসকে কটাক্ষ করে রুশো বলছেন, এ ক্ষেত্রে বহু দ্ব্যর্থক শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে (বিচ্ছিন্নতার) বিষয়টিকে ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে; আমরা বরং বিচ্ছিন্নতা শব্দটির ওপর মনোযোগ দিই। বিচ্ছিন্নতা মানে নিজেকে দেওয়া বা বিক্রি করা। এখন এক ব্যক্তির অন্য ব্যক্তির কাছে ক্রীতদাস হওয়ার অর্থ নিজেকে দেওয়া নয়, ওই ব্যক্তির বেঁচে থাকার তাগিদে নিজেকে খুবই স্বল্পমূল্যে বিকিয়ে দেওয়া (পূর্বোক্ত)।

লক্ষণীয় যে মার্ক্সের চিন্তায় রুশোর বয়ানের ছাপ আছে।

৫.

বিচ্ছিন্নতা বোঝানোর ক্ষেত্রে মার্ক্স তাঁর *ইকোনমিক অ্যান্ড ফিলোসফিক ম্যানুস্ক্রিপ্ট* (১৮৪৪) এবং *জার্মান ইডিওলজি* গ্রন্থে দুটি জার্মান শব্দ ব্যবহার করেছেন—যথা Entfremdung ও Entuerung, আর পরে *গ্রুনড্রিসে* গ্রন্থে আরেকটি শব্দ বাতলালেন, তা Veruerung। শন সেয়ার্সের (Sean Sayers) মতে, মার্ক্স Entfremdung বলতে বুঝিয়েছেন কোনো ব্যক্তির বা কোনো কিছুর বিযুক্তি বা বিচ্ছিন্নতা (ইংরেজিতে estrangement), আর সেই সঙ্গে Entuerung বলতে বুঝিয়েছেন কোনো ব্যক্তির বা কিছুর বহির্মুখীকরণ (ইংরেজিতে externalisation)। মার্ক্স প্রায়ই Entuerung শব্দটি পণ্যের মধ্যে আমরা কীভাবে আমাদের নিজেদের ছেড়ে দিই বা হারিয়ে ফেলি, তা বিবৃত করতে বুঝিয়েছেন। আর Entfremdung বলতে তিনি পণ্য যেভাবে আমাদের

বিরুদ্ধবাদী শক্তি হয়ে আমাদের বিরুদ্ধেই কাজ করে, তা ব্যাখ্যা করতে ব্যবহার করেছেন। অবশ্য মার্ক্স প্রায়ই শব্দ দুটির পারস্পরিক অর্থ অদল-বদল করেও ব্যবহার করেছেন (Sayers, 2011)। আর Veruerung অর্থগতভাবে বলা চলে Entfremdung-এর সমার্থক।

মার্ক্স বিচ্ছিন্নতার আলোচনার সূত্রপাত করেছেন তার *ইকোনমিক অ্যান্ড ফিলোসফিক ম্যানুস্ক্রিপ্ট (১৮৪৪)* গ্রন্থে। শ্রমের বিভাজনের কারণে কীভাবে মানুষ আত্মবিচ্ছিন্ন হয়, মার্ক্স এই খসড়ায় তা বিশদভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। এই খসড়ার একটি অধ্যায় 'বিচ্ছিন্ন শ্রম'। এখানেই মার্ক্স প্রথম বিচ্ছিন্নতার দার্শনিক আলোচনা শুরু করেন। মার্ক্স বলেছেন যে ব্যক্তিগত সম্পত্তির উদ্ভব এবং শ্রম বিভাজনের কারণে যারা দরিদ্র ও নিঃস্ব, তারা তাদের পুঁজিপতি প্রভুদের জাঁতাকলে পিষ্ট হয়ে পণ্যে রূপান্তরিত হয়, যে পণ্য আবার সব পণ্যসামগ্রীর মধ্যেও সবচেয়ে নিকৃষ্ট ও হতভাগ্য। পুঁজিপতিদের একক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার লড়াই এবং পুঁজিপতিদের নিজেদের মধ্যকার প্রতিযোগিতা ও আদান-প্রদান, তাদের লালসা এবং আগে থেকে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিগত সম্পদের উপস্থিতি, শ্রমবিভাজন, পুঁজি, ভূসম্পদ ইত্যাদির কারণে উদ্ভূত সামগ্রিক বিচ্ছিন্নতা তার সঙ্গে প্রচলিত অর্থব্যবস্থার সম্পর্কের ইঙ্গিত দেয়।

পুঁজিপতি বা মালিকের ইচ্ছায় যে শ্রম, তা-ই বিচ্ছিন্ন শ্রম। শ্রমিক যত পণ্য উৎপন্ন করে যত বিত্ত বৈভব তৈরি করেন এবং তাঁর পণ্য যত ক্ষমতা ও বলয় তৈরি করে, ততই তিনি আরও নিঃস্ব হন। যত পণ্য তিনি উৎপন্ন করেন, তত বেশি তুচ্ছ পণ্যে তিনি পরিণত হন। পণ্য দুনিয়ার এই শোষণ সরাসরি মানব দুনিয়ার অবমূল্যায়ন বৃদ্ধির সমানুপাতিক। মার্ক্স আরও বলছেন যে শ্রম শুধু পণ্য তৈরি করে না, সে নিজেকে এবং শ্রমিককেও পণ্য আকারে হাজির করে, আর সেই সঙ্গে সে সাধারণ পণ্য তো একাধারে তৈরি করেই।

একই সঙ্গে মার্ক্স এও বলেছেন, শ্রম যে বস্তু প্রস্তুত করে, তা তার কাছে অচেনা কিছু, যা তার সৃষ্টিকর্তার অধীনস্থতা থেকে স্বাধীন এক শক্তি। শ্রম থেকে উৎপন্ন বস্তু জাগতিক এবং তা শ্রমের বস্তুকরণ। এই বস্তুকৃত শ্রমই শ্রমিকের দ্বারা কৃত বাস্তবায়ন। এমতাবস্থায় শ্রমের এই যে বাস্তবায়ন, তা স্পষ্টতই শ্রমিকের বাস্তবায়নের ঘাটতি তৈরি করে। কারণ রাজনৈতিক অর্থনীতিতে শ্রমের এই বাস্তবায়ন শ্রমিকের উন্নতি বা বিকাশের পথে ক্ষতি আকারে দৃশ্যমান হয়। আর বস্তুকরণ দৃশ্যমান হয় বস্তুর ক্ষতি ও তার প্রতি দাসত্ব আকারে, বিচ্ছিন্নতা ও বহির্মুখীকরণকে আত্মস্থ করার মাধ্যমে। বেশি যদি হয় শ্রমের বাস্তবায়নের কারণে শ্রমিকের বাস্তবায়নের ঘাটতি, তবে তার পরিণতি হচ্ছে না খেয়ে শ্রমিকের মৃত্যু। খুব বেশি বস্তুকরণ শ্রমিকের কাছে বস্তুর অপ্রাপ্তি, অর্থাৎ তাঁর জীবন ও কাজের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় জিনিসকে তাঁর কাছ থেকে হরণ করা।

যেহেতু শ্রমিকের শ্রম বহির্মুখী, তিনি কাজ করেন তাঁর মালিকের ইচ্ছায়। ফলে এই শ্রম তাঁর সত্তার সঙ্গে একীভূত নয়, যে কারণে এই শ্রমের মাধ্যমে শ্রমিক তাঁর শ্রমকেই অস্বীকার করেন। তাঁর দৈহিক ও মানসিক শক্তি তাঁর অনাকাঙ্ক্ষিত শ্রমে ব্যাপৃত হওয়ায় তিনি তাঁর শরীর ক্ষয় করেন, মনকে ধ্বংস করেন। এর কারণও স্পষ্ট। এই শ্রম তো স্বেচ্ছাশ্রম নয়, বরং তাঁর ওপরে চাপানো শ্রম, যা তিনি জীবিকা নির্বাহের জন্য বাধ্য হয়ে গ্রহণ করেছেন। এই শ্রম তাঁকে মানসিক তৃপ্তি দেয় না। কিন্তু সত্তার বহির্জগতে দৈনন্দিন প্রয়োজন মেটানোর জন্য তা তাঁর জন্য এক দায়। ফলে এই বহিঃশ্রম তাঁর সত্তা থেকে তাঁকে বহিস্থ করেছে, তাঁকে করেছে বিচ্ছিন্ন, তাঁকে বিসর্জনের বেদিতে উঠিয়েছে, তাঁর মৃত্যুর পরোয়ানা জারি করেছে। পুঁজিপতি বা মালিকের ইচ্ছা বা অভিপ্রায়ে তিনি কাজ করেন। ফলে এই শ্রমও আদতে তাঁর নয়, এই শ্রম থেকেও তিনি হয়েছেন বিচ্ছিন্ন। ফলে এই উৎপাদনব্যবস্থা, উৎপাদনে তাঁর যে কর্মতৎপরতা, এসব থেকে তিনি বিচ্ছিন্ন। উৎপন্ন বস্তু বা পণ্য যেহেতু এই কর্মতৎপরতাগুলোর মূল ফলাফল, ফলে এসব থেকেও শ্রমিক বিচ্ছিন্ন। আর তাঁর শ্রম যখন অপরের, পরিণতিতে তিনি নিজেও ফেলেছেন নিজেকে হারিয়ে। সে নিজেও তখন পরিণত হয়েছেন অপরের।

মার্ক্স এই অবস্থাটাকে তুলনা করেছেন ধর্মানুরাগীদের সঙ্গে। ওখানেও ধার্মিক তাঁর কর্ম সম্পাদন করেন বা তাঁর তৎপরতা চালান দৈবের আওতাধীন বলে নিজেকে বিবেচনা করে, তাঁর মস্তিষ্ক, হৃদয় পরিচালিত হয় স্ব-অস্তিত্ব উহ্য রেখে; শুধু পার্থক্য এই, ধর্মের ক্ষেত্রে এসব তৎপরতা স্বতঃস্ফূর্ত ধর্মীয় বিশ্বাসের কারণে। অন্যদিকে মালিকের জন্য শ্রমিক যে কাজ করেন, তার ক্ষেত্রে শ্রমিকের শ্রম স্বতঃস্ফূর্ত নয়, তা তাঁর জন্য এক দায়।

এই জায়গায় মানুষ পশুর জায়গায় নেমে এসেছে বলে মার্ক্স তাঁর ধারণা ব্যক্ত করেছেন। কারণ, ব্যক্তি তার মালিকের ইচ্ছাধীন হওয়ায় সে তার সৃজনশীলতা ও স্বকীয়তা হারিয়েছে। এখন সে যা-ই করে, তা তার পাশবিকবৃত্তি—খাওয়া, পান করা, সন্তান উৎপাদন করা ইত্যাদি। মানুষের যে বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলো অন্য প্রাণী থেকে তাকে আলাদা করে, সেগুলো ইতিমধ্যেই তার কাছ থেকে লোপ পেয়েছে। যা পশুর বৈশিষ্ট্য, তা-ই হয়েছে মানুষের এবং এই পশুবৎ বৈশিষ্ট্য সে লালন করতে ও অনুভব করতে শুরু করেছে। বর্তমান বাংলাদেশের করপোরেট প্রতিষ্ঠানগুলোর দিকে যদি তাকাই, তবে দেখব, কেন মার্ক্সের এই সব বয়ান এখনো প্রাসঙ্গিক। এই সব চাকরিতে মানুষ তার প্রতিভা, সৃজনশীলতা ও স্বকীয়তা থেকে বিযুক্ত। কিছু টাকার বিনিময়ে গৎবাঁধা দিনের পর দিন কাজ করে যাচ্ছেন শ্রমিক; ফলে তিনি তাঁর শ্রম থেকে বিচ্ছিন্ন হচ্ছেন। এমনকি তাঁর দেহও এখন তাঁর নয়, কারণ তাঁর শারীরিক ব্যয় হয় অন্যের প্রয়োজনে বা ইচ্ছায়। তাঁর সার্বিক সত্তা থেকে তিনি বিচ্ছিন্ন। কারণ,

তিনি তো এখন আর তাঁর নিজের নন, তিনি এখন অপরের—কোনো ব্যক্তির, গোষ্ঠীর বা করপোরেট প্রতিষ্ঠানের।

মানুষের প্রাত্যহিক কর্মকাণ্ড তথা শ্রম থেকে বিযুক্তি দুভাবে ঘটে বলে মার্ক্স উল্লেখ করেছেন—১. বলপ্রয়োগের কারণে শ্রমিক তাঁর শ্রম দ্বারা উৎপাদিত পণ্যের সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটান। এই সম্পর্ক একই সঙ্গে গ্রাহ্য জগতের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের তুলনীয়, যেখানে বস্তুজগৎ তাঁর প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন নয়। ২. শ্রমের ভেতরেই উৎপাদনকাজের সঙ্গে শ্রমের সম্পর্ক। এখানে মানুষ তার কাজের সঙ্গে সম্পর্কের বিচারে তার কর্মতৎপরতা থেকে বিচ্ছিন্ন, তা তার নিজের নয়। এই কর্মতৎপরতা তাকে ভোগায়, তাকে দুর্বল করে, তাকে পুরুষত্বহীন করে। তার দৈহিক ও মানসিক শক্তি, তার ব্যক্তিগত জীবন, অর্থাৎ যা নিয়ে তার জীবন গতিপ্রবাহ পেয়েছে, সবই এখন তার বিরুদ্ধে এবং তার কাছ থেকে তারা স্বাধীন এবং তার কর্তৃত্বের বাইরে।

এই দুইয়ের বাইরেও বিচ্ছিন্ন শ্রমের আরও একটি কারণ মার্ক্স উল্লেখ করেছেন। মানুষ প্রজাতিসত্তা। এই প্রজাতিসত্তা শুধু তার ব্যবহারিক জীবনে বা তত্ত্বীয় বয়ানে নিজেকে পরিস্ফুটিত করে না, স্বাধীন ও সর্বজনীন সত্তা আকারে সে প্রজাতিসত্তা হিসেবেও জগতে নিজেকে জারি রাখে। অন্য আর সব সজীব প্রজাতির মতো এবং বিশেষত অধিক সর্বজনীন সত্তা আকারে তার প্রজাতি জীবন অজৈব জগতেও তার অস্তিত্ব জারি রাখে। মানুষের বস্তুজগতে তার পরিপুষ্টি ঘটে খাদ্য, পানীয়, বাসস্থান, কাপড়-চোপড় ইত্যাদির মাধ্যমে। এই সম্পর্ক অজৈব জগতের সঙ্গে তার সর্বজনীনতার পরিপ্রেক্ষিতে। ১. এখানে সেগুলো তার সরাসরি জীবনযাপনের অনুষঙ্গ ২. বস্তু বা দ্রব্য আকারে তার বেঁচে থাকার সরঞ্জাম। প্রকৃতি মানুষের অজৈব দেহ—এটি যতটুকু পর্যন্ত সরাসরি মানুষের দেহ নয়। মানুষ প্রকৃতির ওপর নির্ভর করে বেঁচে থাকে। সে ক্ষেত্রে যতক্ষণ না তার মৃত্যু ঘটে, ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃতি তার দেহ, আর ইত্যবসরে প্রকৃতির সঙ্গে তার নিজেকে পরিবর্তনের লেনদেন চলতে থাকে। মানুষের শারীরিক ও আধ্যাত্মিক জীবন প্রকৃতির সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত, যার সহজ অর্থ হচ্ছে প্রকৃতি নিজেই নিজের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত; কারণ মানুষ প্রকৃতিরই এক অংশ।

বিচ্ছিন্ন শ্রম ১. প্রকৃতিকে ২. নিজেকে তার নিজস্ব কার্যাবলি থেকে বিচ্ছিন্ন করতে গিয়ে মানুষকে তার প্রজাতি থেকে বিচ্ছিন্ন করে; সে তার প্রজাতি জীবনকে ব্যক্তির বেঁচে থাকার মাধ্যমে রূপান্তরিত করে। প্রথমে সে তার প্রজাতি জীবন ও তার স্বতন্ত্র জীবনকে বিচ্ছিন্ন করে, আর দ্বিতীয়ত, সে তার স্বতন্ত্র জীবনকে তার উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে গিয়ে বিমূর্ত করে, একইভাবে তাকে বিমূর্ত ও বিচ্ছিন্ন আকারে পর্যবসিত করে। এই জায়গায় মার্ক্স আরও লিখেছেন, শ্রমের জায়গা থেকে মানুষের কর্মতৎপরতা এবং তার উৎপাদনশীল জীবনকে মনে হতে পারে প্রথমত, নেহাত প্রয়োজন মেটানোর মাধ্যম, যা বস্তুগত অস্তিত্ব টেকানোর জন্য জরুরি। কিন্তু

উৎপাদনশীল জীবন হচ্ছে প্রজাতি জীবন। এই হচ্ছে জীবন উৎপাদনকারী জীবন। একটি প্রজাতির সামগ্রিক চরিত্রই তার প্রজাতি চরিত্র, যা তার কর্মতৎপরতা দ্বারা পরিপ্লুত এবং মানুষের স্বাধীন, সচেতন কর্মতৎপরতা তাই তার প্রজাতি চরিত্র। জীবন নিজেই সেখানে আবির্ভূত শুধুই তার জীবনধারণের মাধ্যম হিসেবে।

পশু তার জীবনের কর্মতৎপরতার সঙ্গে বিরামহীনভাবে একীভূত। সে তার থেকে নিজেকে আলাদা করতে অক্ষম। পক্ষান্তরে মানুষ তার জীবনে কর্মতৎপরতাকে তার ইচ্ছা বাস্তবায়ন ও সচেতনতা অর্জনের মাধ্যমে পরিণত করে। তার আছে সচেতন কর্মতৎপরতা। কিন্তু তা কোনো পূর্বপরিকল্পনা নয় যে সে তার সঙ্গে অবাধে ভেসে যায়। মানুষের জীবনের এই সচেতন কর্মতৎপরতা অন্য সব জন্তুর জীবনের কর্মতৎপরতা থেকে তাকে সরাসরি আলাদা করেছে। এর কারণ হচ্ছে মানুষ শুধু প্রজাতিসত্তা কিংবা সেই শুধু সচেতন সত্তা। এর মানে হচ্ছে তার নিজের জীবনই হচ্ছে তার লক্ষ্যবস্তু, যদিও সে এক প্রজাতিসত্তা। এর ভিত্তিতেই শুধু তার কর্মতৎপরতা স্বাধীন কর্মতৎপরতা। বিচ্ছিন্ন শ্রম এই সম্পর্ককে বিপরীতমুখী করে, যাতে করে মানুষ সচেতন সত্তা হওয়ার পরও তার জীবনের কর্মতৎপরতা, তার সত্তা শুধু তার অস্তিত্ব বজায় রাখার একটি মাধ্যমে রূপান্তরিত হয়।

মার্ক্স মানুষের প্রজাতিসত্তার বয়ান দিতে গিয়ে আরও একটি চমৎকার পর্যালোচনা হাজির করেছেন। তিনি বলছেন যে অপরাপর প্রাণিকুল নিজেরাই বাসা বানায়, যেমন মৌমাছি, বিভার, পিঁপড়া ইত্যাদি। কিন্তু প্রাণীদের এই সৃষ্টি শুধুই তার আপাত প্রয়োজন মেটানোর জন্য এবং তার শাবকদের প্রয়োজন মেটানোর জন্য; ফলে এই উৎপাদন একতরফা। অন্যদিকে মানুষের উৎপাদন সর্বজনীন; সে শুধু সরাসরি শারীরিক প্রয়োজনের প্রাবল্যের কারণে উৎপাদন করে না, শারীরিক প্রয়োজনের বাইরেও সে উৎপাদন করে, শারীরিক প্রয়োজনের বাইরে থেকেও সত্যিকার অর্থে চলে এই উৎপাদন। পশু শুধু নিজের পুনরুৎপাদন করে, অন্যদিকে মানুষ পুনরুৎপাদন করে নিজেকে ও সেই সঙ্গে সমগ্র প্রকৃতিকে। পশুর উৎপাদন সরাসরি তার দেহজ ও অঙ্গাধীন। অন্যদিকে মানুষ সরাসরি তার উৎপাদনের মুখোমুখি হয় স্বাধীনভাবে। পশু শুধু তার পরিমাপ ও তার স্ব-প্রজাতির প্রয়োজনমাফিক আকৃতিপ্রাপ্ত হয়। অন্যদিকে মানুষ জানে, সব প্রজাতির প্রয়োজন বিবেচনা করে কীভাবে উৎপাদন করতে হয় এবং সে এও জানে, কীভাবে বস্তুর অন্তর্গত প্রয়োজন বিবেচনা করে ওই জ্ঞান প্রয়োগ করতে হয়। যার অর্থ দাঁড়ায়, মানুষ বস্তুকে তার সৌন্দর্যের আইন অনুযায়ীই রূপ দান করে। কিন্তু শ্রম যখন অপরের অধীন হয়, অর্থাৎ বিচ্ছিন্ন শ্রমের উদয় হয়, তখন তার বস্তুকৃত জগৎ, অর্থাৎ তার প্রজাতিসত্তার বস্তুকৃত জগৎ, যা সে তার সচেতনতা ও বুদ্ধিবৃত্তি দ্বারা নির্মাণ করেছিল, তা এই বিচ্ছিন্ন শ্রম তার কাছ থেকে কেড়ে নেয়। উৎপাদিত বস্তু কেড়ে নিয়ে বিচ্ছিন্ন শ্রম মানুষের কাছ থেকে তার

প্রজাতি-জীবনটাই কেড়ে নেয়। যেখানে অন্যান্য জীবের ওপর তার প্রাধান্য ছিল, সেখান থেকে তার অজৈব শরীরকে বিচ্ছিন্ন করে সামগ্রিক অর্থে প্রকৃতি থেকেই তাকে বিচ্ছিন্ন করা হয়। মার্ক্স অপরাপর আর যে দুটি কাজ বিচ্ছিন্ন শ্রম করে, তার বিবৃতি দিচ্ছেন। তা হলো—

৩. বিচ্ছিন্ন শ্রম মানুষকে তার প্রজাতিসত্তা তথা তার আধ্যাত্মিক প্রজাতি বৈশিষ্ট্যকে তার নিজের কাছেই অচেনা করে তোলে, তার স্বতন্ত্র অস্তিত্বের এক মাধ্যমে মাত্র রূপান্তরিত করে।

৪. বিচ্ছিন্ন শ্রম অনতিবিলম্বে মানুষকে তার শ্রমলব্ধ উৎপাদন থেকে বিচ্ছিন্ন করে, সেই সঙ্গে মানুষ তার জীবনের কর্মতৎপরতা ও তার প্রজাতিসত্তা থেকে বিচ্ছিন্ন হয় এবং মানুষ অপর মানুষ থেকেও বিচ্ছিন্ন হয়। এখন মানুষ যখন নিজের মুখামুখি হয়, সে আদতে মুখোমুখি হয় অপরের।

তাতে এই শ্রমলব্ধ উৎপাদন আমার কাছে বিচ্ছিন্ন বা অচেনা, আর যে শ্রম আমাকে বিচ্ছিন্ন বা অচেনা শক্তির মুখোমুখি করে, তা তো আর আমার নয়। তাহলে এই শ্রমের মালিক কে? তা তো আমি ব্যতিরেকে অন্য কোনো সত্তা।

এই সত্তা তাহলে কে? মার্ক্স এই প্রশ্ন তুলেছেন। মার্ক্স নিজেই প্রশ্ন করছেন, দেবতারা?—কিন্তু মার্ক্স তাঁর উত্তর নিজেই এভাবে দিচ্ছেন যে মিসর, ভারত ও মেক্সিকোর দেবতারা এই শ্রমের মালিক নয়। দেবতারা তো ধারণাগত জায়গায় মানুষের মনের এবং আকৃতিগতভাবে মানুষের হাতের সৃজনশীলতার প্রকাশ। মার্ক্স বলছেন যে প্রকৃতিও আর মানুষের শ্রমের স্রষ্টা নয়, বরং মানুষ তার কর্ম ও সৃজনী শক্তি দিয়ে প্রকৃতিকেও তার বশে এনেছে।

দেবতাদের অযৌক্তিক সব কারবারও বিজ্ঞানময় শিল্পায়নের জাদুবিদ্যার সামনে ভেসে গিয়েছে। কিন্তু শ্রমবিভাজনের দাপটে মানুষ নিজেকে অপর মানুষ থেকে বিচ্ছিন্নও করেছে, যেখানে দেবতাদের বা প্রকৃতির কোনো হাত নেই। ফলে দেবতা নয়, প্রকৃতি নয়, বরং মানুষ শুধু নিজেই অপর মানুষের ওপর বিচ্ছিন্ন বা বিজাতীয় শক্তি আকারে হাজির হয়েছে।

৬.

শ্রমিকের তাঁর শ্রমের সঙ্গে সম্পর্কই মালিকের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের ভিত্তি। যার কারণে বিচ্ছিন্ন শ্রমের, সেই সঙ্গে বহির্মুখীকৃত শ্রমের আবির্ভাব হয়েছে। আর এই বিচ্ছিন্নতার জন্ম হয়েছে ব্যক্তিগত সম্পদের উৎপত্তির উপজাত হিসেবে। শ্রমের বহির্মুখীকরণ বলতে মার্ক্স বুঝিয়েছেন সেই শ্রম, যা বিচ্ছিন্নতার কারণে আর শ্রমিকের আওতায় না থেকে অন্য কারও আওতাধীন হয়, অর্থাৎ তার বহির্মুখীকরণ নিশ্চিত হয়েছে। মার্ক্স তাই লিখেছেন যে ব্যক্তিগত সম্পদ জন্ম দেয় বিচ্ছিন্ন শ্রমের, বিচ্ছিন্ন মানুষের,

বহির্মুখীকৃত শ্রমের, বহির্মুখীকৃত জীবনের এবং বহির্মুখীকৃত মানুষের। এ ক্ষেত্রে এ কথা সত্যি যে ব্যক্তিগত সম্পদ বিচ্ছিন্ন শ্রমের ফসল। আবার এও সত্যি যে ব্যক্তিগত সম্পদ সেই মাধ্যম, যার কারণে শ্রম নিজেই নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে। এই হলো বিচ্ছিন্নতার উপলব্ধি।

এই জায়গায় মার্ক্স সুন্দরভাবে লিখেছেন, প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের ফলে মানুষ যখন প্রকৃতিকে আত্মস্থ করে তার শ্রম দিয়ে, এই আত্মীকরণ স্বতঃস্ফূর্ত এবং প্রাণবন্ত; কিন্তু তার শ্রম যখন তার নিজের জন্য নয়, তখন তার প্রাণশক্তির বলি হয়ে যায়, তার স্বতঃস্ফূর্ততার মৃত্যু ঘটে। উৎপাদিত বস্তু হয়ে যায় অপরের, বস্তুর স্রষ্টার হয় ক্ষতি, শ্রমের বিচ্ছিন্নতা ঘটে, তাতে শ্রমিকের নিজের সঙ্গে নিজের বিচ্ছিন্নতাও নিশ্চিত করে। বস্তুরও বিচ্ছিন্নতা ঘটে শ্রমের সঙ্গে ও শ্রমিকের সঙ্গে। ব্যক্তিগত সম্পদ সৃষ্টির ফলে অপরের ইচ্ছাধীন ব্যক্তির যখন বস্তুকরণ ঘটে, তখন সে নিজের জীবন থেকেই বিচ্ছিন্ন হয়। বিচ্ছিন্নতা যেহেতু শ্রমবিভাজনের ফলে সৃষ্ট, ফলে শ্রমবিভাজনই বলা চলে মানুষের তার স্বীয় সত্তা থেকে বিযুক্তির মূল হেতু। মার্ক্স লিখেছেন, এই বিচ্ছিন্নতা থেকে মুক্তির পথ হচ্ছে নিজেকে বস্তুকৃত না করা, যার জন্য দরকার চৈতন্যের জাগরণ এবং শ্রমবিভাজনের মাধ্যমে সৃষ্ট যে সমাজ, তাকে অতিক্রমণ।

৭.

জার্মান ইডিওলজি গ্রন্থে মার্ক্স বিচ্ছিন্নতা অতিক্রমণের পথ বাতলেছেন। তিনি লিখেছেন, নিঃস্ব অর্থাৎ সম্পদহীন লোকদের কাজ হবে প্রচলিত বা বিদ্যমান বিত্ত-বৈভবের মালিকানার ও সংস্কৃতির বিরুদ্ধে বিপ্লবী ভূমিকা নেওয়া। সেই সঙ্গে তিনি উৎপাদিকা শক্তির বিকাশের কথা বলেছেন, যার মাধ্যমেই দুনিয়ার নিঃস্বদের একত্রীকরণ সম্ভব। এই প্রচেষ্টা ছাড়া আর সব কাজ হবে মার্ক্সের ভাষায় পুরোনো আবর্জনার পুনরাবৃত্তি। এই প্রচেষ্টা ছাড়া ১. কম্যুনিজম শুধু একটি স্থানীয় ঘটনা হয়েই থেকে যাবে, ২. পারস্পরিক ক্রীয়াশীল শক্তিসমূহ আর সর্বজনীন শক্তি হয়ে উঠবে না, যেটির সর্বজনকে অগ্রাহ্যকারী শক্তির রূপ নেওয়ার কথা। আর তা না হলে এসব শক্তির পরিণতি হবে গৃহজাত কিছু পরিস্থিতির রূপ নেওয়াতে, যেসব আবার কুসংস্কারে আচ্ছাদিত থাকবে ৩. পারস্পরিক ক্রিয়াশীল শক্তির প্রতিটি পরিবর্তন স্থানীয় কম্যুনিজমকে ধ্বংস করবে। তাই প্রকৃত কম্যুনিজম পরিণত হবে প্রলেতারিয়েতদের একত্রীকরণের মাধ্যমে, সেই সঙ্গে তাদের ইতিহাসে প্রভুত্বকারী শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হতে দেওয়ার মাধ্যমে। এর মধ্য দিয়ে বৃহদার্থে আমরা যে দাসত্ব বুঝি, শুধু তারই অবসান হবে না, ব্যক্তিগত সম্পদের আবির্ভাবের কারণে পরিবারভিত্তিক যে দাসত্ব স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের তার স্বামীর বা তাদের পিতার অধীনে

করতে হতো, তারও অবসান ঘটবে। মার্ক্স বলেছেন, শ্রমবিভাজনের অবসানের ফলে মানুষ তার সৃজনশীলতার পূর্ণতায় পৌঁছাবে; ফলে সে তার পছন্দমাফিক কখনো হবে শিকারি, কখনো জেলে, কখনো পশুপালক, আবার কখনো বিদগ্ধ সমালোচক—শুধু একটিমাত্র পেশায় তার নিজেকে গণ্ডিবদ্ধ না রেখে।

৮.

বিচ্ছিন্নতা নিয়ে মার্ক্স *গ্রুনদ্রিসে* গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। মার্ক্স লিখেছেন, বুর্জোয়া সমাজে প্রাথমিক শর্তের মধ্যেই পড়ে যে শ্রম সরাসরি বিনিময় মূল্য তৈরি করতে পারবে, আর তা হচ্ছে টাকা। আবার টাকা সরাসরি শ্রম কিনতে পারে। আর এভাবে শ্রমিক তাঁর কর্মকাণ্ডকে নিজ থেকে বিচ্ছিন্ন করেন। ফলে এভাবে অর্থ বা টাকামাত্রই হয়ে ওঠে সরাসরি এবং যুগপৎভাবে প্রকৃত সমাজ, যেহেতু সবারই বেঁচে থাকার জন্য এটি হচ্ছে সাধারণ ও সর্বজনীন নিয়ামক। *ইকোনমিক অ্যান্ড ফিলোসফিক ম্যানুস্ক্রিপ্ট* গ্রন্থে মার্ক্স যা লিখেছিলেন, সে তুলনায় *গ্রুনদ্রিসে* গ্রন্থে তিনি কিছু বিস্তারিত পর্যবেক্ষণ হাজির করেছেন। মার্ক্স বলছেন, বিনিময় মূল্যের ওপর ভর করে গড়ে ওঠা উৎপাদন বস্তুকৃত শ্রমের বিনিময়ের ওপর গড়ে ওঠে, যার ফলে পরিশেষে তা শ্রমকে বিচ্ছিন্নতা দান করে।

৯.

ইস্টভান মেসজারোস বলছেন যে গ্রিসে বিচ্ছিন্নতার বয়ান গৃহীত হয়েছে অনেকাংশেই অ্যারিস্টটলের কারণে। তিনি দাসত্বকে প্রকৃতিপ্রদত্ত ব্যবস্থা বলে অভিহিত করেছেন, আর স্বাধীন মানুষের স্বাধীনতাও প্রকৃতিপ্রদত্ত বলে বর্ণনা করেছেন। দাস তাঁর কাছে ছিল কথা বলা সরঞ্জামমাত্র। বর্তমানে আমাদের দেশে বেশির ভাগ গার্মেন্টস কারখানায় শ্রমিকেরা বা দিনমজুরেরা তাঁদের প্রাত্যহিক জীবনে যে বঞ্চনা ভোগ করেন, তাও আমাদের চিন্তার অ্যারিস্টটলীয় বিক্ষেপের কারণে। অ্যারিস্টটলীয় চিন্তার ধরন বহুলাংশে গ্রিসে দাসপ্রথা চালু রাখার দার্শনিক বৈধতা দিয়েছে, ফলে দাসরা তাদের সত্তা থেকে হয়েছে বিচ্ছিন্ন। যাহোক, আমরা কিছুটা আলোচনা করতে চাই হেগেলের বিচ্ছিন্নতার ধারণা থেকে মার্ক্সের বিচ্ছিন্নতার ধারণার পার্থক্য কোথায়, তা বুঝতে। আমার কাছে এটি স্পষ্ট যে হেগেল খ্রিষ্টধর্মের উর্ধ্বে উঠতে পারেননি। ধর্মীয় বিশ্বাসের আঙ্গিকে হেগেল সত্তাকে সমাজ সৃষ্টির পূর্বে অস্তিত্বশীল বলে মনে করতেন, যা ছিল প্রকৃতির অংশ। আর ওই সত্তা, যাকে আমরা মানবাত্মা বলতে পারি, তা এক অসীম আত্মার সঙ্গে সংযুক্ত। আত্মবিভাজন এবং আত্মবিচ্ছিন্নতার মধ্য দিয়ে পরম বা অসীম আত্মা বা সত্তা থেকে মানবাত্মার বিযুক্তি ঘটে। কিন্তু ইতিহাসের বাস্তবতায় ও সামাজিক অবস্থার সঙ্গে একীভূত অবস্থায় থাকার কারণে তার চৈতন্যোদয় হয় এবং

আত্মসচেতন আত্মাতে (self-conscious spirit) আবির্ভূত হয়। দেখা যাচ্ছে, এ বয়ান অনেকটাই বাইবেলীয় বয়ানের অনুরূপ। কিন্তু একসময়কার নব্য হেগেলীয় মার্ক্স হেগেলের এই চিন্তাকে পরবর্তীকালে মোটেও আমলে নেননি।

গ্রন্থপঞ্জি

Fromm, Erich, 2005 (South Asian edition), *Marx's concept of Man*, Continum Publishers.

Mandel, Ernest, Novack, George, 1973, *The Marxist Theory of Alienation*, Pathfinder Press.

Marx, Karl. *konomisch-philosophische Manuskripte aus dem Jahre* 1844, Zeno.org. Meine Bibliothek. http ://www.zeno.org/Philosophie/M/Marx,+Karl/%C3%96konomischphilosophische+Manuskripte+aus+dem+Jahre+1844

Marx, Karl,1959, *Economic and Philosophic Manuscripts of* 1844, Progress Publishers, Translated by Martin Milligan from the German text, revised by Dirk J. Struik, contained in Marx/Engels, Gesamtausgabe, Abt. 1, Bd. 3.

Marx, Karl, Engels, Friedrich, 1969, *Die deutsche Ideologie*, Dietz Verlag http ://www.mlwerke.de/me/me03/me03_009.htm

Marx, Karl, 1931-41, *Grundrisse : Foundations of the Critique of Political Economy* (Rough Draft), Penguin Books in association with New Left Review, 1973

Mszros, Istvn, 1970. *Marx's Theory of Alienation*, The Merlin Press ltd.

Sayers, Sean, 2011. *Marx and Alienation : Essays on Hegelian Themes*, p.ix, Palgrave Macmillan

আরিফ, রইসুদ্দিন, ২০১৯ (জানুয়ারি-মার্চ), *সভ্যতার উষাকালের বিস্ময় গিলগামেশের মহাকাব্য*, *ত্রৈমাসিক দেশকাল* পত্রিকা

নওশাদ, মুহাম্মদ তানিম, ২০১৯ (এপ্রিল-জুন), মার্ক্সের মানবসত্তা : এরিখ ফ্রমের পর্যালোচনা ও আনুষঙ্গিক প্রসঙ্গ, প্রতিচিন্তা, পৃ : ১৪২)

এঙ্গেলস, ফ্রিদরিখ. ২০১৬. *জার্মানদেশের কৃষকযুদ্ধ*; মূল জর্মন থেকে অনুবাদ মুহাম্মদ তানিম নওশাদ, গ্রন্থকুটির

বই আলোচনা

ইসলামপন্থী এবং সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শের ঐক্যের ভবিষ্যৎ

মুশফিক ওয়াদুদ

হোয়াই অ্যালায়েন্সেস ফেইল : ইসলামিস্ট অ্যান্ড লেফটিস্ট কোয়ালিশনস ইন নর্থ আফ্রিকা—ম্যাট বুয়েলার, সিরাকাস ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০১৮।

ভূমিকা

রাষ্ট্রবিজ্ঞানী স্যামুয়েল পি. হান্টিংটনের 'সভ্যতার সংঘাত' তত্ত্বটি রাষ্ট্রবিজ্ঞানে কয়েক দশক ধরে অন্যতম প্রধান একটি তত্ত্ব হিসেবে আলোচিত হয়ে আসছে। দেশে দেশে সংকটকে এই তত্ত্ব দিয়ে ব্যাখ্যা করার প্রবণতা আমরা দেখেছি। অনেক ক্ষেত্রেই জাতিরাষ্ট্রের সংকটগুলোকে 'সভ্যতার সংকট' তত্ত্ব দিয়ে খুব ভালোভাবেই ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয়। এক ধর্মের সঙ্গে অন্য ধর্মের সংঘাত যেমন সমাজে ও রাষ্ট্রে বিভেদ তৈরি করে, মতাদর্শেরও সে ধরনের একটি ভূমিকা রয়েছে। বরং মতাদর্শের সংঘাত অনেক সময় ধর্মের সংঘাত থেকেও বড় সংঘাত তৈরি করতে পারে।

গত শতাব্দীর সবচেয়ে আলোচিত মতাদর্শ ছিল সমাজতন্ত্র। রাজনীতি, সমাজনীতি ও অর্থনীতিতে সমাজতন্ত্র এখনো আলোচনার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে রয়েছে। কার্ল মার্ক্সের শ্রেণি ও শোষণের তত্ত্বের ব্যাপ্তি এখন পর্যন্ত জ্ঞানচর্চায় ব্যাপক প্রভাব রেখে চলেছে। সমাজের অনেক অসংগতিই মার্ক্সের তত্ত্ব ছাড়া ব্যাখ্যা করা অনেকটাই কঠিন। অধিক আলোচিত হওয়ার কারণে সমাজতন্ত্রের লড়াইটিও ছিল অন্য অনেক মতাদর্শের চেয়ে বেশি। একদিকে পুঁজিবাদের সঙ্গে লড়াই করতে হয়েছে প্রায় সব দিক দিয়েই, অন্যদিকে ধর্মের সঙ্গে ছিল প্রবল সংঘাত। বিশেষ করে মুসলিম দেশগুলোতে ইসলামি মতাদর্শের সঙ্গে সমাজতন্ত্রের প্রায়োগিক মতবাদ কমিউনিজমের সংঘাত ছিল প্রবল। অনেকেই মনে করেন সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনে মধ্য

এশিয়ার দেশগুলোতে ইসলামি মতাদর্শের সঙ্গে সংঘাত একটি বড় ভূমিকা পালন করেছে। বিশেষ করে আফগানিস্তানে পাকিস্তান আর যুক্তরাষ্ট্রের প্রক্সি যুদ্ধ সোভিয়েত ইউনিয়নকে বেশ কাবু করেছিল এবং সেখান থেকেই পতনের শুরু। মুসলিম দেশগুলোতে সামাজিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে কমিউনিজমের সঙ্গে ইসলামি মতাদর্শের লড়াই দেশে দেশে সব সময়ই থেকেছে এবং সে লড়াই এখনো চলছে। আরব এবং দক্ষিণ এশিয়ায় প্যান ইসলামিক ধারণায় রাজনৈতিক ইসলামের উত্থান কমিউনিজমের সঙ্গে সংঘাতকে নতুন একটি মাত্রা দিয়েছে।

ইসলামি মতাদর্শের সঙ্গে কমিউনিজমের সংঘাতের প্রধান কারণ সম্ভবত এই দুই মতাদর্শেরই অভীষ্ট জনগোষ্ঠী একই। সমাজের সুবিধাবঞ্চিত ও শ্রমিক শ্রেণির সমর্থন এই দুই পক্ষেরই প্রয়োজন। অনেকে এমনটিও বলেন যে শুধু ধর্মের বিষয়টি বাদ দিয়ে পলিটিক্যাল ইসলাম ও কমিউনিজমের লড়াইয়ের মধ্যে খুব বেশি পার্থক্য নেই। বৈষম্যহীন সমাজ দুই মতাদর্শেরই লক্ষ্য। ফলে টার্গেট জনগোষ্ঠী এক হওয়ার কারণে এ দুই মতাদর্শের মধ্যে একধরনের শত্রুতা তৈরি হয়েছে। ধর্ম মানা না-মানা শত্রুতার আরেকটি বড় কারণ।

কারণ যা-ই থাকুক, এ দুই মতাদর্শের মধ্যে সংঘাত গত শতকে বিভিন্ন দেশে আলোচনার একটি বড় বিষয় হয়ে থেকেছে। এ সংঘাতের ফলে অনেক দেশে রাজনৈতিক এবং ভূরাজনৈতিক সংকট তৈরি করে অনেক সময় বহিঃশক্তির হস্তক্ষেপের সুযোগও করে দিয়েছে। আবার অনেক সময় স্বৈরশাসকদের দীর্ঘ মেয়াদে ক্ষমতায় থাকা নিশ্চিত করেছে। মুসলিম দেশগুলোতে এ সংঘাতের আবার ত্রিমাত্রিক একটি রূপও আমরা দেখতে পাই। কমিউনিস্ট, ইসলামিস্ট ও নিওলিবারেল মতাদর্শের সেক্যুলার শক্তির মধ্যে একটি ত্রিমাত্রিক সংঘাত রয়েছে বেশ কিছু দেশে। কিছু দেশে আবার জাতীয়তাবাদীরাও একটি পক্ষ।

বলা হয়ে থাকে, রাজনীতিতে শেষ বলে কিছু নেই। এ ধারণার একটি ভালো প্রমাণ আমরা দেখতে পাই কয়েকটি আরব ও উত্তর আফ্রিকার কিছু দেশে, যেখানে গত দশকে সব সময় বিপরীত দিকে অবস্থান করা সমাজতন্ত্র ও ইসলামপন্থীদের মধ্যে একধরনের ঐক্য আমরা দেখতে পাই। আরব ও উত্তর আফ্রিকার বেশ কিছু দেশে এ ধরনের একটি প্রবণতা ছিল গত দশকে। মোটামুটি ছয়টি দেশে এ ধরনের একটি প্রবণতা দেখা যায়—তিউনিসিয়া, মরক্কো, মিসর, জর্ডান, ইয়েমেন ও মৌরিতানিয়া ।

প্রশ্ন হলো, সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থানে থাকা দুই মতাদর্শের মধ্যে ঐক্য কেন হবে এবং এ ঐক্য কি টিকে থাকবে? এমন কিছু প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অব টেনেসির রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ম্যাট বুয়েলার তাঁর নতুন একটি বই *হোয়াই অ্যালায়েন্সেস ফেইল : ইসলামিস্ট অ্যান্ড লেফটিস্ট কোয়ালিশনস ইন নর্থ আফ্রিকা* (কেন জোট ব্যর্থ হয় : উত্তর আফ্রিকায় ইসলামপন্থী

ও বামপন্থী ঐক্য)। লেখক বলছেন, তিউনিসিয়াতে সফলতা দেখলেও মরক্কো এবং মৌরিতানিয়ায় এ ধরনের একটি চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে এবং এর কারণও তিনি ব্যাখ্যা করেছেন।

ইসলামপন্থী ও বামপন্থী ঐক্য

ম্যাট বুয়েলারের বইটি ২০১৮ সালে সিরাকাস বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস থেকে প্রকাশিত হয়। বইটি লেখকের দুই বছরের এই তিন দেশের মাঠপর্যায়ে গবেষণার ওপর ভিত্তি করে লেখা। বিভিন্ন আরবিভিত্তিক উৎস থেকে কোয়ালিটেটিভ ও কোয়ানটিটেটিভ পদ্ধতিতে সংগ্রহ করা তথ্যের ওপর ভিত্তি করে বইটি লেখা। এই গবেষণা পরিচালনা করতে গিয়ে লেখক মাঠপর্যায়ে প্রায় ২০০টি সাক্ষাৎকার নিয়েছেন। সাক্ষাৎকারগুলোর মধ্যে ৭০ থেকে ৮০ শতাংশ ইসলামপন্থী এবং বামপন্থী রাজনীতিবিদদের মধ্য থেকে নেওয়া হয়েছে। বাকি ২০ থেকে ৩০ শতাংশ নেওয়া হয়েছে সাংবাদিকদের মধ্য থেকে। সাক্ষাৎকার যাঁরা দিয়েছেন তাঁদের মধ্যে আছেন মরক্কোর প্রথম ইসলামপন্থী প্রধানমন্ত্রী আবদেলিলাহ বেনকিরানে এবং ১৭ জন বর্তমান ও সাবেক মন্ত্রী, বেশ কিছু সাংসদ, স্থানীয় রাজনীতিবিদ ও শ্রমিকনেতা।

সমাজতন্ত্র ও ইসলামপন্থীদের মধ্যে ঐক্য হওয়ার সবচেয়ে বড় কারণ হয়তো শীতল যুদ্ধের অবসান এবং আল-কায়েদা কর্তৃক নাইন-ইলেভেনের আক্রমণের পটভূমিতে 'সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ' শুরু হওয়া। কারণ, এর ফলেই এই দুই আদর্শের জন্যই পুঁজিবাদ ও পশ্চিমা শক্তি কমন শত্রুতে পরিণত হয়েছে। আবার অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে এই দুই মতাদর্শের কমন শত্রুও অনেক ক্ষেত্রেই এক—পুঁজিপতি ও মডার্নিটি।

এই তিন দেশের ক্ষেত্রেও একই ধরনের ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু সেখানে কমন শত্রু ছিল স্বৈরশাসক। ঐক্যের পটভূমি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে লেখক ম্যাট বুয়েলার বলছেন, আরব বসন্তের সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি হলো তিউনিসিয়ার স্বৈরতন্ত্র থেকে গণতন্ত্রতে প্রত্যাবর্তন। যদিও তিউনিসিয়ার নতুন গণতন্ত্র এখনো বেশ কিছু চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করছে। কিন্তু কিছু বিষয়, যেমন অর্থনৈতিক অগ্রগতি ও সামরিক বাহিনীর প্রফেশনালিজম বিবেচনা করলে গণতন্ত্রে উত্তরণ অনেকটাই সফল। বিশেষ করে যদি মিসর, লিবিয়া কিংবা ইয়েমেনের সঙ্গে তুলনা করা হয়, তাহলে তিউনিসিয়ার গণতন্ত্রে প্রত্যাবর্তন একটি বড় ধরনের সফলতা।

লেখক বলছেন এই সফলতার পেছনে ভূমিকা রেখেছে একটি ঐক্য, যেটিকে গবেষকেরা বলছেন 'ক্রস আইডিওলজিক্যাল অ্যালায়েন্স'। বামপন্থী ও ইসলামিস্টদের মতো বিরোধী দলগুলোর ঐক্যকে 'ক্রস আইডিওলজিক্যাল অ্যালায়েন্স' বলা হচ্ছে। লেখক বলছেন, এই ঐক্যের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল ২০০৫ সালের দিকে। সফলতার মুখ দেখে ২০১১ সালে এবং ২০১৪ সালে স্বৈরতন্ত্রের বিদায় ঘটায়।

গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের যেকোনো সংগ্রামে বিপরীত মতাদর্শের বিরোধী দলের মধ্যে ঐক্য বড় ধরনের একটি ভূমিকা পালন করে। যখন বিরোধী পক্ষগুলো একত্র হয়ে একটি ঐক্য তৈরি করে এবং সেটা সময়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়, তখন তারা তাদের দাবিগুলোকে একত্র করতে পারে এবং সব দলের শক্তি একত্র হয়, যা একটি সমন্বিত চাপ তৈরিতে সাহায্য করে। অন্যদিকে দলগুলো যখন একা একা আন্দোলন করে, তখন শাসকদের জন্য বিরোধী পক্ষকে দমন করা সহজ হয়।

তিউনিসিয়ার মতো ল্যাটিন আমেরিকা, সাব-সাহারান আফ্রিকা এবং পূর্ব ইউরোপে দেখা গেছে ভিন্ন ভিন্ন মতাদর্শের মধ্যে যখন দীর্ঘস্থায়ী ও টেকসই ঐক্য হয়, তখন গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার প্রক্রিয়া সফল হয়। লেখক বলছেন, উন্নয়নশীল দেশগুলোতে শাসক পরিবর্তন এবং গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার আন্দোলনের সফলতা অনেকটাই বিরোধী জোটগুলোর ঐক্যের স্থায়িত্ব এবং টেকসইত্বের ওপর নির্ভরশীল।

তিউনিসিয়ার সাবেক প্রেসিডেন্ট জাইন আল-আবিদিন বেন আলী পালানোর পর তিউনিসিয়ার বিরোধী পক্ষগুলো একজোট হয় এবং তাদের জোটের নাম দেয় 'ত্রোইকা'। তবে জোটের প্রক্রিয়া শুরু হয় ২০০৫ সালের দিকে, বেন আলীর পতনের বেশ খানিকটা আগে। বেন আলীর পতন এই জোটকে আলোচনার কেন্দ্রে নিয়ে আসে। তিউনিসিয়ার কিছু জনগণ এ ধরনের একটি জোটের সমালোচনায় প্রথম দিকে বেশ মুখর ছিলেন। তাঁরা এর নাম দিয়েছিলেন 'তিন মাথাযুক্ত দানব' মতাদর্শের দ্বিচারিতা। তবে বেশ কিছু মানুষ এ ধরনের একটি জোটকে স্বাগত জানিয়েছিল, মতাদর্শের সহাবস্থানের একটি সুযোগ হিসেবে দেখছিল।

ত্রোইকা একটি অনাকাঙ্ক্ষিত ও অদ্ভুত জোট ছিল, যেখানে বাম ও ইসলামিস্টদের মধ্যে কৌশলগত ঐক্য হয়েছিল। একটি বাম দলের সেক্রেটারি সমীর বেন আমরের একটি উক্তি সে সময় তিউনিসিয়াতে বেশ জনপ্রিয় ছিল। উক্তিটি ছিল 'বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে দলগুলো মতাদর্শের ভিত্তিতে বিভক্ত নয়। আসল বিভাজনের ভিত্তি হচ্ছে দলগুলোর মধ্যে কারা বিপ্লবের পক্ষে আর কারা বিপক্ষে; এবং বিভাজনের ভিত্তি হচ্ছে কারা বিপ্লবের জন্য সংগ্রাম করে আর কারা বিপ্লবের জন্য যে সংগ্রাম, তাতে সম্মানজনক অবস্থান গ্রহণ করে না।'

লেখক বলছেন, তিউনিসিয়ার দুই প্রতিবেশী দেশ মরক্কো ও মৌরিতানিয়ায় একই ধরনের একটি প্রবণতা দেখা গিয়েছে, কিন্তু সেখানে ফলাফল ছিল ভিন্ন। আরব বসন্তের সময় প্রায় একই সঙ্গে এই দুটি দেশে গণতন্ত্রের জন্য আন্দোলন শুরু হয়েছিল। কিন্তু এখানে ইসলামিস্ট ও বাম শক্তির মধ্যে ঐক্য গড়ে ওঠেনি। একুশ শতকের প্রথম দশকের শেষ দিকে এই দুই মতাদর্শের মধ্যে ঐক্যের প্রক্রিয়া শুরু হলেও পরে আর সেটা টিকে থাকেনি। লেখকের মতে, ঐক্য না হওয়ার পেছনে এই দুটি দেশের স্বৈরশাসকদের সহযোজন কৌশল করে বিরোধী পক্ষের মধ্যে

বিভেদ, বিরোধী সংগঠনগুলোকে দুর্বল করা এবং আস্থার সংকট তৈরির কৌশল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। লেখক বলছেন, মরক্কো ও মৌরিতানিয়ায় জাতীয় পর্যায়ে বাম ও ইসলামিক দলগুলোর মধ্যে ঐক্য না হলেও বড় শহরগুলোতে এবং শ্রমিকসংগঠনগুলোতে ঐক্য ছিল।

ম্যাট বুয়েলারের এই গবেষণার প্রধান প্রশ্ন ছিল, ঠিক কী পরিস্থিতিতে, কী কী কারণে ইসলামিস্ট এবং বাম শক্তির মধ্যে ঐক্য সফল হয় এবং কখন, ঠিক কী পরিস্থিতিতে তা ব্যর্থ হয়? লেখক নতুন একটি তত্ত্ব প্রস্তাব করছেন। তত্ত্বটি তিনি উত্তর আফ্রিকায় ইসলামিস্ট ও বাম দলগুলোর মধ্যে ঐক্যের প্রক্রিয়া দিয়ে পরীক্ষা করেছেন। সেই প্রেক্ষাপটে আলোচনা করেছেন সেটা অন্য আরব দেশগুলোর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় কি না। তত্ত্বটি হলো, বিরোধী দলগুলোর সামাজিক ভিত্তি তথা তৃণমূল জনশক্তির ওপর নির্ভর করে জোট টেকসই হবে কি না। শহরকেন্দ্রিক একটি বিরোধী দলের সঙ্গে যখন গ্রামকেন্দ্রিক একটি বিরোধী দলের ঐক্য হয়, তখন এই শহরমুখী দলটি একটি দুর্বল জোটসঙ্গী হয়ে ওঠে। লেখক জোট নিয়ে আরও তিনটি তত্ত্বকে তাঁর এই গবেষণায় সংযুক্ত করেছেন: ১. বিপরীত মতাদর্শের মধ্যে ঐক্য হলে কর্মসূচি, নীতি ও মূল্যবোধ নিয়ে মতভেদ তৈরি হয় এবং জোট ভেঙে পড়ে; ২. আস্থার সংকটের কারণে যখন একটি জোটসঙ্গী অন্যকে বিশ্বাস করতে পারে না, তখন জোট ভেঙে পড়ে; এবং ৩. স্বৈরশাসক ও তাঁদের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান নির্বাচনী আইনকে ম্যানিপুলেট করে জোটের মধ্যে ভাঙন তৈরি করতে ভূমিকা রাখতে পারে এবং জোট ভেঙে পড়তে পারে।

লেখক আরও বলছেন, কী কী বিষয় জোটগুলোকে টেকসই বানায়, তা বুঝতে বিরোধী জোটগুলোর সামাজিক ভিত্তিই শুধু যে ভূমিকা রাখে, তা নয়। বরং স্বৈরশাসক যাঁরা জোট ভাঙতে সাহায্য করেন, তাঁদের সামাজিক ভিত্তি বোঝাটাও জরুরি। তিউনিসিয়ায় স্বৈরশাসকের সামাজিক ভিত্তি ছিল শহর ও মধ্যবিত্ত জনগোষ্ঠী এবং এটি তাঁর গ্রাম্য ভিত্তি, যার ওপর সাধারণত রাজনৈতিক শক্তি নির্ভর করে সেটি ধ্বংস করেছিল। অন্যদিকে মরক্কো ও মৌরিতানিয়ার শাসকেরা তাঁদের গ্রামের ভিত্তিকে শক্তিশালী করেছিলেন।

আর এই শহর ও গ্রামের শক্তিতে পার্থক্য থাকার কারণে তিউনিসিয়া, মরক্কো ও মৌরিতানিয়ায় স্বৈরশাসকদের বিরোধী জোটকে দমন করার কৌশলে ভিন্নতা ছিল। তিউনিসিয়ায় স্বৈরশাসকের গ্রামে শক্তি না থাকায় সরাসরি নির্যাতনের আশ্রয় নিতে হয়েছিল এবং এই পদ্ধতি বেন আলীর পতন ঘটায়। অন্যদিকে মরক্কো ও তিউনিসিয়ায় শাসকদের গ্রামে শক্তিশালী ভিত্তি থাকায় সরাসরি নির্যাতনে না গিয়ে বিরোধী নেতাদের বিভিন্নভাবে সহযোজন করে শাসকেরা জোটে ভাঙন ধরান। ফলে বিরোধী জোটের ঐক্য বেশি দিন দীর্ঘস্থায়ী হয়নি।

প্রথম অধ্যায়ে লেখক দেশে দেশে জোটের রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করেছেন। বিশেষ করে গণতন্ত্রায়নের তৃতীয় ঢেউ বিভিন্ন দেশে স্বৈরশাসনের বিদায়ে কীভাবে জোটের রাজনীতি ভূমিকা রেখেছে, তা আলোচনা করেছেন। এখানে ভিন্ন ভিন্ন মতাদর্শের মধ্যে জোট গঠনের ধারণাকে ব্যাখ্যা করেছেন। জর্ডান, মিসর ও ইয়েমেনে ইসলামিস্ট ও বাম দলের মধ্যে জোট কেন দীর্ঘস্থায়ী হয়নি, সেসব বিষয়ে অতীতের কিছু গবেষণার উল্লেখ করেছেন। এসব গবেষণার জোট সফল না হওয়ার পেছনে আস্থার সংকট, মতাদর্শগত বিভেদ ও স্বৈরশাসকদের জোট ভাঙতে বিভিন্ন কৌশলের ভূমিকার কথা আলোচনা করেছেন।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়ে শাসক ও বিরোধী দলগুলোর সামাজিক ভিত্তি এবং জোটের দীর্ঘ মেয়াদে টিকে থাকায় এর ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করেছেন।

অতীতের গবেষণাগুলো ইসলামিস্ট ও বাম দলগুলোর মধ্যে জোট ব্যর্থ হওয়ার মূল কারণ হিসেবে আস্থার সংকট ও প্রতিশ্রুতির সমস্যাকে দায়ী করা হয়। যেমন মিসরে আশির দশকে, ২০০০-এর শুরুর দিকে এবং হোসনি মোবারকের ২০০৫ সালের প্রেসিডেন্ট পুনর্নির্বাচনের সময় জোট ব্যর্থ হয়েছে প্রতিশ্রুতির সমস্যার কারণে বলে গবেষক ডিনা সেহেতা (Dina Sheheta) মনে করেন। তাঁর গবেষণা অনুযায়ী, মিসরে ইসলামিস্ট ও বাম দলগুলোর মধ্যে ভবিষ্যৎ নিয়ে একটি শঙ্কা ছিল, ভবিষ্যতে তাঁদের ক্ষমতার ভাগাভাগি কেমন হবে, সেই শঙ্কায় মোবারকের স্বৈরশাসনকেই 'গণতন্ত্রায়নের অনিশ্চয়তার' চেয়ে ভালো মনে করেছেন।

লেখক বলছেন, মুসলিম দেশগুলোতে, বিশেষ করে উত্তর আফ্রিকার তিনটি দেশে তিউনিসিয়া, মরক্কো ও মৌরিতানিয়ায় ইসলামিস্ট ও বাম দলগুলোর মধ্যে জোটে সমস্যা দেখা দিয়েছে মূলত নীতি ও কর্মসূচি নিয়ে। প্রধান যেসব বিষয়ে সমস্যা তৈরি হয়েছে, সেগুলো হলো পারিবারিক আইনের সংস্কার ও সংবিধানে নারীরা পুরুষের 'সমান' না 'সহযোগী' থাকবেন, সেই বিতর্কে। আরেকটি মতবিরোধের জায়গা হলো শহরে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান নিয়ে। উদাহরণ দিতে গিয়ে লেখক বলছেন, মরক্কোর বামপন্থীরা যেখানে কলোনিয়াল সময়ের স্প্যানিশ থিয়েটারকে অর্থায়ন করতে চান, ইসলামিস্টরা তা চান না। তারা মনে করেন, এই সব থিয়েটার অনুপযুক্ত। তা ছাড়া অন্যান্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান নিয়েও ইসলামিস্টদের আপত্তি সেখানে।

লেখক বলছেন, অতীতের একে অপরের সঙ্গে হানাহানিও একটি কারণ হতে পারে জোট ব্যর্থ হওয়ার। অতীতে এই তিনটি দেশেই ইসলামিস্ট ও বাম দলগুলোর মধ্যে একে অপরের বিরুদ্ধে বেশ কিছু গুপ্তহত্যার ঘটনা ঘটেছে। বিশেষ করে আশি এবং নব্বইয়ের দশকে তিউনিসিয়া ও মরক্কোর বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে এই দুই মতাদর্শের মধ্যে বেশ কিছু হানাহানির ঘটনা রয়েছে। সেটা ঐক্য ব্যর্থ হওয়ার কারণ কি না, তা-ও গবেষণার দরকার রয়েছে বলে লেখক বলছেন।

তিউনিসিয়াও ব্যর্থ

বইটি প্রকাশিত হয় ২০১৮ সালে। লেখক বলেছেন, তিউনিসিয়ার ইসলামিস্ট ও বাম দলগুলোর ঐক্য কিছুটা সফল ছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে তিউনিসিয়ার সেই দ্য ত্রোইকা জোটও টেকেনি। ২০১৯ সালের নির্বাচনে সেক্যুলার আর ইসলামপন্থীদের জোট ছিল না। নির্বাচনে আন নাহদা আর নিদা তুনিস—উভয় দলই নিজস্ব প্রার্থী ঘোষণা দিয়েছিল। নির্বাচনে নতুন দুটি মুখ উঠে আসে। আইনের অধ্যাপক সংবিধান বিশেষজ্ঞ কাইস সাইয়িদ ও মিডিয়া মোগল নাবিল কারুরি যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। ইসলামপন্থী দল আন নাহদার আবদেল ফাত্তাহ মৌর আর সেক্যুলার নিদা তুনিসের আবদেল করিম জিবিদি যথাক্রমে তৃতীয় ও চতুর্থ স্থান দখল করেছেন। অর্থাৎ যে একটি মাত্র দেশে ইসলামপন্থী ও বামপন্থীদের মধ্যে জোটের কিছুটা যা সফলতা ছিল, সেটাও শেষ পর্যন্ত আর থাকেনি। প্রথম ও দ্বিতীয় হওয়া দুই প্রার্থী ছিলেন নতুন মুখ। মিডিয়া মোগল নাবিল কারুরির কিছুটা পরিচিতি থাকলেও কাইস সাইয়িদ ছিলেন একেবারেই অচেনা। গবেষকেরা বলছেন, দুই প্রার্থীই বিপ্লবী এবং বিপ্লব-পরবর্তী প্রজন্মের—যাঁদের বয়স এখন ১৮ থেকে ৩০—তাঁদের সমর্থন পেয়েছিলেন।

তরুণদের মাধ্যমে সংগঠিত আরব বসন্তের আন্দোলনে যেসব ব্যর্থতা ছিল, সেগুলো থেকে শিক্ষা নিয়ে তরুণেরা নতুন আন্দোলনের সূত্রপাত করেছে। এর অংশ হিসেবেই কাইস সাইয়িদের মতো নেতার আবির্ভাব বলে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে মত। বলা হচ্ছে তরুণদের সমস্যা সমাধানে তারা আর রাষ্ট্রের ইচ্ছা ও সামর্থ্যের ওপর ভরসা করছে না। একধরনের আনুভূমিক আন্দোলন বা যেখানে নির্দিষ্ট কোনো নেতা নেই, সে রকম আন্দোলন গড়ে তোলার মাধ্যমে তারা প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থাকে চ্যালেঞ্জ করছে। রাস্তার আন্দোলনের বাইরেও গভীরতর ব্যবস্থাগত রূপান্তরের লক্ষ্যে তারা জনপ্রিয়তাহীন নেতাদের উৎখাতে রাজপথ ছেড়ে না যাওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করছে। শুধু নেতা পরিবর্তন করেই তারা ক্ষান্ত হচ্ছে না। আবারও যেন একদল দুর্নীতিপরায়ণ নেতার আবির্ভাব না ঘটে, সে ব্যাপারে তারা সজাগ।

তরুণদের এই সচেতনতার প্রতিফলনই দেখা গেছে তিউনিসিয়ার সাম্প্রতিক নির্বাচনে কাইস সাইয়িদের মতো 'স্বচ্ছ' ব্যক্তিত্বের নেতা নির্বাচনের ক্ষেত্রে। আন্দোলনে নির্দিষ্ট নেতৃত্বের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থাকার যে প্রবণতা, সেটা এ ক্ষেত্রে প্রতীয়মান হয়। এখান থেকে বামপন্থী, ডানপন্থী নির্বিশেষে প্রতিষ্ঠিত সব রাজনৈতিক দলের জন্যই শিক্ষা নেওয়ার বিষয় রয়েছে। তরুণদের আশা-আকাঙ্ক্ষা আমলে না নিলে সব দেশেই মূলধারার রাজনৈতিক দলগুলোর জন্য ক্ষমতায় আসা কঠিন হবে। কারণ, বর্তমান সময়ের মতো পৃথিবী এতটা তারুণ্যনির্ভর আর কখনো ছিল না। ২০১২ সালের হিসাবে দেখা যায়, পৃথিবীর ৫০ শতাংশ জনগোষ্ঠীর বয়স এখন ৩০

বছরের নিচে। আর উন্নত, উন্নয়নশীল নির্বিশেষে, সব দেশেই তরুণেরা আর্থসামাজিক প্রতিষ্ঠান এবং রাজনৈতিক প্রক্রিয়া থেকে বঞ্চিত।

বাংলাদেশে ইসলামপন্থী ও সমাজতান্ত্রিক আদর্শের একটি অংশের ঐক্যের চেষ্টা

ঠিক যে যে কারণে আরব আর উত্তর আফ্রিকার কিছু দেশে ইসলামপন্থী ও সমাজতান্ত্রিক আদর্শের মধ্যে ঐক্য হয়েছে, বাংলাদেশেও সে ধরনের একটি অবস্থা বিরাজমান। একদিকে বাংলাদেশের নাম সাম্প্রতিক সময়ে নতুন স্বৈরতান্ত্রিক দেশের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হওয়া, অন্যদিকে ক্রমান্বয়ে বাক্‌স্বাধীনতা কমতে থাকা এই ঐক্যের পেছনে একটি কারণ। বাংলাদেশে ইসলামপন্থী ও সমাজতান্ত্রিক আদর্শের কাছাকাছি আসার আরেকটি কারণ সম্ভবত ভারতবিরোধিতার প্রশ্নে। বাংলাদেশে চীনপন্থী সমাজতান্ত্রিকদের সঙ্গে ইসলামপন্থীদের সখ্য গড়ে উঠছে এই ভারতবিরোধিতার প্রশ্নেই। ২০১৭ সালে *প্রতিচিন্তায়* প্রকাশিত বদরুল আলম খান তাঁর 'বাংলাদেশ : একটি ইসলামি প্যারাডাইমের সন্ধানে' নিবন্ধে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছিলেন।

বদরুল আলম খান বলেছেন, বাংলাদেশে ইসলামপন্থীদের যে চিন্তাগত ঘাটতি ছিল, সেটা সমাজতান্ত্রিকদের একটি অংশ পূরণ করার চেষ্টা করছে। তিনি লিখেছেন, 'আদর্শের স্থানীয়করণের সেই কাজটি এতকাল অসম্পূর্ণ থাকলেও এই বিকল্প আদর্শিক কাঠামো সেই অভাবটি পূরণ করেছে মূলত ফরহাদ মজহারের কল্যাণে।'

ফরহাদ মজহার এবং তাঁর সঙ্গের কিছু মার্ক্সবাদী লেখকের লেখালেখিতে ইসলামপন্থীদের রাজনৈতিক একটি অবস্থান তৈরির চেষ্টা দেখা যায়। যেমন হেফাজতে ইসলামের লংমার্চের সময় নাগরিক অধিকার রক্ষা কমিটির আহ্বায়ক হিসেবে হেফাজতে ইসলামের লংমার্চ বাধাহীন ও নির্বিঘ্ন করতে সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছিলেন ফরহাদ মজহার। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর অভিযানে যখন হেফাজতের সমাবেশ মধ্যরাতে ভেঙে যায়, তার কিছুদিন পর ১৬ মে *চিন্তা* ম্যাগাজিনে ফরহাদ মজহার 'অপারেশন ফ্লাশ আউট' নামে একটি নিবন্ধ লেখেন। লেখাটিতে তিনি বলছেন, 'অর্থাৎ হেফাজতিদের শহর থেকে টিয়ার গ্যাস ছুড়ে, গুলি মেরে, বোমা ফাটিয়ে—যেভাবেই হোক তাড়িয়ে দিতে হবে। শহর সাফ করতে হবে। শহর ধনী ও বড়লোকদের জায়গা। ভদ্রলোকদের নগর। সুশীলদের রাজধানী। যাদের পাহারা ও রক্ষা করবার দায়িত্ব র‍্যাব, পুলিশ ও বিজিবির।'

লেখাটিতে ফরহাদ মজহার বলতে চেষ্টা করছেন যে হেফাজতকে শহর থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার মধ্যে একটি শ্রেণিচরিত্র আছে। হেফাজতের নেতা-কর্মীরা বা বাংলাদেশের মাদ্রাসাগুলো যেহেতু গ্রামভিত্তিক, তাই শহরের মানুষ তাঁদের সহ্য করতে পারেনি। মূলত এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই সমাজতান্ত্রিক আদর্শে বিশ্বাসী কিছু বুদ্ধিজীবীর সঙ্গে ইসলামপন্থীদের সখ্য গড়ে উঠছে। গ্রামভিত্তিক ইসলামপন্থীদের

মধ্যে মার্ক্সের শ্রেণি-সংগ্রামী বিশ্বাসী বুদ্ধিজীবীরা বিপ্লবের সম্ভাবনা দেখছেন।

ফরহাদ মজহার লেখাটির শেষে লিখেছেন, 'বাংলাদেশের গরিব, নির্যাতিত, নিপীড়িত জনগণ ও খেটে খাওয়া মানুষের মুক্তির নতুন বয়ান তৈরির ওপর নির্ভর করছে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ। ধনী ও উচ্চবিত্তরা ইসলাম ততটুকুই বরদাশত করে, যতক্ষণ তা গরিবের হক ও ইনসাফের ব্যাপারে কোনো কথা বলে না, নিশ্চুপ থাকে। জালিমের কাছে ইসলাম ততক্ষণই ধর্ম, যতক্ষণ তা মসজিদের চার দেয়ালের মধ্যে আবদ্ধ। ধর্ম যতক্ষণ ব্যক্তিগত ও পারলৌকিক স্বার্থোদ্ধারের উপায়মাত্র, ততক্ষণই তা ধর্ম বলে বিবেচিত। কিন্তু ধর্ম যখন ব্যক্তির বদ্ধ গণ্ডি অতিক্রম করে সমাজে, সংস্কৃতির পরিসরে ও রাজনীতির পরিমণ্ডলে এসে দাবি করে গণমানুষের অধিকার আদায় ও ইনসাফ কায়েমও তার সংকল্পের অন্তর্গত, তখন তার বিরুদ্ধে হেন কোনো মারণাস্ত্র নেই, যা নিয়ে জালিম ঝাঁপিয়ে পড়ে না। অপারেশন ফ্লাশ আউট সেই সত্যই নতুন করে প্রমাণ করল মাত্র।'

অর্থাৎ, ফরহাদ মজহার বলতে চাইছেন, ইসলামপন্থী ও সমাজতন্ত্রীদের মধ্যে ঐক্যের মাধ্যমে 'বাংলাদেশের গরিব, নির্যাতিত, নিপীড়িত জনগণ ও খেটে খাওয়া মানুষের মুক্তির নতুন বয়ান তৈরি' করা সম্ভব এবং এর 'ওপর নির্ভর করছে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ।'

বদরুল আলম খান তাঁর নিবন্ধে লিখেছেন, 'নিঃশেষিত বাঙালি জাতীয়তাবাদ নিজেকেই কেবল নিঃশেষিত করেনি, প্রকৃতিগতভাবে ভয়ংকর এক সংকটও সে রেখে গেছে আমাদের জন্য।'

এই বক্তব্য অনেকাংশে সত্য। বাঙালি জাতীয়তাবাদের আবেদন কমতে থাকার কারণে যে শূন্যতা তৈরি হয়েছে, সেটা পূরণ করার চেষ্টা হচ্ছে ইসলামপন্থী ও সমাজতান্ত্রিক আদর্শের মধ্যে সখ্যের মাধ্যমে। নতুন একটি মতাদর্শ তৈরির চেষ্টা হচ্ছে নির্যাতিত ও গ্রামভিত্তিক জনগোষ্ঠীর শহরের মানুষদের প্রতি পুঞ্জীভূত ক্ষোভকে পুঁজি করে।

কিন্তু ইসলামপন্থী ও সমাজতান্ত্রিকদের মধ্যে ঐক্যের এমন একটি চেষ্টা বাংলাদেশে এই প্রথম নয়। দল হিসেবে বিএনপি এই দুই আদর্শের ঐক্যের একটি চেষ্টা করেছিল। এবং কিছু সময় দলটি দুই আদর্শের মধ্যে ঐক্যের মাধ্যমে অনেকটা সফলও ছিল। ২০০১ সালে চারদলীয় জোটের মাধ্যমে ক্ষমতায় আসার ঘটনা ইসলামপন্থী ও সমাজতান্ত্রিক আদর্শে বিশ্বাসীদের একটি ঐক্য বলা যায়। বিএনপির মধ্যে চীনপন্থী সমাজতান্ত্রিকদের প্রাধান্য ছিল এবং জোট হয়েছিল জামায়াতে ইসলামী ও অন্য কিছু ইসলামি দলের সঙ্গে।

ম্যাট বুয়েলার তাঁর বইয়ে ইসলামপন্থী ও সমাজতান্ত্রিকদের মধ্যে জোট ভাঙার যে কারণগুলো বলছেন, আদর্শিক বিরোধ ও নারীর অবস্থান এবং সাংস্কৃতিক প্রশ্নে

বিরোধ, সে ধরনের সমস্যা বিএনপি ও ইসলামপন্থীদের মধ্যেও দেখা যায়। বিশেষ করে গত এক দশকে বিএনপির সিদ্ধান্ত গ্রহণে জোটভিত্তিক দলগুলোর মতাদর্শগত পার্থক্য বড় ভূমিকা রেখেছে।

বাংলাদেশ স্বৈরতান্ত্রিক দেশের দিকে অগ্রসর হতে থাকলে এবং বাক্‌স্বাধীনতা কমতে থাকলে ইসলামপন্থী ও সমাজতান্ত্রিক আদর্শের মধ্যে ঐক্যের যে চেষ্টা ফরহাদ মজহাররা করেছেন, সেটা হয়তো সফল হতে পারে। আরব আর উত্তর আফ্রিকার দেশগুলোতে এই দুই আদর্শের ঐক্য হয়েছিল স্বৈরতন্ত্রকে বিদায় করতেই।

কিন্তু আরব ও উত্তর আফ্রিকার দেশগুলোর অভিজ্ঞতা সে ধরনের কোনো ঐক্য বা জোট দীর্ঘ মেয়াদে টিকে থাকবে, তার ইঙ্গিত দেয় না। লেখক ম্যাট বুয়েলার নতুন তত্ত্ব দিয়েছেন যে দলগুলোর সামাজিক ভিত্তির ওপর নির্ভর করে জোট টিকবে কি টিকবে না, সে তত্ত্ব বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। কারণ, ইসলামপন্থীরা যেখানে গ্রামকেন্দ্রিক, বামপন্থীরা শহরকেন্দ্রিক। তাই বাংলাদেশেও এমন 'ক্রস আইডিওলজিক্যাল' ঐক্যের সফলতার উদাহরণ তৈরি করা কঠিন। কারণ, আমরা ইতিমধ্যে দেখেছি যে আরব ও উত্তর আফ্রিকার দেশগুলোতে এ ধরনের চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে।

মন্তব্য

রোহিঙ্গাদের সুরক্ষার আদেশ ও জাতিগত স্বীকৃতি এবং বাংলাদেশের করণীয়

কামাল আহমেদ

জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠার ৭৫তম বার্ষিকীতে জাতিসংঘ সনদের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত আন্তর্জাতিক বিচার আদালত (আইসিজে) মানবতার দাবি পূরণে এক নতুন নজির গড়েছেন। জাতিসংঘ সনদে স্বাক্ষরকারী সব দেশই ইপসো ফ্যাক্টো (ipso facto) অর্থাৎ বিশ্বসভার সদস্য হওয়ার কারণেই আন্তর্জাতিক বিচার আদালতের এখতিয়ারভুক্ত। জাতিসংঘের সব সনদ ও চুক্তির ব্যাখ্যা কিংবা সেগুলোর বাধ্যবাধকতা পূরণের প্রশ্ন এবং সদস্যদেশগুলোর মধ্যে সৃষ্ট বিরোধ নিষ্পত্তির সর্বোচ্চ কর্তৃত্ব এই আদালতের ওপরেই ন্যস্ত করেছে জাতিসংঘ সনদ। এই পটভূমিতেই গণহত্যা সনদের বাধ্যবাধকতা পূরণে ব্যর্থতার অভিযোগে গাম্বিয়ার আবেদনে আদালত সর্বসম্মতভাবে বলেছেন যে মিয়ানমারকে অবশ্যই সংখ্যালঘু রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর সুরক্ষার পদক্ষেপ নিতে হবে। এ জন্য ঠিক কী কী ব্যবস্থা নিতে হবে, তা-ও স্পষ্ট করে নির্দেশনা দিয়েছেন আদালত।

মিয়ানমার ও গাম্বিয়া উভয়েই ১৯৪৯ সালে গৃহীত গণহত্যা সনদে স্বাক্ষরকারী দেশ এবং ওই সনদেই বলা আছে, সনদে অংশগ্রহণকারী দেশগুলোর যেসব বাধ্যবাধকতা পূরণ করার কথা, সেগুলো পরিপূরণে কোনো সদস্যদেশ ব্যর্থ হলে অন্য যেকোনো সদস্যরাষ্ট্র আইসিজের শরণাপন্ন হতে পারবে। গাম্বিয়া সেই অধিকারবলেই মামলা করে। রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে মিয়ানমার সরকারের দীর্ঘ কয়েক দশকের জাতিগত বৈষম্য ও নিপীড়ন এবং ২০১৭ সালের সেনা অভিযানে হত্যা, ধর্ষণ, লুণ্ঠন, অগ্নিসংযোগ, বসতি নিশ্চিহ্ন করা, বাস্তুচ্যুতির মতো নিষ্ঠুরতার পটভূমিতে দাবি করা হয় যে গণহত্যার উদ্দেশ্যে এসব অপরাধমূলক কাজ করা হয়েছে।

আদালতের এই সিদ্ধান্ত বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। এ ক্ষেত্রে সম্ভবত সবচেয়ে সুদূরপ্রসারী সিদ্ধান্ত হচ্ছে মিয়ানমারে রোহিঙ্গাদের সুরক্ষা লাভের অধিকারই একটি

জাতিগোষ্ঠী হিসেবে স্বীকৃতি। আদালত যে চারটি সাময়িক ব্যবস্থা নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, তার যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে গত ২৭ ডিসেম্বর গৃহীত প্রস্তাবের একটি বিশেষ অংশ উদ্ধৃত করেছেন। প্রস্তাবের ওই অংশটুকু ভাষান্তর করলে দাঁড়ায় : মিয়ানমারের স্বাধীনতার আগে থেকে বহু প্রজন্ম ধরে রোহিঙ্গা মুসলমানরা সেখানে বসবাস করে আসছেন। তবু ১৯৮২ সালে নাগরিকত্ব আইন তৈরির মাধ্যমে তাদের রাষ্ট্রহীন করে ফেলা হয়েছে এবং শেষতক ২০১৫ সালে তাদের নির্বাচনী প্রক্রিয়া থেকে বাদ দিতে ভোটাধিকার হরণ করা হয়েছে। মনে রাখা দরকার, চার দশক ধরে রোহিঙ্গাদের বাঙালি আখ্যা দিয়ে বাংলাদেশে ঠেলে দেওয়ার ধারাবাহিক চেষ্টা চলছে এবং রোহিঙ্গা উদ্বাস্তুদের প্রত্যাবাসনের পথে সবচেয়ে বড় বাধা হয়ে আছে নাগরিকত্বের স্বীকৃতির দাবিটি। আইসিজে রোহিঙ্গাদের নাগরিকত্বের স্বীকৃতির পাশাপাশি সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী হিসেবে গণহত্যা সনদের বিধানমতে সুরক্ষা পাওয়ার অধিকারী বলে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন।

রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে পরিচালিত সহিংসতা ও বৈষম্যের নীতির যেসব তথ্য ও বাস্তবতার বিবরণ পাওয়া গেছে, তাতে গণহত্যার মতো এবং গণহত্যাসম্পর্কিত কর্মকাণ্ড থেকে রোহিঙ্গাদের সুরক্ষা পাওয়ার অধিকার বিপন্ন বলে গাম্বিয়ার দাবিকে আদালত 'বিশ্বাসযোগ্য' হিসেবে সিদ্ধান্তে পৌঁছান। ১৭ জন বিচারপতির মধ্যে একজন এই 'বিশ্বাসযোগ্যতা'র প্রশ্নে ভিন্নমত দিলেও মিয়ানমারের প্রতি রোহিঙ্গাদের সুরক্ষা দেওয়ার প্রশ্নে চার দফা অন্তর্বর্তী আদেশে তাঁর সম্মতি দেন। আদালতের আদেশের অন্যান্য উপাদান বিশ্লেষণের আগে সাময়িক ব্যবস্থাগুলো কী কী, তা দেখে নেওয়া যাক। অপর একজন বিচারপতি 'বিশ্বাসযোগ্যতার' প্রশ্নের বদলে রোহিঙ্গাদের দীর্ঘদিনের নিপীড়ন-দুর্ভোগের বাস্তবতায় চরম মানবিক ঝুঁকির কারণেই সাময়িক ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেওয়া যায় বলে মত দেন।

এগুলো হচ্ছে : ১. গণহত্যা সনদের বিধি ২ অনুযায়ী মিয়ানমারকে তার সীমানার মধ্যে রোহিঙ্গাদের হত্যা, জখম বা মানসিকভাবে আঘাত করা, পুরো জনগোষ্ঠী বা তার অংশবিশেষকে নিশ্চিহ্ন করা এবং তাদের জন্মদান বন্ধের লক্ষ্যে বিধিনিষেধ আরোপ থেকে অবশ্যই নিবৃত্ত থাকতে হবে। ২. মিয়ানমারকে অবশ্যই তার সীমানার মধ্যে সেনাবাহিনী বা অন্য কোনো অনিয়মিত সশস্ত্র ইউনিট বা তাদের সমর্থনে অন্য কেউ যাতে গণহত্যা সংঘটন, গণহত্যার ষড়যন্ত্র, প্রকাশ্যে বা অপ্রকাশ্যে গণহত্যার জন্য উসকানি দেওয়া, গণহত্যার চেষ্টা করা বা গণহত্যার সহযোগী হতে না পারে, সেটা নিশ্চিত করতে হবে। ৩. গণহত্যা সনদের বিধি ২-এর আলোকে গণহত্যার অভিযোগের সঙ্গে সম্পর্কিত সব সাক্ষ্য-প্রমাণ রক্ষা এবং তার ধ্বংসসাধনের চেষ্টা প্রতিরোধ করতে হবে। ৪. এই আদেশ জারির দিন থেকে চার মাসের মধ্যে মিয়ানমার আদালতের আদেশ অনুযায়ী যেসব ব্যবস্থা নিয়েছে, সেগুলো আদালতকে

জানাতে হবে এবং তারপর থেকে আদালতের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত না হওয়া পর্যন্ত প্রতি ছয় মাস পরপর এ বিষয়ে প্রতিবেদন দিতে হবে।

রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর দুর্ভোগ ও গণহত্যার ঝুঁকির মাত্রা অনুধাবন এবং সাময়িক ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনা জারি কেন জরুরি, সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে আইসিজে যেসব সূত্রের ওপর নির্ভর করেছেন, সেগুলোর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে প্রধানত দুটি উৎস। একটি হচ্ছে জাতিসংঘের তথ্য অনুসন্ধানী দলের প্রতিবেদন, আর অপরটি হচ্ছে আদালতে মিয়ানমারের বক্তব্য। জাতিসংঘ মানবাধিকার পরিষদের রিপোর্ট, স্পেশাল র‍্যাপোর্টিয়ারের প্রতিবেদন, সাধারণ পরিষদে গৃহীত প্রস্তাবগুলোও আদালত বিবেচনায় নিয়েছেন। তবে তথ্য অনুসন্ধানী দলের উপসংহার বিশ্বাসযোগ্যতা পেয়েছে মিয়ানমারের আংশিক স্বীকারোক্তিতে। মিয়ানমারের পক্ষ থেকে শুনানিতে দাবি করা হয়েছিল যে বিচ্ছিন্নতাবাদী বিদ্রোহ দমনে রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে অভিযানে সশস্ত্র বাহিনী অপরাধ করে থাকলেও তাতে গণহত্যার উদ্দেশ্য ছিল না।

তথ্য অনুসন্ধানী দল তার প্রতিবেদনে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে পরিচালিত সামরিক অভিযানে 'গণহত্যার উদ্দেশ্য' থাকার প্রমাণ মিলেছে বলে যে উপসংহার টেনেছে, তাতে আদালতের ১৭ জন বিচারপতির ১৫ জনই একমত হয়েছেন। তবে ভিন্নমত পোষণকারী বিচারপতি আদালতের ভাইস প্রেসিডেন্ট সু হানকিন তাঁর আলাদা মতামতে লিখেছেন, 'মৌখিক শুনানির সময় মিয়ানমার স্বীকার করেছে, রাখাইন রাজ্যে সামরিক অভিযানের সময় অত্যধিক শক্তি প্রয়োগ এবং মানবাধিকার ও আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের লঙ্ঘন ঘটে থাকতে পারে।' 'বর্তমান পরিস্থিতিতে একটি গোষ্ঠী হিসেবে রোহিঙ্গারা ঝুঁকির মুখে রয়েছে' উল্লেখ করে তিনি বলেছেন, 'মাতৃভূমি থেকে বাস্তুচ্যুত ৭ লাখ ৪০ হাজারের বেশি মানুষের জন্য পরিস্থিতি প্রতিরোধমূলক পদক্ষেপ দাবি করে।' বলা চলে, বিষয়টি মিয়ানমারের জন্য অনেকটা নিজের জালে গোল দেওয়ার মতোই ঘটেছে। বিচারপতি সু অবশ্য বাংলাদেশের কয়েকটি বিবৃতি এবং 'একটি টেকসই সমাধান'-এর জন্য মিয়ানমার সরকারের সঙ্গে সহযোগিতার অবস্থান সম্ভাব্য গণহত্যার পরিস্থিতি নির্দেশ করে না বলে মন্তব্য করেছেন।

গাম্বিয়ার মামলা দায়েরের অধিকার নেই বলে মিয়ানমার যে দাবি করেছিল, তা নাকচ করে আদালত যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন, তা আন্তর্জাতিক বিরোধের ক্ষেত্রে একটি নতুন নজির স্থাপন করল। সরাসরি তার ওপর কোনো প্রভাব না পড়লেও গণহত্যা সনদ বাস্তবায়নে যে দূরবর্তী এবং ছোট একটি দেশও মানবিক দায়িত্ব পালন করতে পারে—তা এই রায়ের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অবশ্য এ বিষয়েও বিচারপতি সু হানকিন ভিন্নমত দিয়েছেন। তিনি গণহত্যা সনদের বাধ্যবাধকতা পূরণে বাধ্য করার জন্য আদালতের শরণাপন্ন হতে গাম্বিয়ার আইনগত অধিকার প্রশ্নে

ভিন্নমত দিয়ে বলেছেন, 'সনদের কথিত লঙ্ঘনের কারণে এই অধিকার সুনির্দিষ্টভাবে ক্ষতিগ্রস্ত রাষ্ট্রের।' বাংলাদেশের নাম উল্লেখ না করে তিনি গণহত্যা সনদের ৯ নম্বর বিধির প্রতি আপত্তির প্রসঙ্গ টেনেছেন। গণহত্যা সনদের ৯ নম্বর বিধিতে সনদে অংশগ্রহণকারী যেকোনো পক্ষই এককভাবে আইসিজের শরণাপন্ন হতে পারে। কিন্তু বাংলাদেশ বলেছে, আইসিজের শরণাপন্ন হতে উভয় পক্ষের সম্মতি লাগবে। বিচারপতি সুর মতে, ৯ নম্বর বিধির প্রতি কোনো দেশের আপত্তি থাকার মানে এই নয় যে এ সনদের আসল উদ্দেশ্যের (raison d'etre) প্রতি অঙ্গীকারের কারণে সনদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূরণের অভিন্ন স্বার্থে সেই দেশ অংশীদার নয়। এই মন্তব্যে অনুমান করা যায় যে ক্ষতিগ্রস্ত দেশ হিসেবে বাংলাদেশের এই মামলা করার সুযোগ থাকার প্রতি তিনি ইঙ্গিত করেছেন।

এই আদেশে উদ্বাস্তু রোহিঙ্গাদের ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য মিয়ানমার উপযুক্ত পরিবেশ তৈরিতে ব্যর্থ হয়েছে বলে আইসিজে যে পর্যবেক্ষণ দিয়েছেন, তা বাংলাদেশের জন্য বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে ২০১৯ সালের ২৭ ডিসেম্বর গৃহীত প্রস্তাব থেকে উদ্ধৃত করে আইসিজে অভিমত দিয়েছেন, 'মিয়ানমারে রোহিঙ্গারা চরম ঝুঁকির মুখে রয়েছে।' বাংলাদেশ থেকে রোহিঙ্গা উদ্বাস্তুদের প্রত্যাবাসনের সহায়ক পরিবেশ তৈরির পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে বলে মিয়ানমার যে দাবি করেছে, তা আদালত নাকচ করে দিয়ে বলেছেন, গণহত্যা সনদের আলোকে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে সুরক্ষা পাওয়ার অধিকারী একটি গোষ্ঠী হিসেবে টিকে থাকার অধিকারকে সুনির্দিষ্টভাবে স্বীকৃতি দিয়ে সুরক্ষা দেওয়ার লক্ষ্যে বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণের কোনো প্রমাণ মিয়ানমার আদালতে উপস্থাপন করেনি (Myanmar has not presented to the Court concrete measures aimed specifically at recognising and ensuring the right of the Rohingya to exist as a protected group under the Genocide Convention)। এই পর্যবেক্ষণ রোহিঙ্গাদের নাগরিকত্বের স্বীকৃতির প্রশ্নে মিয়ানমারের ওপর চাপ তৈরির আরেকটি সুযোগ। এটি বাংলাদেশের জন্য কূটনৈতিক চাপ সৃষ্টির একটি নতুন সুযোগ এনে দিয়েছে।

গাম্বিয়া তার আবেদনে আদালতের কাছে প্রার্থনা করেছিল, আদালত যেসব সাময়িক ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেবেন, সেগুলো বাস্তবায়নের বিষয়ে চার মাস পর উভয় পক্ষকেই আদালতের কাছে আলাদা করে প্রতিবেদন পেশের আদেশ দেওয়া হোক। লক্ষণীয়ভাবে আদালত এখানে আরও এক ধাপ এগিয়ে তাঁর আদেশ বাস্তবায়নের বিষয়টিতে নজরদারির দায়িত্ব নিজেই গ্রহণ করেছেন। গাম্বিয়াকে কোনো প্রতিবেদন দিতে বলা হয়নি। বরং মিয়ানমারকে প্রথমে চার মাস পর এবং তারপর থেকে প্রতি ছয় মাসে একবার করে আদেশ বাস্তবায়নে অগ্রগতির প্রতিবেদন দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন আদালত। এই আদেশ নজিরবিহীন। রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর

বিরুদ্ধে যেসব নির্যাতন-নিপীড়ন চলেছে, তারা যে পদ্ধতিগত বৈষম্যের শিকার হয়েছে, তা গণহত্যা কি না, সেই বিচার একটি দীর্ঘ প্রক্রিয়া, যা ন্যূনপক্ষে ৫-৬ বছর, এমনকি ১০ বছর ধরে চলতে পারে। মিয়ানমারের সামনে তাই এই মামলা থেকে সরে আসার কোনো পথ নেই। আর মামলা চলাকালেই তাদের এসব সাময়িক ব্যবস্থা বাস্তবায়নের অগ্রগতি নিয়মিত বিরতিতে জানাতে হবে।

আইসিজের নির্দেশ কার্যকর করার নিজস্ব কোনো ক্ষমতা নেই বলে অনেকেই সন্দেহ প্রকাশ করেছেন যে এই রায় বাস্তবতায় কোনো হেরফের ঘটাবে না। আদালতের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের বিষয়টি পুরোপুরি নিরাপত্তা পরিষদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার ওপর নির্ভরশীল হওয়ার কারণেই তাঁদের এই সন্দেহ। স্নায়ুযুদ্ধের আমলে যেমন যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়া বিভিন্ন বিষয়ে পরস্পরবিরোধী অবস্থান নেওয়ায় অভ্যস্ত ছিল, তেমন পরিস্থিতি আবারও ফিরে এসেছে। এবং এখন চীনও একটি গুরুত্বপূর্ণ শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। চীনের গভীর অর্থনৈতিক ও সামরিক স্বার্থের কারণে দেশটি মিয়ানমারের প্রতি দীর্ঘদিন ধরে জোরালো কূটনৈতিক সমর্থন জুগিয়ে আসছে। রোহিঙ্গাদের আবাসভূমি রাখাইন রাজ্যে বিশেষ স্বার্থ থাকায় আন্তর্জাতিক পরিসরে চীন মিয়ানমারের বিরুদ্ধে কোনো ধরনের কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণের উদ্যোগকে সমর্থন দেয়নি, বরং বাধা দিয়েছে। সুতরাং এই আশঙ্কা একেবারে অমূলক নয়।

তবে আইসিজের রায় বাস্তবায়নের প্রশ্নে এমনটি না-ও হতে পারে। কেননা, বিষয়টি জাতিসংঘ ব্যবস্থার ভিত্তি নাড়িয়ে দিতে পারে। যে আদালত জাতিসংঘ সনদের অংশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত, সেই আদালতের সর্বসম্মত রায়ের বাস্তবায়নে বাধা দিলে আন্তর্জাতিক পরিসরে আইনের শাসনবিরোধী হিসেবে তার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ উঠবে, তা মোটেও সুখকর হবে না। বিষয়টির সঙ্গে আরও একটি আন্তর্জাতিক সনদ অকার্যকর করার প্রশ্ন জড়িত এবং সেটি হচ্ছে গণহত্যার মতো গুরুতর অপরাধ প্রতিরোধের বৈশ্বিক বিধিমালা। গণহত্যা সমর্থনকারী দেশ হিসেবে চীনের অতীত ভূমিকা বাংলাদেশের চেয়ে কেউ ভালো জানে না। কারণ, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় গণহত্যা পরিচালনাকারী পাকিস্তান রাষ্ট্রকে চীন সমর্থন দিয়েছিল। তবে এ ক্ষেত্রে আদালতের আদেশটি একটি পার্থক্যরেখা টেনে দিচ্ছে, যা পাকিস্তানের ক্ষেত্রে ঘটেনি।

রোহিঙ্গাদের সুরক্ষা লাভের এই মামলায় মিয়ানমারের পক্ষে আদালতে হাজির হয়েছিলেন দেশটির সর্বোচ্চ বেসামরিক নেতা নোবেল শান্তি পুরস্কারজয়ী অং সান সু চি। তাঁর অংশগ্রহণে যে আইসিজের এখতিয়ার মেনে নেওয়ায় মিয়ানমারের সম্মতির সর্বোচ্চ প্রতিফলন ঘটেছে তা-ই নয়, আদালতে তিনি যা বলেছেন, তা-ও এখানে স্মরণ করা যেতে পারে। মিস সু চি বলেছিলেন, মিয়ানমারের মতো বস্তুগতভাবে কম সম্পদশালী দেশগুলোর কাছে বিশ্ব আদালত আন্তর্জাতিক ন্যায়বিচারের জন্য একটা গুরুত্বপূর্ণ আশ্রয়স্থল। জাতিসংঘ সনদের মৌলিক লক্ষ্যগুলোর একটি, বিভিন্ন

চুক্তি এবং আন্তর্জাতিক আইনের অন্যান্য উৎস থেকে উৎসারিত বাধ্যবাধকতাগুলো মেনে চলতে সহায়ক পরিবেশ প্রতিষ্ঠার জন্য আমরা এই আদালতের শরণাপন্ন হই। এ রকম ঘোষণা যদি শঠতা না হয়ে থাকে, তাহলে এই মামলা থেকে সরে যাওয়া বা রায় অমান্য করা সহজ হবে না।

বিপরীতে, মিয়ানমারের অভ্যন্তরীণ বাস্তবতা যে সম্পূর্ণ আলাদা, সে কথাও অস্বীকার করা যাবে না। দীর্ঘ চার যুগ ধরে রাষ্ট্রীয় নীতিতে বর্ণবাদী বিদ্বেষ দৃঢ়ভাবে গেঁথে গেছে। দেশটির রাষ্ট্রকাঠামোর সবচেয়ে শক্তিশালী অংশ সামরিক বাহিনীর প্রকাশ্য বক্তব্য-বিবৃতিতে তা স্পষ্ট। আর বেসামরিক যে রাজনৈতিক শক্তির উত্থান ঘটেছে ন্যাশনাল লিগ ফর ডেমোক্রেসি বা এনএলডি ও তার নেত্রী অং সান সু চির উত্থান ও ক্ষমতায়নে, সেখানেও উগ্র বৌদ্ধ ধর্মীয় গোষ্ঠীগুলোর আধিপত্য লক্ষণীয়। দেশটির গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের আন্দোলনে বিভিন্ন ধর্মীয় ও জাতিগোষ্ঠীর স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ থাকলেও ক্রমেই তার নিয়ন্ত্রণ সংখ্যাগুরু বৌদ্ধ ধর্মগুরুদের প্রভাবাধীন রাজনীতিকদের হাতে কেন্দ্রীভূত হয়েছে। রোহিঙ্গাবিদ্বেষ এবং তাদের অধিকার হরণের প্রশ্নে সামরিক-বেসামরিক উভয় গোষ্ঠীই যূথবদ্ধ। সে কারণেই আইসিজের রায়ের প্রতিক্রিয়ায় ইঙ্গিত মিলছে যে আদালত নির্দেশিত অন্তর্বর্তী ব্যবস্থাগুলোর বাস্তবায়ন সুদূরপরাহত।

মিয়ানমার তাহলে এখন কী করবে? দেশটির অতীত কার্যক্রমে যদি কোনো প্রবণতা খোঁজ করা হয় তাহলে দেখা যাবে, তাদের প্রধান কৌশলই হচ্ছে সময়ক্ষেপণের মাধ্যমে প্রতিপক্ষকে হাল ছেড়ে দিতে বাধ্য করা। করছি করছি করে সময়ক্ষেপণ ছাড়াও নানা ধরনের প্রক্রিয়াগত জটিলতার অজুহাত তৈরি করে প্রতিপক্ষের ওপর দোষারোপ এবং নিজেদের দায় এড়ানোর এই কৌশলের কারণেই গত তিন বছরে জাতিসংঘের উন্নয়ন কর্মসূচি বা ইউএনডিপির তদারকিতে প্রত্যাবাসনের চুক্তি, উদ্বাস্তুদের পরিচয় যাচাই, চীনা মধ্যস্থতায় দুবার বৈঠক অনুষ্ঠানসহ অন্তহীন আলোচনার ফল হচ্ছে শূন্য প্রত্যাবাসন। কিন্তু একই সময়ে তারা অসহযোগিতার দায় চাপিয়েছে বাংলাদেশের ওপর। আশঙ্কা হচ্ছে, আদালতেও দেশটি একই ধরনের শঠতাপূর্ণ কৌশল অনুসরণ করবে। এনএলডির মুখপাত্র মিও নিউন্ট রয়টার্সকে বলেছেন, 'সরকার এই আদেশের অধিকাংশই বাস্তবায়ন করছে। একটা কাজ এখন আমাদের করতে হবে, তা হচ্ছে আদালতে নিয়মিত রিপোর্ট দেওয়া।' আর সেনাবাহিনীর মুখপাত্র ব্রিগেডিয়ার জেনারেল য্য মিন তুন *নিউইয়র্ক টাইমস*কে বলেছেন, তাঁরা সরকারের নির্দেশনামতো কাজ করবেন।

বাংলাদেশের করণীয়

প্রশ্ন হচ্ছে আইসিজের রায় বাংলাদেশের জন্য যে সুযোগ তৈরি করে দিয়েছে, তা কীভাবে কাজে লাগানো যাবে? কূটনৈতিক অসততার বিপরীতে বাংলাদেশ কি

বন্ধুত্বপূর্ণ উপায়ে এ রকম একটি গভীর মানবিক সংকটের সমাধান পেতে পারে? সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতা তা বলে না। গণহত্যার যন্ত্রণাময় স্মৃতিতাড়িত জাতি হিসেবে আমাদের যে নৈতিক অবস্থান প্রয়োজন ছিল, আমরা তা গ্রহণ করতে পারিনি। গণহত্যাকে তার স্বনামে ডাকতে পারিনি। বিচারপতি সুর ভাষায়, 'টেকসই সমাধান'-এর সন্ধানে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়ে অসহযোগিতার অভিযোগে অভিযুক্ত হয়েছি। তাই নমনীয়-শোভনীয় উদার কূটনীতির বদলে এখন একটু কঠোর নীতির কথা ভাবা প্রয়োজন। মিয়ানমারকে একঘরে করার দিকে মনোযোগী হওয়া প্রয়োজন। চীন, ভারত, জাপান কিংবা অন্য যেকোনো দেশ তৃতীয় পক্ষ হিসেবে মধ্যস্থতায় এগিয়ে এলে তাদের আদালতের আদেশ অনুযায়ী রোহিঙ্গাদের নাগরিকত্বের স্বীকৃতি আদায়ে সহযোগিতার কথা বলা প্রয়োজন।

আদালতে মূল মামলায় বাংলাদেশ পক্ষভুক্ত হওয়ার আবেদনের কথাও ভাবতে পারে। আইসিজের সংবিধির (স্ট্যাটিউট) ৬২ ধারার ১ উপধারা বলছে, কোনো রাষ্ট্র যদি মনে করে এই মামলার সিদ্ধান্তে তাদের আইনি স্বার্থ আছে, তাহলে তারা মামলায় তাদের কথা শোনার জন্য (ইন্টারভেন) আবেদন করতে পারে (Should a state consider that it has an interest of a legal nature which may be affected by the decision in the case, it may submit a request to the Court to be permitted to intervene)। এ মামলায় বাংলাদেশের স্বার্থের বিষয়ে প্রশ্নের অবকাশ কমই।

দ্বিতীয় আরেকটি কার্যকর হাতিয়ার আছে, যার উদ্যোগ আসতে হবে নাগরিক সমাজের তরফ থেকে। এটি হচ্ছে মিয়ানমারকে বয়কটের আহ্বান। বর্ণবাদী নীতির কারণে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে এই বয়কট অভিযান কতটা সফল হয়েছিল, তা সবারই জানা। ফিলিস্তিনিদের পক্ষে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে পাশ্চাত্যে একই ধরনের বয়কট আন্দোলন শুরু হওয়ায় ইসরায়েল তার মিত্র সরকারগুলোকে এ রকম বয়কট নিষিদ্ধের আইন করতে অনুরোধ জানায়। বৈশ্বিক পরিসরে এ ধরনের বয়কট আন্দোলন মিয়ানমারের রপ্তানি, বিনিয়োগ এবং অর্থনীতিকে প্রচণ্ড চাপের মুখে ফেলবে। এই রায় বাস্তবায়নে অস্বীকৃতি মিয়ানমারকে যে আবারও সেই সামরিক শাসনামলের মতো একঘরে করে ফেলবে, সেটা বোঝানোর জন্যই এমন আন্দোলন প্রয়োজন।

বৈশ্বিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার বিদ্যমান কাঠামো ও ব্যবস্থার প্রতি আস্থা পুনরুদ্ধারের এটি একটি সুযোগ। সেটিকে কাজে লাগাতে হবে। দীর্ঘ চার যুগের বেশি সময় ধরে রোহিঙ্গারা বিশ্বের সবচেয়ে নিপীড়িত জাতিগোষ্ঠী হিসেবে যে দুর্ভোগের শিকার হয়ে এসেছে, এ রায় এবার তাদের বিচারপ্রাপ্তির আশাকে জাগ্রত করেছে। সেই বিবেচনায় এটি অবশ্যই একটি সুসংবাদ।

লে খ ক প রি চি তি

বদরুল আলম খান

বদরুল আলম খান দীর্ঘকাল ধরে বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনায় নিযুক্ত। চট্টগ্রাম ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজতত্ত্ব বিভাগে শিক্ষকতার পর বর্তমানে তিনি অস্ট্রেলিয়ার সিডনি শহরে ইউনিভার্সিটি অব ওয়েস্টার্ন সিডনিতে অধ্যাপনা করছেন। তাঁর গবেষণার বিষয় আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, বাংলাদেশের সমাজ, শ্রেণি, ধর্ম ও বিশ্বায়ন। তাঁর উল্লেখযোগ্য প্রকাশনা : *পুঁজিবাদের সমাজতত্ত্ব* (সম্পাদনা), *সংঘাতময় বাংলাদেশ : অতীত থেকে বর্তমান* (২০১৫), *গণতন্ত্রের বিশ্বরূপ ও বাংলাদেশ* (২০১৭) এবং *বিশ্বায়ন : ইতিহাস ও গতিধারা* (২০১৮) প্রথমা প্রকাশন থেকে প্রকাশিত হয়েছে। একই প্রকাশনী থেকে *তলস্তয়ের দেশে* (২০২০) নামক আত্মজীবনীমূলক আরেকটি গ্রন্থ প্রকাশের অপেক্ষায় রয়েছে।

মাহবুব উল্লাহ

অর্থনীতিতে পিএইচডি মাহবুব উল্লাহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বোস্টন বিশ্ববিদ্যালয় ও জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা ও গবেষণা করেছেন। ১৯৭৬ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতি বিভাগে অধ্যাপনা করেছেন। এ ছাড়া তিনি কানাডার ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ সেন্টার (আইডিআরসি), ডেনমার্কের সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ, নেপালের ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর ইন্টিগ্রেটেড মাউন্টেইন ডেভেলপমেন্ট, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ, জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা এবং ইউনাইটেড নেশনস ইউনিভার্সিটির সহযোগিতায় গবেষণার কাজ করেছেন। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম সহ-উপাচার্য, সোনালী ব্যাংকের চেয়ারম্যান এবং রাজস্ব সংস্কার কমিশনের সদস্য হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন। সর্বশেষ তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান হিসেবে অবসর গ্রহণ করেন। বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় রচিত তাঁর গ্রন্থের সংখ্যা ১৩। দেশে ও বিদেশে তাঁর অনেকগুলো গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে।

জন বেলামি ফস্টার

মান্থলি রিভিউ পত্রিকার সম্পাদক এবং ওরেগন বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞানের অধ্যাপক। পুঁজিবাদের রাজনৈতিক অর্থনীতি ও অর্থনৈতিক সংকট, প্রতিবেশ ও প্রতিবেশিক সংকট এবং মার্ক্সবাদী তত্ত্ব বিষয়ে তিনি সাড়াজাগানো বই ও প্রবন্ধ লিখেছেন।

মুহাম্মদ তানিম নওশাদ

স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে পড়াশোনা করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগে। দ্বিতীয় স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেছেন উন্নয়ন অধ্যয়নের ওপর ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। জার্মান ভাষার ওপর পড়াশোনা করেছেন জার্মানির ম্যাক্স ভেবার হাউস, হাইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে। বিভিন্ন দেশীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানে গবেষক ও পরামর্শক হিসেবে তিনি কাজ করেছেন এবং করছেন। অনেক গুরুত্বপূর্ণ বই ও লেখা তিনি মূল জার্মান, ফরাসি ও রুশ থেকে অনুবাদ করেছেন। ২০১৭ সালে তাঁর অনুবাদের ওপর হাইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মুশফিক ওয়াদুদ

বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের নেভাডা বিশ্ববিদ্যালয়ে টিচিং অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে কর্মরত। প্রায় এক দশক সাংবাদিকতার সঙ্গে জড়িত ছিলেন। *দ্য গার্ডিয়ান*, থমসন রয়টার্স ফাউন্ডেশন, *দ্য নিউ হিউম্যানিটারিয়ান*, *ইউনিভার্সিটি ওয়ার্ল্ড নিউজ* ইত্যাদিতে তাঁর প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। সাংবাদিকদের নিরাপত্তা নিয়ে একটি গবেষণাপত্রের যৌথ লেখক তিনি। গবেষণাপত্রটি *মিডিয়া অ্যান্ড কমিউনিকেশন* সাময়িকীতে প্রকাশের অপেক্ষায় রয়েছে। সাংবাদিকদের নিরাপত্তা, গণমাধ্যমের স্বাধীনতা, মিডিয়ার মালিকানা, রাজনৈতিক যোগাযোগ, রোহিঙ্গা শরণার্থী, সেক্যুলার ও ধর্মীয় রাজনীতিবিষয়ক গবেষণায় তিনি আগ্রহী।

কামাল আহমেদ

সাংবাদিক। পরামর্শক, জাতিসংঘ রেডিও, সাবেক পরামর্শক সম্পাদক, *প্রথম আলো*; সাবেক সম্পাদক, বিবিসি বাংলা। দীর্ঘ ৩৫ বছরের সাংবাদিকতা জীবনে তিনি বাংলাদেশের বাংলা ও ইংরেজি মাধ্যমের বিভিন্ন শীর্ষস্থানীয় সংবাদপত্রে কাজ করেছেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনে স্নাতক এবং ইতিহাসে স্নাতকোত্তর।

গ্রাহক হওয়ার নিয়ম

যেকোনো সময় যেকোনো সংখ্যা থেকে প্রতিচিন্তার গ্রাহক হওয়া যাবে। একবারে কমপক্ষে চার সংখ্যা বা এক বছরের জন্য গ্রাহক হতে হবে। 'মিডিয়াস্টার লিমিটেড প্রতিচিন্তা' বরাবর মানি অর্ডার, পে-অর্ডার বা ব্যাংক ড্রাফটের মাধ্যমে টাকা জমা করা যাবে। এ ছাড়া বিকাশের মাধ্যমেও গ্রাহক হওয়া যাবে (বিকাশ নম্বর : ০১৯৫৫৫৫২০৬৯)। ডাকযোগে নাম, ঠিকানা, ফোন নম্বরসহ টাকাও পাঠিয়ে গ্রাহক হওয়া যাবে। এক বছরের জন্য গ্রাহক হতে দেশের গ্রাহকদের অগ্রিম দিতে হবে ৪০০ (চার শ) টাকা, বিদেশের গ্রাহকদের জন্য ৩৫ (পঁয়ত্রিশ) ডলার; দুই বছরের ক্ষেত্রে যথাক্রমে ৮০০ (আট শ) টাকা ও ৬৫ (পঁয়ষট্টি) ডলার।

গ্রাহক হিসেবে আবেদন করতে পরিষ্কার করে লিখুন :

নাম, অবস্থান (দেশ/বিদেশ), বিস্তারিত ঠিকানা, ফোন ও ই-মেইল (যদি থাকে),
গ্রাহক হওয়ার মেয়াদ (এক/দুই বছর), অর্থ প্রদানের মাধ্যম (মানি অর্ডার/পে-অর্ডার/ ব্যাংক ড্রাফট), টাকা/ডলারের পরিমাণ।

গ্রাহক হিসেবে নিবন্ধিত হওয়ার পর গ্রাহককে একটি রসিদ দেওয়া হবে।

যোগাযোগের ঠিকানা

সম্পাদক
প্রতিচিন্তা
প্রথম আলো ভবন, ১৯ কারওয়ান বাজার, ঢাকা ১২১৫।
ফোন : ৮১৮০০৭৮-৮১, ০৯৬১৩১১৩৩৬৬